যার যা ভূমিকা

সমরেশ বসু

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা ৯

প্রকাশক : ফণিভূষণ দেব
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলিকাতা ৯

মুদ্রক . দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু
আনন্দ প্রেস এন্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড
পি-২৪৮ সি আই. টি. স্কীম নং ৬ এম
কলিকাতা ৫৪

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রথম সংস্করণ : মার্চ ১৯৬০
তৃতীয় মুদ্রণ : এপ্রিল ১৯৭৬

এ কোন ভূমিকা না, ছোট একটা কৈফিয়ত। একটা গাড়ি চলে রাত্রের অন্ধকারে। যাত্রী সংখ্যা চার। এক চালক। এরা নিজের শহরে, সমাজে বা পরিবারে বা প্রত্যহের পরিবেশে কেউ নেই। সবই পিছনে পড়ে রয়েছে। কিন্তু পিছন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া কি তাদের পক্ষে সম্ভব। সম্মুখের অনিশ্চিতের ওপরে কি তাদের নিঃসংশয় কোন ধারণা আছে। পরিচয়ের দিক থেকেও তারা খুব ঘনিষ্ঠ বা নিবিড় নয়। তা-ই হঠাৎ মনে হল, সবাই তারা নিজেদের কথা নিজেরাই বলুক। যোগফলটা কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, দেখা যাক। কৈফিয়ত এইটুকুই। পুরনো একটা ভঙ্গি এই কারণেই রেখে দেখা।

সমরেশ বসু

পূর্ণেন্দু পত্রী
প্রীতিভাজনেষু
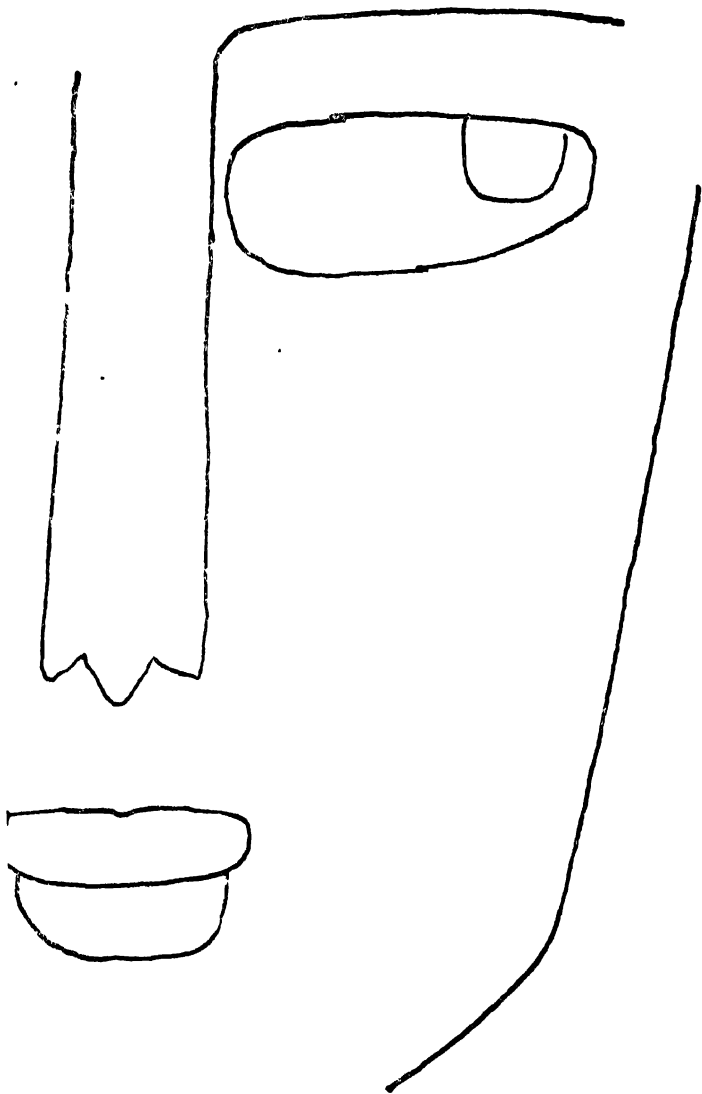
উশীনর

রাত্রি প্রায় দশটার সময় ওরা এল। আমি অলকের গাড়ির হর্ন শুনেই বুঝতে পারলাম, ওরা এল, এবং এতক্ষণে ওদের রাত্রি

সাড়ে আটটা বাজল। এতে অবিশ্যি, আমার অবাক হবার কিছু নেই, কারণ অলককে তো আমি জানি। রাত্রি দশটার মধ্যে এসে যে পৌঁছতে পেরেছে, এটাই যথেষ্ট। তা না হলে, আমাকে আরো কত রাত্রি অবধি জেগে বসে থাকতে হতো, কে-জানে। হয়তো মাঝ রাত পার করে এসে, দরজা ধাক্কাতে আরম্ভ করত।

অলক দরজায় কোনরকম শব্দ না করেই, হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল। আমি তখন পায়জামা-পাঞ্জাবী পরে, বেশ খানিকটা ঢিলেঢালা অবস্থায়, আমার একজন প্রিয় নাট্যকারের একটি নাটক পড়ছিলাম। অলক কিন্তু আমার দিকে তাকাল না। এটাই ওর অভ্যাস। ঘরে ঢুকেই, আয়নার দিকে তাকিয়ে, নিজেকেই লক্ষ করতে করতে, তাড়াতাড়ি বলে উঠল, 'বিচ্ছিরি দেরি হয়ে গেল মাইরি। সব দোষ এই শান্তনুবাবুর। শালা, এত ঝামেলা নিয়ে, কোথাও কখনো বেরুনো যায়।'

আমি লক্ষই করিনি, শান্তনুও অলকের পিছনে পিছনে এসে ঢুকেছে। সে অলককে বলে উঠল, 'এই মশাই, বাজে বকবেন না তো। আমার তো রাত্রি পৌনে ন'টাতেই কাজ হয়ে গেছল। আপনিই তো একেবারে গদগদ হয়ে উঠলেন, সুপর্ণার সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। আমার ও সব মেয়েমানুষের বাতিক নেই। কী হতো সুপর্ণার সঙ্গে দেখা না করলে? তাও যদি বুঝতাম—'

শান্তনু কথাটা শেষ করল না। আমার দিকে ফিরে, চোখের ইশারা করে একটু হাসল, বলল, 'নিন, চলুন স্যার, আর দেরি নয়।'

অলকও সেই তালেই, তাল দিয়ে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, ওঠো ওঠো, এখন বেরিয়ে না পড়লে, ভোরবেলা জামসেদপুর গিয়ে পৌঁছনো যাবে না।'

যেন, রাত্রি সাড়ে আটটার যাত্রা, দশটার যাত্রা হওয়ার কারণ আমিই, এবং আমাকে এভাবে তাড়া দিয়েই, অলক ড্রেসিং-টেবলের সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে লাগল, আর শান্তনু আমার বাইরের র‍্যাকে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, বই দেখতে লাগল।

দুজনের চোখ-মুখের চেহারা ও নিশ্বাসের গন্ধ থেকেই টের পাওয়া যাচ্ছে, কিঞ্চিৎ মদ্যপান তাদের ইতিমধ্যেই হয়ে গিয়েছে, এবং এখনো সারারাত্রি পড়ে আছে। দুজনের দুরকম চেহারা, দুরকম গলার স্বর, যদিও আচার-ব্যবহারে কতটা বিপরীত, তা এখনই আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে খুব একটা বিপরীত বোধহয় নয়।

অলক বেশ লম্বা, যাকে বলা যায় ল্যাঙপাঙে গোছের ঢ্যাঙা, বয়স বছর চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ। নাক চোখ মুখ, এমনিতে খারাপ না। বেশ একটা বুদ্ধির ছাপ আছে। চোখের কোলগুলো একটু ফোলা-ফোলা, কালচে ছোপ পড়েছে। মদ্যপানের জন্যই বোধহয় এরকম হয়েছে। গলার স্বরটা সরু না, মোটাও না, একটু যেন কাঁসার ঝনঝনানি আছে। পোশাক-আশাক বেশ দুরস্ত, ভাল কাপড়ের প্যাণ্ট-শার্ট, ভাল ছাঁট-কাট, কিন্তু তেমন যত্ন নেই, কেমন যেন একটা ঝলঝলে ভাব। দামী জুতো-জোড়ায় রাজ্যের ধুলো পড়েছে, কোন পরোয়া নেই।

ওর সঙ্গে আমার পরিচয় প্রায় ছেলেবেলা থেকেই। যদিও, ওদের পরিবারে আমার তেমন যাতায়াত কোনদিনই ছিল না, বা ওর সঙ্গে মেলামেশাও বিশেষ ছিল না। আমি ছিলাম এক ধরনের, ও ছিল অন্য ধরনের। সেইজন্য, পরিচয় থাকা সত্ত্বেও, ওর জগৎ ছিল আলাদা, আমার আলাদা। যে কারণে, এ বয়সের মধ্যেই, ও এখন একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী বলা যায়। অবিশ্যি, ওদের পারিবারিক ট্র্যাডিশন একটা ছিল, সেটাও ওকে অনেকখানি সাহায্য করেছে। বাড়ি ওকে করতে হয় নি, কারণ ওদের পৈত্রিক বাড়িটাই বিশাল, এবং গোটাটা জুড়ে থাকবার লোক নেই। কিন্তু ওর মস্ত বড় বিলিতি গাড়ি থেকে, আধুনিক এবং বিলাস জীবনযাত্রার সমস্ত কিছুই ও নিজে করেছে, এবং এখনো আমি সঠিক জানি না, গত তিন বছর ধরে, অলক হঠাৎ কী করে, 'কিন্নরী' থিয়েটার হলের মালিক হয়ে বসেছে। শুধু মালিক না, নাটকের প্রযোজকও বটে, এবং এ পর্যন্ত দুটি নাটক ও প্রোডিউস করেছে, দুটিই অত্যন্ত জনপ্রিয়, টিকিট-ঘরের সাফল্য বেশ

ভাল। ওর আসল ব্যবসায়ের সঙ্গে, থিয়েটারের কোন যোগাযোগই নেই। অলকের বক্তব্য, ওর বন্ধু সাধন, 'কিন্নরী'র যে আসল মালিক ছিল, সে ওর মাথায় এটি চাপিয়ে দিয়েছে, এবং দিয়েছে যখন, ঠিক আছে, ও উঠে পড়ে লেগে গেল, এই ভেবে, দেখা যাক কী হয়। লাভের কথা অলক চিন্তা করে নি, হয়তো কিছু লোকসান দিয়ে বেরিয়ে আসতে হবে, এটাই ভেবেছিল। তারপরে, যখন দেখল, ব্যাপারটা লেগে গিয়েছে, তখন, ওর নিজের কথায়, 'ঠিক আছে শালা, লেগেছে যখন, লাগুক, চলতে দাও।'

'কিন্নরী' এবং নাট্য-প্রযোজনা ব্যাপারটা ওর কাছে তেমন বড় বা গভীর চিন্তার বিষয় কিছু নয়। সময়ও যে খুব একটা দিতে পারে, তাও না। নিজের আসল ব্যবসাটাই ওব মাথায় বসে আছে। আর 'কিন্নরী' চলছে, চলুক। মাঝে মাঝে হয়তো মেতে ওঠে, এবং আজকে, আমার কাছে আসা বা আমাকে নিয়ে যাওয়াটা, নাটকেরই ব্যাপার।

আমি একজন নাট্যকার। গল্প উপন্যাস কিছু কিছু লিখেছি, কিন্তু সেটা আমার বড় পবিচয় না। নাট্যকার হিসাবেই, লোকে আমাকে বেশী চেনে, নিন্দা বা প্রশংসা, যা কিছু, আমার নাটক নিয়েই বেশী হয়। অলক এখন তৃতীয় নাটকের সন্ধানে, সেইজন্যই, আবার ওর সঙ্গে আমার মেলামেশা, আমার কাছে ওর যাতায়াত।

নাটকের মোটামুটি একটা ছক তৈরী হয়েছে। মূল কাহিনী এবং মোট দৃশ্যগুলো, একরকম ভাবে সাজানো হয়েছে। কিন্তু গোটা নাটকটা পুরোপুরি লেখবার আগে, নাটকের ঘটনাস্থল আমি একবার দেখে আসতে চাই। ঘটনাস্থল আমার আগেই দেখা হয়েছে, সেই জন্যই নাটকটা আমার চিন্তায় এসেছিল। তবে প্রথম দেখার পরে, জায়গাটা যদি নিতান্তই, আমাদের পরিচিত পরিবেশের বাইরে হয়, তাহলে, পুরোপুরি লিখতে বসবার আগে, সেই জায়গাটা আমি আর একবার ঘুরে দেখে আসি। এটা আমার এক ধরনের অভ্যাস। তাতে যেন, আমার কল্পনা আরো বেশি উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, সমস্ত ব্যাপারটার বাস্তব রূপায়ণে, অনেকখানি সাহায্য হয়, সহজ হয়ে ওঠে।

ছুটকা শুনেই, অলক রীতিমত উত্তেজিত, এ নাটক ওকে প্রোডিউস করতেই হবে। তবে, আমাকে ও একলা যেতে দিতে রাজী নয়, নিজেও আমার সঙ্গে চলেছে। কিংবা বলা যায়, আমাকেই ও সঙ্গে করে নিয়ে চলেছে। জায়গাটার বিবরণ শুনে, অলক ভীষণ কৌতূহলিত এবং উৎসাহী। ওর যাওয়াতে আমার কোন আপত্তিই থাকতে পারে না, এবং আমরা দু'জন ছাড়া, ওর আগের দুটি নাটকের সার্থক পরিচালক শান্তনুও আমাদের সঙ্গে চলেছে। সেটা খুবই যুক্তিসঙ্গত। পরিচালক একবার ঘুরে এলে, তারও অনেক সুবিধা। অবিশ্যি, অলক বলেছে, এব পরে, মঞ্চসজ্জাকর নিখিলেশ মজুমদারকেও ও একবার সেই অঞ্চলটা ঘুরিয়ে নিয়ে আসবে।

শান্তনু মাঝারি লম্বা, কিন্তু যাকে বলে, ম্যাসিভ্, সেইরকম তার চেহারা। একেবারে ঘাড়ে-গর্দানে বলব না, তবে, বেশ শক্ত হৃষ্টপুষ্ট শরীর। বয়স আমার-অলকের মতই। শান্তনুর শরীরের সঙ্গে, গলার স্বরের বেশ একটা মিল আছে। মোটা এবং বেশ বাজখাঁই গলা, যদিও এই গলাকেই নরম করতে তার এক মুহূর্তও লাগে না। তার চোখে একটা তীক্ষ্ণতা যেমন আছে, একটি বিশেষ ভাবালুতাও আছে। তাতেই বোঝা যায়, একেবারে কল্পনা-বিহীন রাজ্যে সে বাস করে না, আর তা করলে, বোধহয়, একজন পরিচালক হওয়া সম্ভব নয়।

শান্তনুর নাম আমি ছাপার অক্ষরে অনেকবার দেখেছি, চাক্ষুষ পরিচয় মাত্র দু সপ্তাহের। অলকের সঙ্গে তার পরিচয়টা, নিতান্ত থিয়েটারের মালিক প্রোডিউসার ও পরিচালকে নেই এখন আর। অন্ততঃ আমার তাই মনে হয়, ওরা দুজনেই অনেকটা বন্ধুর পর্যায়ে এসে পড়েছে যেন। সেটা তিন বছরের মেলামেশা বা দুটো নাটকের সার্থক পরিচালনা, লাভজনক ব্যবসা, অথবা, দুজনের মধ্যে কোথাও চারিত্রিক মিলের জন্য। আমি ঠিক বলতে পারি না।

শান্তনুকে এমনিতে আমার, সাধারণ খোলামেলা লোক বলেই মনে হয়। নাটকের বিষয় ছাড়া, ভেবে-চিন্তে আস্তে কথা বলবার লোক সে নয়। মোটা গলায় চেঁচিয়ে কথা বলে, উচ্চস্বরে হাসে।

অবিশ্যি, আমার কাছে, এমনিতে খুবই বিনীত। ইতিপূর্বে যে তার সম্পর্কে আমি কোন কথা শুনি নি, তা নয়। সত্যি বলতে কি, সে সব অধিকাংশই একটু নিন্দাসূচক। শান্তনু নিজেও বোধহয়, এ বিষয়ে সচেতন যে, তার সম্পর্কে লোকে, খুব একটা প্রশংসার কথা কিছু বলে না, কিন্তু তার জন্য সে মোটেই ভাবিত না, সেটাও তাকে দেখলে, তার সঙ্গে কথা বললে বোঝা যায়। আমার কাছে অলকের পরিষ্কার উক্তি, 'শান্তনু ইজ পারফেক্ট ইন হিজ লাইন।' এটা একটা মস্ত বড় কথা, প্রযোজক পরিচালকের মধ্যে, এরকম একটা বোঝাবুঝি আছে। অতএব বাইরের লোকের কথাতে, কিছুই যায় আসে না।

শান্তনুর সম্পর্কে, অনেকে বলে, সে প্রগতিশীল মানুষ। শান্তনুর নিজের দাবিও সেটা। কিন্তু কেন, আমি সঠিক জানি না, এবং কী হলে, কী করলে, প্রগতিশীল বলা হয়, তাও আমি সঠিক বুঝে উঠতে পারি না। তবে, শান্তনু যে প্রচণ্ড গতিশীল, সেটা তো তাকে দেখলেই বোঝা যায়। সে শুধু 'কিন্নরী'র বাঁধা পরিচালক নয়, তার নিজের একটা নাট্যসংস্থা আছে, যেখানে সে-ই সর্বেসর্বা। সেখানেও সে সার্থক পরিচালক, নাট্যসংস্থাটিও খুবই জনপ্রিয়।

যাই হোক, যতটুকু, এই দু সপ্তাহে দেখেছি, তাতে লোকটিকে আমার মন্দ লাগে নি। আমার নাটকের ব্যাপারে, বেশি বাদানুবাদ না করলেই, আমি খুশি হব। তারপরে যে যেমন লোকই হোক, আমার কী-ই বা যায় আসে। এমনিতে বেশ ভালই লাগছে।

অবিশ্যি, অলককেই বা আমি আর কতটুকু চিনি। এমনি দেখা-সাক্ষাৎ ছাড়া, কোন মেলামেশাই তো ছিল না। বলতে গেলে, অলক শান্তনু, আমার কাছে প্রায় সমান। তবে, অলককে অনেক আগে থেকে জানি, মোটামুটি ওদের পরিবার পরিজনদের কিছুটা চিনি, শান্তনুর তাও জানি না। জেনেই বা কী হবে। কয়েকটা দিন এক সঙ্গে থাকতে হবে। আশা করি, দিনগুলো খারাপ কাটবে না।

আমি বললাম, 'তাহলে, চল ওঠা যাক।'

অলক চুল আঁচড়াতে আঁচড়াতেই বলল, 'তুমিই তো উঠছ না। সব গুছিয়ে গাছিয়ে নাও।'

আমি বললাম, 'আবার গোছাব গাছাব কী। স্যুটকেসে সবই তো ভরে নিয়েছি। আর যা পরে আছি, এ অবস্থাতেই একেবারে গাড়িতে গিয়ে বসব। বিছানাপত্র নিতে তো তুমি বারণ করেছ।'

অলক যেন হঠাৎ পোশাক সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠল। জামাটা টেনে টেনে, কলারটা সোজা করতে করতে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, জায়গা টায়গা না পাই, গাড়িতেই কয়েকটা দিন কাটিয়ে দেব, বিছানাপত্র আবার কি হবে। এই মশাই।'

শান্তনুর দিকে ফিরে ডাকল ও, 'নিন, খুব হয়েছে, আর এখন বই ঘাটতে হবে না, দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

শান্তনু বইয়ের র‍্যাক থেকে মুখ না তুলেই বলল, 'এখন দেরি হয়ে যাচ্ছে, ওদিকে হিরোইনের বাড়িতে তো এক ঘণ্টা কাটিয়ে এলেন নিজেই।'

অলক সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'আমি একলাই ছিলাম, না? আপনি বোধহয় তখন ধুঁধুল চুষছিলেন? শান্তনু গাঙ্গুলী আমাকে এক ঘণ্টা হিরোইনের কাছে একলা ছেড়ে দেবার পাত্র বটে। উঠুন উঠুন, চলুন।'

শান্তনু বইয়েব র‍্যাক থেকে মুখ তুলে, অলকের দিকে তাকিয়ে, হাসতে হাসতে বলল, 'দশ ঘণ্টা থাকলেও, আপনাব দ্বারা কিছু হবে না। নিন, চলুন দেখি।'

অলক ছেলেমানুষের মত, থিয়েটারি ঢঙে, একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'গো অন্ বয়।'

শান্তনু আমার দিকে ফিরে বলল, 'কই, আপনার কী আছে দিন তো। বৈজু!'

শান্তনু চিৎকার করে ডাকতেই, বাইরে থেকে বৈজুর গলা শোনা গেল, 'জী হাঁ।'

অলক বলল, 'ভেতরে এসে, সাহেবের স্যুটকেসটা নিয়ে যাও।'

বৈজু পর্দা সরিয়ে, ভিতরে এল। বৈজুর চেহারাটি বেশ সুন্দর।

বয়স বছর তিরিশ-বত্রিশ, নাক-মুখ চোখা, হাসি-খুশি ভাব, বেশ চটপটে আছে। এরকম ড্রাইভারের সঙ্গে, দূরে যেতে ভয় হয় না। বৈজু ড্রাইভার না, মেকানিকও বটে। তার ওপরে ভরসা করা যায়।

আমি তাকে স্যুটকেসটা দেখিয়ে দিতে সে নিয়ে চলে গেল। অলক বলে উঠল, 'তোমার ঘরে মাল টাল কিছু নেই?'

অবাক হয়ে বললাম, 'আবার মাল টাল কোথা থেকে আসবে, সবই তো স্যুটকেসের মধ্যে পুরে দিয়েছি।'

দেখলাম, শান্তনুর সঙ্গে অলক চোখাচোখি করে হাসল। কিন্তু শান্তনু হাসল না, প্রায় খেঁকিয়ে ওঠা বলতে যা বোঝায়, সেই রকম করে উঠল, 'তাহলে মালের সন্ধানই করুন, মাল নিয়েই থাকুন, বেরিয়ে আর কাজ নেই।'

অলক হাসতে হাসতে, সম্পূর্ণ অন্য কথা বলল। বলল, 'কিন্তু এ রকম নাট্যকার নিয়ে আজ কালকার দিনে চলে না। মাল কাকে বলে, তাই জানে না, এ নাটক লিখবে কী।'

বলে, আমার দিকে ভ্রূকুটি করে, কাঁধ ঝাঁকাল, পকেটে হাত দিয়ে, সিগারেট বের করল। প্রথমে বুঝতে না পারলেও, অলকের শেষের কথা থেকেই বুঝতে পারলাম, সে মদের কথা বলছে। কিন্তু বাংলা ভাষায়, 'মাল' শব্দ এত বিস্তৃত এবং সুদূরপ্রসারী অর্থব্যঞ্জক, যে, অলকের উচ্চারণমাত্র, সঠিক বস্তুটিকে বুঝে নেব, ততটা এলেমদার আমি না। অলকের ঠাট্টার সঙ্গে, ওর নিজের হাসির যোগটা কম, তাই অপরে হাসতে পারে। আমি জানি, আমার এই এলেমের অভাবে, নাটকের কথাটার কোন যোগ নেই। হেসে বললাম, 'তুমি ড্রিংক্সের কথা বলছ?'

অলক বলল, 'তবে কি তোমার কাছে অন্য মাল চাইব নাকি।'

আমি বললাম, 'না ভাই, ও বস্তু আমার ঘরে নেই।'

'কেন, তুমি খাও না?'

'তা একটু আধটু খাই, কিন্তু ঘরে রেখে খাবার মত অবস্থা এখনো আসেনি।'

অলক ঠকাস্ করে দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়ে, ঠোঁট বাঁকিয়ে সিগারেটটা উঁচু করে ধরে আগুন ধরাল, ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'এসে যাবে, এসে যাবে, আমিই সেই ব্যবস্থা—'

অলকের কথা শেষ হবার আগেই, শান্তনু আর একবার তার বাজখাঁই গলায় খেঁকিয়ে উঠল, 'আরে ধুত্তোরি, মালের নিকুচি করেছে। হিরোইনের বাড়ি থেকে তো পেগ তিনেক টেনে এলেন, গাড়িতে এক গাদা বোতল পড়ে আছে মাল ভর্তি, কেন মিছিমিছি দেরি করছেন। আপনার দ্বারা কোন প্রোডাকশন হবে না।'

অলক ঠোঁট উলটে বলল, 'আপনার দ্বারা হবে। এখন বাজে কথা না বাড়িয়ে, চলুন তো, গাড়িতে ওঠা যাক।'

আমার দিকে ফিরে বলল, 'চল হে উশীনর।'

যেন আমার আর শান্তনুর জন্যই, দেরি হয়ে যাচ্ছে। অলক আর শান্তনুকে দেখে, আমার একটা প্রচলিত কথা মনে পড়ছে, এ বলে আমায় ছাখ, ও বলে আমায় ছাখ।

আমি বললাম, 'তোমরা বেরোলেই, ফ্যান আর আলো নিভিয়ে, আমি ঘরে তালা বন্ধ করতে পারি।'

শান্তনু এবার খপ্ করে, অলকের হাত ধরে টেনে বলল, 'আসুন তো মশাই, ওঁকে দরজা বন্ধ করতে দিন। গাড়িতে আর একজনকে বসিয়ে রেখে এসেছেন, খেয়াল নেই?'

বলে, প্রায় জোর করেই, অলককে ধরে টেনে নিয়ে গেল, এবং আমি শুনলাম, অলক বলছে, 'থাকুক না বসে, বসে থাকবার জন্যই তো এসেছে।'

আমাদের যে আর একজন সহযাত্রী আছে, সে কথা আমি এই প্রথম জানলাম। মঞ্চসজ্জাকর নিখিলেশ মজুমদার এর পরের ক্ষেপে যাবে, এইরকম কথা আছে। তাকেই নিয়ে এল কী না, কে জানে। যে-রকম প্রোডিউসার আর ডিরেক্টর দেখছি, তাদের মতিগতি যে খুব সুস্থির, তা মনে হচ্ছে না। যদিও, এর দ্বারা, এ কথা আমার একবারও মনে হচ্ছে না, অলক শান্তনু, লোক

খারাপ। এখনো পর্যন্ত, তাদের ছুজনকেই আমার বেশ ভাল লাগছে। তারা ছুজনে, যে-ভাবেই কথাবার্তা বলুক, তাদের নিজেদের মধ্যে যে একটা বোঝাবুঝি আছে, যাকে বলে আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। তা না হলে, ওভাবে হাত ধরে টেনে নিয়ে যাওয়া বা খেঁকিয়ে ওঠা, এবং আর একজনের নির্বিকারত্ব ও থেকে থেকে বিদ্রূপ, সম্ভব ছিল না। তাদের অস্থির মতিগতির কথাটা এইজন্যই আরো আমার মনে এল, রাত্রি সাড়ে আটটার যাত্রা যে কারণে রাত্রি দশটায় পেছিয়ে যায়, যে কারণে, তিনজনের যাবার সিদ্ধান্তের পরে, আবার একজনের কথা শুনতে হয়।

আমি নিজেকে চকিতের জন্য একবার আয়নায় দেখে নিলাম। পোশাকটা যদিও যথেষ্ট দলামোচড়া হয়ে গিয়েছে, রাত্রে আর আমাকে কে দেখছে। রেল বা বাস নয়, অতএব অন্য যাত্রীদের সংস্পর্শে যেতে হচ্ছে না। একমাত্র, নতুন একজন কেউ আছে। চেনাশোনা লোকই নিশ্চয় হবে। কিছু ভাববার নেই। যে-নাটকটা পড়ছিলাম, সেটা হাতে নিয়ে, কিছু নিতে ভুল করছি কী না, সেটাই একবার ভাবলাম, ঘরের চারদিকে চোখ বুলিয়ে। তারপরে আলো আর ফ্যান অফ্ করে, বাইরের থেকে দরজায় তালা এঁটে দিলাম।

আমি যে-বাড়িতে থাকি, এটা মস্ত বড় ফ্ল্যাট-বাড়ি। বহু লোক থাকে এ-বাড়িতে। আমার মত একলা লোক যেমন থাকে, পরিবার পরিজন নিয়েও অনেকে থাকে। সকলেই সকলের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন, কারুর সঙ্গে কারুর যোগাযোগ নেই। যে-যার নিজের ফ্ল্যাটে ঢুকে গেলেই হল, আর কারোর সঙ্গে সাক্ষাতও হয় না। অন্ততঃ দেখতে বা দেখাতে না চাইলে। সে হিসাবে, বাড়িটা বেশ ভাল, শান্তিতে থাকা যায়।

আমি বাইরে কোথাও গেলে, এ বাড়ি দেখাশোনা করার জন্য যে কেয়ার-টেকার আছে, তার কাছেই চাবি রেখে যাই। লোকটি বিশ্বাসী। ঘরে ঘরে কাজ করে, এমন কমন চাকর এই ফ্ল্যাটে আছে।

কেয়ার-টেকার তাকে দয়ে, আমার ঘরটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়ে রাখে। বেরোবার আগে, সিঁড়ি দিয়ে নেমে, আমি কেয়ার-টেকারের ঘরে গিয়ে, তাকে চাবিটা দিয়ে বললাম, 'আমার ফিরতে পাঁচ-সাত দিন দেরি হবে। ঘরটা যেন রোজ পরিষ্কার করা হয়।'

ফ্ল্যাট-বাড়ির গেট থেকে বেরোলেই রাস্তা। আমি গেটের সামনে এসে দেখলাম, একটু এগিয়ে, রাস্তার ফ্লুরেসেণ্ট আলো যেখানে একটা গাছের ডালের আড়ালে পড়ে, ছায়া ছড়িয়ে রেখেছে, সেখানে একটা গাড়ি। ওটাই অলকের গাড়ি কী না, বোঝবার আগেই, অলকের সেই কাঁসা-বাজানো গলা শোনা গেল, 'এদিকে এস।'

ওই গাড়িটাই। বিলাতি গাড়ি, বেশ বড়, অলক ওর নিজের গাড়ি নিয়েই বেরিয়েছে। দূর থেকে অনেক সময়, গাড়িটার রঙ কালো বলে মনে হয়। আসলে গাঢ় জাম রঙের গাড়ি। গাড়ির কাছাকাছি এসে দেখলাম, অলক শান্তনু দুজনেই তখনো গাড়ির মধ্যে ঢোকে নি। গাড়ির ভিতর দিকে তাকিয়ে দেখি, পিছনের সীটে, ডানদিকের কোণে, কে একজন বসে আছে। অস্পষ্ট হলেও, অবয়ব দেখে মনে হল, কোন মহিলা বসে আছে। বৈজু ড্রাইভারের সীটে, তৈরি হয়ে বসে আছে, হুকুম পেলেই চালাবে।

অলকের যেমন একটা কর্তৃত্বের ভঙ্গি সব সময়ে থাকে, সেই ভাবেই, হাত তুলে, আঙুল নেড়ে, গাড়ির ভিতরের মহিলাকে, ডেকে বলল, 'এই যে, শোন, এদিকে এস, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। বৈজু, ভেতরের আলোটা জ্বাল তো।'

গাড়ির ভিতরে আলো জ্বলে উঠল। দেখলাম, বাইশ-তেইশ বছর বয়সের একটি মেয়ে, সলজ্জ হেসে, বাঁ দিকের জানালার কাছে এগিয়ে এল। দুহাত জোড় করে, নমস্কারের ভঙ্গি করছে। মেয়েটি বসে থাকলেও, বুঝতে অসুবিধা হয় না, সে মাঝারি লম্বা। দোহারা বা একহারা, কোনটাই নয়, দুয়ের মাঝামাঝি। রোগা মোটা,

কোনটাই বলা চলবে না। দেখে, যতটা বলা চলে, তাতে বলা যায়, স্বাস্থ্যটি ভালই। রঙ ফরসা, মুখখানি একটু গোল ধরনের, কিন্তু চৌকো ফোলা নয়। ভবিষ্যতে, এ মুখ মোটা হলে, কেমন দেখতে হবে, বলতে পারি না। এখন, অল্প বয়সের ছাপটা আছে বলে, দেখতে ভালই লাগে।

মেয়েটির মুখ একটু যেন চেনা চেনাই লাগছে। কোথায় দেখেছি, মনে করতে পারছি না। পাড়বিহীন গোলাপী শাড়ি, আর গোলাপী রঙের জামা। জামার হাতা, কাঁধে ছিলতে মত আছে। চোখে আমার পড়েছে ঠিকই, নাভির নীচে তার শাড়ির বন্ধনী, জামা বুকের নীচেই শেষ, অতএব পেট এবং নাভিদেশ সহ কোমরের স্ফীত অংশও কিঞ্চিৎ চোখে পড়ে। মাথার চুলে তেল নেই, রুক্ষু রুক্ষু ভাব। সিঁথি প্রায় কাটা নেই বললেই চলে, কপালের কাছ থেকে, সামান্য একটু ভাগ করে, প্রায় উল্টে আঁচড়ানো চুলকে, মাথার পিছনে কিলিপ দিয়ে গোছ করেছে। মোটা একটা বেণী কাঁধের ওপর দিয়ে, বুকের ওপর এসে পড়েছে। অলক বলল মেয়েটির দিকে চেয়ে, 'ইনিই সেই নাট্যকার, যার কথা তুমি বিশ্বাস করতেই চাইছিলে না যে, আমাদের সঙ্গে যাবে।'

মেয়েটি যেন একটু সঙ্কুচিত লজ্জায় হাসল, বলল, 'আহা, তাই বলেছি নাকি।'

অলক চেয়ে আছে অন্যদিকে, কিন্তু বলল মেয়েটিকেই, 'বল নি, আমাদের সঙ্গে উশীনরের মত নাট্যকার কখনো এভাবে বেরিয়ে পড়বে না? এখন দেখ, এতটা আণ্ডার-এস্টিমেট করো না।'

মেয়েটি লজ্জিত ভাবেই বলল, 'বলে থাকলে মাপ করে দেবেন, তা বলে আণ্ডার-এস্টিমেট করব কেন আপনাকে।'

শান্তনু প্রায় ধমকের সুরে বলে উঠল, 'করেছ করেছ, তোমরা মেয়েরা ওই রকমই, চান্স পেলেই, মাথায় ওঠবার চেষ্টা কর।'

মেয়েটি অভিমানের ভঙ্গিতে, একটু চোখ বড় করল। আমি বললাম, 'যাক গে, ও নিয়ে আর—'

আমার কথা শেষ হবার আগেই, অলক বলে উঠল, 'হ্যাঁ, উশীনর, এর নাম সুদীপা—'

মেয়েটি বলে উঠল, 'সুদীপা না অলকবাবু, সুদীপ্তা।'

অলক শুনে হাতঝাপটা দিয়ে বলল, 'আরে ধেত্তরি, অত কেউ মনে রাখতে পারে। ওই সুদীপা সুদীপ্তা একই কথা।'

সুদীপ্তা কথা বলল না, হাসল। শান্তনু তার মোটা গলায় আবার খ্যাঁক করে উঠল, 'নিন, এখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে পরিচয় পাড়তে থাকুন, আজ রাত্রে আর স্টার্ট করে দরকার নেই। এবার আমি বাড়ি চলে যাব, বলে দিচ্ছি।'

বলেই সে গাড়ির দরজা খুলল। সুদীপ্তা যেন একটু বিশেষ ভাবে চকিত হয়ে, তাড়াতাড়ি সরে ডান দিকের কোণে চলে গেল। আমি ধরেই নিলাম শান্তনু, অলক আর সুদীপ্তা পিছনের সীটে বসবে। আমি সামনের দিকে এগিয়ে গেলাম। মস্ত বড় গাড়ি পিছনে তিনজন বেশ আরাম করে যেতে পারবে। সামনে তো কোন কথাই নেই, আমি প্রায় শুয়েই যেতে পারব।

সামনের দরজাটা খুলতে যেতেই, শান্তনু তাড়াতাড়ি আমার পাশে এসে বলল, 'সরি স্যার, সারা রাস্তায়, সব সময়ে আমি আপনার হুকুমের চাকরের মত কাজ করব, এ জায়গাটা আমাকে ছেড়ে দিন।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'সে কি, আপনি পিছনে বসবেন না?'

'না স্যার, আপনি কাইণ্ডলি পিছনে বসুন। কিছু মনে করবেন না যেন।'

অলক বলে উঠল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, তুমি পেছনেই এস উশীনর, শান্তনুবাবুকে সামনেটা ছেড়ে দাও।'

আমি যেন একটু অস্বস্তি বোধ করলাম। ধরেই নিয়েছিলাম, অলক শান্তনু সুদীপ্তা, পরস্পরের পরিচিত, সেই কারণেই সুদীপ্তাকে সঙ্গে নিয়ে চলেছে, ওরা নিশ্চয় একসঙ্গে পাশাপাশি বসে যাবে। শুধু পাশাপাশি বসে যাওয়া নয়, তার থেকে বেশী কিছু হলেও,

আমার দিক থেকে মনে করার কিছু নেই। কেন যে সুদীপ্তাকে আমার চেনা চেনা মনে হচ্ছিল, এখন বুঝতে পারছি। সুদীপ্তা আসলে একজন ছোটখাটো অভিনেত্রী। 'কিন্নরী'তে এখন যে নাটকটা চলছে, সে নাটক আমি দেখেছি। সুদীপ্তা সেই নাটকের একটি ছোট ভূমিকায় অভিনয় করে। একটি রূপসী চটুল কিন্তু নষ্ট মেয়ের ভূমিকা। মনে থাকার কারণ, সুদীপ্তা অভিনয়টা মন্দ করে নি। কিন্তু সুদীপ্তাকে নিয়ে, এরকম একটা যাত্রার সঙ্গিনী করার কী কারণ থাকতে পারে, আমি জানি না, সেই কারণেই ভাবছিলাম, বেশী কিছু হলেও, আমার মনে করার কিছু নেই। হয়তো অলক বা শান্তনুর সঙ্গে, সুদীপ্তার, মঞ্চের বাইরেও কোন সম্পর্ক থাকতে পারে। থাকলে সেটা খুব আশ্চর্যের ব্যাপার না। মঞ্চের মালিক এবং প্রযোজক বা নাট্য-পবিচালকের সঙ্গে, অভিনেত্রীদের বিশেষ সম্পর্কের কথা, হামেশাই শোনা যায়। এতে কেউ-ই অবাক হয় না, একটু হেসে, যাকে বলে স্ক্যাণ্ডাল করা, সেই ভাবে একটু আলোচনা করতে পারে।

আমার দিক থেকে সে-সম্ভাবনাও নেই। স্ক্যাণ্ডাল করা আমার ভাল লাগে না, কারণ নানাবিধ কারণে, আমি নিজেই এই ব্যাপারের অনেক শিকার হয়েছি। তার পিছনে কোন কারণ থাকুক বা না থাকুক। তা ছাড়া, অলক আমাকে বন্ধু বলে মনে করে, ইদানীং সেই দাবিটা ওর প্রবল। অতএব, ওর যদি কোন মেয়ের সঙ্গে, কিছু ব্যাপার থাকে, বা কোন—যাকে বলে 'ভাইস্' থাকে, তা নিয়ে আমি বাইরে কারোর কাছে গাবাতে যাব না। অলকেরও আমার ওপর নিশ্চয় সে বিশ্বাস আছে। অলকের মারফত, শান্তনুও, কিছুদিন আমার সঙ্গে মিশছে। তার হাঁকডাক করা চরিত্র, কাজের প্রতি আসক্তি এবং পরিশ্রমী লোক হিসাবে, তাকে যে আমি পছন্দ করি, এটা সে জানে। আমাকেও তার ভাল লেগেছে, এবং সে, আমার সঙ্গে পরিচয়ের অনেক আগে থেকেই, আমার নাটকের বিশেষ ভক্ত। তার নিজের তৈরি যে নাট্যসংস্থা আছে, সেখানে সে ইতিপূর্বেই,

আমার দুটি নাটক মঞ্চস্থ করে অনেক প্রশংসা পেয়েছে। সাক্ষাৎ-পরিচয়ের পরে, সে আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতে চাইছে। বয়স আমাদের প্রায় সমান। সে আমাকে নাট্যকার হিসাবে যতটা শ্রদ্ধা করে, ততটাই বন্ধু হয়ে উঠতে চায়।

এই চাওয়াটাকে আমি কখনোই অন্যায় মনে করি না। যদিও, শান্তনুর শ্রদ্ধা ভালবাসার ভাষা এবং আচরণের ভার ও ধার, সকলের পক্ষে হয়তো, সহনীয় না হতেও পারে। কয়েকদিন পরিচয়ের পরেই, সেটা আমি জেনেছি। আলাপের প্রথম দিকে, তার ভাষা বা আচরণ যতটা সংযত ছিল, কিংবা বলা যায়, যতটা সে তার নিজেকে স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশ করতে পারে নি, পরে সেটা করেছিল, এবং তখনই তাকে আমি, ভাল করে চিনতে পেরেছিলাম। যেমন হয়তো, আমার কোন নাটকের কথায়, সে বলে উঠল, 'ওহ্, শালা জুতো!' এটা প্রশংসার, একেবারে সব থেকে উঁচু ডিগ্রির ইমোশনাল প্রকাশ। কিংবা কোন নাটকের বিশেষ কোন নাটকীয় অংশের উল্লেখ করে সে বলে উঠল, 'মাইরি, একেবারে মড়া জাগানো মোমেন্ট, বাপের নাম ভুলিয়ে দেয়।' কোন বিশেষ ডায়ালগের কথা তুলে, হয়তো বলল, 'কিছু মনে করবেন না উশীনরবাবু, দারুণ খচ্চর না হলে, ওরকম ডাইরেক্ট ইন্টেলিজেন্ট ডায়ালগ কেউ লিখতে পারে না। দোহাই, পায়ে পড়ি, কিছু মনে করলেন না তো?'

প্রকৃতপক্ষে, মনে করার কোন উপায় নেই। আমি একজন বয়োঃজ্যেষ্ঠ ব্যক্তি নই, দশজনের সামনে কথাগুলো হচ্ছে না, এবং আমি জানি শান্তনুর এই ভাষাগুলো নিখাদ, একেবারে অন্তর থেকে স্বতোৎসারিত। আমি যাদের খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু বলে মনে করি, যাদের আমি আমার নাটক পড়ে শোনাই, তাদের অনেকের মুখ থেকেই, উচ্ছ্বাসের ধাক্কায় ওরকম কথা শোনা যায়। শান্তনুর ব্যাপারেও, আমি কিছু মনে করি নি। ভক্তের নানা রূপ হয়। শান্তনুও একটা রূপ। যদিও এ কথাটাও আমি কখনো ভুলি না, শান্তনু একজন গুণীও বটে। তবে, সে আমাকে কেবল প্রশংসাই করে

না, আমার সমালোচকও বটে। কোন নাটকের উল্লেখ করে হয়তো বলে উঠল, 'ওটা যা লিখেছেন স্যার, একদম ধোঁকাবাজী, কিছু মনে করবেন না। ওটা গঙ্গায় নিয়ে ফেলে দিন।'

শান্তনুর বলার ভঙ্গিতে, আমি হাসি, যদিও সত্যি সত্যিই, আমার মনটা খারাপ হয়ে যায়। যাই হোক, এরকম সম্পর্ক যাদের সঙ্গে, তারা যদি আমার সামনে, মেয়েবন্ধু নিয়ে, একটু উতল মাতাল হয়, তাতেই বা আমার মনে করার কী আছে।

আমি দরজা খুলে, অলকের পাশে, দরজার ধারে বসতে যাচ্ছিলাম। সুদীপ্তা বলে উঠল, 'আপনি এদিকটায় আসুন না, এই মাঝখানে।'

অর্থাৎ, সুদীপ্তা আমাকে ওর পাশে বসতে বলছে। আমি কিছু না ভেবেই বললাম, 'না না, ঠিক আছে, আপনি বসুন, আমি ধারেই বসি।'

ইতিমধ্যেই অলক সুদীপ্তার পাশ থেকে উঠে, আমার হাত ধরে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ উশীনর, তুমি এখানে এস, ও যখন চাইছে।'

বলতে বলতেই, আমাকে টেনে, টপকে, অলক ততক্ষণে ধারে চলে গিয়েছে, আমি মাঝখানে পড়ে গিয়েছি। কিন্তু অলকের কথার সুরটা যেন কেমন শোনাল। 'ও যখন চাইছে' কথাটার মানে কী? নিশ্চয় সুদীপ্তা চাইলেই, আমি তার পাশে গিয়ে বসতে পারি না। অবিশ্যি, সুদীপ্তা নিজেও আমাকে মাঝখানে বসার জন্য ডেকেছে, এবং সেটা খুব একটা আশ্চর্যের ব্যাপার না। প্রথম পরিচয়, হয়তো কথাবার্তা আলাপের জন্যই, কাছাকাছি বসতে চেয়েছে। তখনো গাড়ির ভিতর আলোটা জ্বলছে। আমি অলকের মুখের দিকে একবার তাকালাম। ও তখন, পিছনের উইণ্ডস্ক্রীনের পাশে গাদা খানেক জিনিসপত্রের মধ্যে কিছু একটা খুঁজছে। ওর মুখে, রাগ বিরাগ বা বিদ্রূপের কোন লক্ষণই দেখতে পেলাম না। যদি ওর মনে কিছু থেকেই থাকে, তা হলেও আমার, আপাততঃ কিছু করবার বা বলবার নেই। আমি সুদীপ্তার দিকে তাকালাম, সুদীপ্তা একটু মিষ্টি করে হাসল।

সুদীপ্তার হাসিটি সুন্দরই বলতে হবে। একটি দাঁত সামান্য একটু গজ মত, সেই কারণেই কী না জানি না, একটা চটুল ভাব থাকলেও, হাসির মধ্যে বিশেষ একটি ঝিলিক আছে। দেখতে সুন্দর অনেক মেয়ের যেমন আছে, হাসিটা তাদের কেমন যেন বোকা বোকা, সুদীপ্তার তা না। যেন একটা বুদ্ধির দীপ্তির সঙ্গে, ঝংকৃত মনের খোঁজ পাওয়া যায়। ও বলল, 'আপনি ভাল করে বসুন না।'

বলেই, আমার পাশ থেকেই, কী ধরে যেন টান দিল, আর সেই মুহূর্তেই অলক একটু অস্পষ্ট ভাবে বলে উঠল, 'হ্যাঁ, গায়ের সঙ্গে লেপ্‌টে বস।'

কথাটা অস্পষ্টভাবে সুদীপ্তাও বোধহয় শুনতে পেল, তাই জিজ্ঞেস করল, 'কী বললেন অলকবাবু?'

অলক বলল, 'না, কিছু না, বৈজু, গাড়ি স্টার্ট কর!'

গাড়ির এঞ্জিনেব শব্দ বাজল, আর অলক আমার কোলের কাছে, আঙুল দিয়ে টিপে, কিছু ইশারা করল। যে-ইশারার একটি অর্থই হয়, 'তুমি কিছু বলো না।' কিন্তু কথাটা অলক, কী ভেবে, কী ভাবে বলছে, ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি বুঝতে পারছি না, সুদীপ্তার সঙ্গে, ওব সম্পর্কটা ঠিক কী রকমের। ও কি সুদীপ্তার পাশে বসতে না পারায়, বা সুদীপ্তা ডেকে তার পাশে আমাকে বসতে বলায়, কোনরকম হতাশ ও ক্ষুব্ধ হয়েছে। সেটা আমার একেবারেই কাম্য না। কিন্তু ওর কথায় ব্যবহারে, তা মোটেই বোঝা যাচ্ছে না। তার থেকেও বড় কথা, সুদীপ্তা আমার সঙ্গে যাচ্ছে না, ওদের সঙ্গেই যাচ্ছে, এবং সুদীপ্তার যদি কোন দায় থাকে, তবে তা আমার কাছে না, অলক শান্তনুর কাছেই আছে। কারণ, অলক 'কিন্নরী'র মালিক, শান্তনু 'কিন্নরী'র সার্থক পরিচালক।

অলক তখনো সীটের পিছনের তাকে হাতড়াচ্ছে। বড় গাড়ি, পিছনে, উইণ্ডস্ক্রীনের ধারে জায়গাটা অনেকখানি। সেখানে কী কী আছে, আমি জানি না, তবে কাগজে মোড়া অনেক কিছু আছে,

এটাই মোটামুটি লক্ষ্য করেছি। গাড়ি তখন চলতে আরম্ভ করেছে। শান্তনু অলককে জিজ্ঞেস করল, 'কী, খুঁজছেন কী আপনি?'

অলক বলল, 'চিঁড়েভাজার ঠোঙাটা।'

শান্তনু ঝেঁজে উঠল, 'ধুত্তোরি নিকুচি করেছে চিঁড়েভাজার। রাত্রের খাওয়াই খাওয়া হল না এখনো, এখন চিঁড়েভাজা খুঁজছে।'

সুদীপ্তা খিল খিল করে হেসে উঠল, বলল, 'সে কি, এখন চিঁড়েভাজা খাবেন কি অলকবাবু?'

অলক নির্বিকার গলায় বলল, 'খিদে পেয়েছে, তা ছাড়া একটু মাল খাব তো এখন, তাই চিঁড়েভাজা চাই।'

একটি মেয়ের সামনে, এভাবে, 'মাল' শব্দ উচ্চারণ করায়, আমি মনে মনে একটু অস্বস্তি বোধ করলাম। একবার সুদীপ্তার মুখের দিকে তাকালাম। রাস্তার আলোয় দেখলাম, আমার দিকে চেয়ে সে হাসছে। হাসির মধ্যে মজা পাওয়ার খুশির ঝিলিক। বলল, 'অলকবাবু বেশ কথা বলেন।'

'তাও তো এখনো সব শোন নি।'

অলক এ কথা বলেই, একটা ঠোঙা টান দিয়ে বলে উঠল, 'এই যে, পেয়েছি।'

সুদীপ্তা বলল, 'তাই বুঝি।'

কথাটা হাসিমুখেই বলল, তথাপি আমার মনে হল, তার স্বরে যেন একটা সংশয়ের ছায়াও রয়েছে। শান্তনু বিরক্ত স্বরে বলল, 'যা খুশি তা-ই করুন গে, পথের থেকে এখন আমি খাবার না নিয়ে পারব না।'

অলক ভারিক্কি চালে বলল, 'নিন না মশাই, বারণ করেছে কে?'

শান্তনু বলল, 'আরে মশাই, আমি তো আপনার, মাসে দেড়-হাজার টাকার গোলাম। খাবারটা কী নেওয়া হবে, কোথা থেকে নেওয়া হবে, সে অর্ডারটা কে দেবে? আমার কথা বাদ দিন, উশীনরবাবুর কথা ভাবুন, ওঁরও তো খেতে হবে। না কি আপনার চিঁড়েভাজা আর মাল টানলেই, সকলের পেট ভরে যাবে।'

অলক একমুঠো চিঁড়েভাজা মুখে ফেলে, চিবোতে চিবোতে বলল, 'নাঃ, লোকটার খিদে পেলে, বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পায়। আমি কি তাই বলেছি নাকি। আপনি যেখান থেকে খুশি, যা খুশি খাবার নিন না। আমি টাকা দিচ্ছি।'

অলকের কথা শুনেই, সুদীপ্তা হেসে উঠেছিল। শান্তনু তাকেও ধমক দিয়ে উঠল, 'এই মেয়েটা, খ্যাল্ খ্যাল্ করে হেসো না তো, আমার ভাল লাগে না।'

সুদীপ্তা বলল, 'কী করব শান্তনুদা, অলকবাবুর কথা শুনলেই আমার হাসি পেয়ে যায়।'

অলক চিঁড়েভাজা চিবোতে চিবোতে, এক ধরনের সানুনাসিক সুরে বলল, 'দাঁড়াও, আরো অনেক কিছু হবে।'

সুদীপ্তা হেসে আমার দিকে তাকাল। সে ইতিমধ্যেই, আমার কোমরের নীচে চাপা পড়া, একটা বড় বেডকভারের মত কিছু টেনে, নিজের ডান দিকে রেখেছে, এবং সেটার ওপরে কনুইয়ের ভর রেখে, তার বাঁ দিকে বেঁকে, অর্থাৎ আমার দিকে ফিরে বসেছে। সুদীপ্তা শান্তনুকে, শান্তনুদা বলল। কী হিসাবে দাদা, এবং কেন, আমি কিছুই জানি না।

শান্তনু বৈজুকে একটা রাস্তার নাম করে, বিশেষ একটি চীনা রেস্তোরাঁয় যেতে বলল। সেখান থেকেই খাবার নেওয়া হবে। তারপরেই শান্তনুর গলা শুনতে পেলাম, 'উশীনরবাবু।'

আমি তার দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সে সামনে রাস্তার দিকে তাকিয়ে, আমাকে ডাকছে। আমি বললাম, 'বলুন।'

শান্তনু মুখ না ফিরিয়েই, গম্ভীর ভাবে বলল, 'উই আর অল ফ্রেণ্ডস্। সবাই একসঙ্গে যাচ্ছি, সবাই সবাইকে একটু মানিয়ে নেবেন, মানে কিছু যদি অন্যায়-ত্রুটি হয়, ক্ষমা-ঘেন্না করে নেবেন।'

আমি হেসে বললাম, 'সেটা আমিও বলছি।'

অলক তখনো তার 'মাল' খাওয়া শুরু করে নি। তবে চিঁড়েভাজা সমানেই চিবিয়ে চলেছে। ও বলে উঠল, 'তা বলে, আপনি যদি

এখন পশ্চাদ্দেশে চিমটি কাটেন, তাহলে ক্ষমা-ঘেন্না করা যাবে কী করে?'

সুদীপ্তা আবার হেসে উঠে, তাড়াতাড়ি মুখে আঁচল চাপা দিল। শান্তনু বলল, 'সেটা কাটলে, আপনাকেই কাটব।'

অলক বলল, 'তা তো কাটবেনই, আমার পাছাটা মোটা দেখেছেন তো। একে বলে, প্রোডিউসারের পাছা।'

সুদীপ্তা কিছুতেই হাসি চাপতে পারল না। আমারও হাসি পাচ্ছিল। পাছে শান্তনু দুঃখ পায়, তাই চাপতে হল। অলক আমাকে বলল, 'বুঝলে উশীনর, নো ফর্মালিটি, বী ফ্রী, রিলাকস্ ইওরসেলফ্। এখন আমরা সবাই রাজা, আমাদের এই গাড়ির রাজত্বে।'

আমি হেসে বললাম, 'ঠিক আছে, তোমাকে এত করে বলতে হবে না।'

বলে আমি সুদীপ্তার দিকে একবার তাকালাম। সুদীপ্তা সামনের দিকে তাকিয়েছিল, মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল। তারপরে অলকের দিকে ফিরে বলল, 'আপনারা যদি সবাই রাজা, আমি তা হলে রাণী।'

অলক বলল, 'শুধু রাণী না, মক্ষীরাণী।'

সুদীপ্তা যেন কপট ভয়ে হেসে বলল, 'উ রে বাবা, মক্ষীরাণী-টানী হতে চাই না।'

ইতিমধ্যে গাড়ি চীনা রেস্তোরাঁর সমানে এসে দাঁড়াল। অলক ওর পার্স খুলে, একটি একশো টাকার নোট শান্তনুকে দিয়ে বলল, 'দেখবেন, একশো টাকার খাবারই আনবেন না যেন। আপনার তো আবার দৃষ্টিখিদে, গাদা খানেক নিয়ে নেবেন হয়তো।'

শান্তনু নোটটা নিয়ে নেমে যেতে যেতে বলল, 'সে তো চিঁড়েভাজা চিবোবার বহর দেখেই বোঝা যাচ্ছে, কে কত গিলবে।'

উভয়ের কথোপকথনই নির্বিষ। তিক্ততার থেকে রসের ঝাঁঝটাই বেশী, ফলে আবহাওয়াটা হাসির আমেজে ভরে উঠেছে। কিন্তু

সত্যি বলতে কি, আমার চিন্তাটা আপাততঃ সুদীপ্তাকে ঘিরেই যেন পাক খাচ্ছে। চিন্তাটা অবশ্যই মনের দুর্বলতাজনিত, পুরুষ চিন্তার পাক খাওয়া না। আমি ভাবছি, সুদীপ্তাকে নিয়ে এরা চলেছে কেন। 'কিন্নরী'র নাম-করা নায়িকা সুপর্ণা। যতদূর জানি বা দেখেছি, অলক বা শান্তনুর, সে খুব খাতিরের নায়িকা। তাকে সঙ্গে না নিয়ে, সুদীপ্তাকে কেন? সুদীপ্তা 'কিন্নরী'র নাম-করা অভিনেত্রী নয়। স্বয়ং 'কিন্নরী'র মালিক এবং পরিচালকের সঙ্গে, সুদীপ্তা যেভাবে কথা বলছে, তাতে মনে হচ্ছে, খুব একটা সম্ভ্রম বা ভয়ের সঙ্গে কথা বলছে না। অথচ, ছোটখাটো অনেক অভিনেত্রীকে দেখেছি, অলক বা শান্তনুর সঙ্গে কথা বলে যেন জুজুবুড়ির মত ভয়ে ভয়ে। যেন পান থেকে চুন খসলেই বিপদ। সুদীপ্তা যেরকম হেসে সহজ ভাবে কথা বলছে, যেন অনেকটা বন্ধুর মতই। ডিগ্রিতে সে নিশ্চয় নায়িকা সুপর্ণা নয়, তবে দেখে-শুনে মনে হচ্ছে, অনেকখানি। আমি সুদীপ্তাকে বললাম, 'আপনার যাবার কথা জানতাম না।'

সুদীপ্তা বলল, 'দেখুন না, অলকবাবুর কাণ্ড। আজ দুপুরে টেলিফোন করে আমাকে বললেন, সঙ্গে যেতে হবে।'

অলক ওর স্বাভাবিক ভাষা এবং ভঙ্গিতে বলল, 'তোমার কথাটা আগে মনে পড়ল। ভাবলাম, সঙ্গে একটি মেয়ে না থাকলে, জার্নিটা কেমন ন্যাড়া ন্যাড়া লাগছে।'

সুদীপ্তা ঝুঁকে পড়ে, অলকের দিকে চেয়ে বলল, 'আমাকে কিন্তু আপনি তা বলেন নি অলকবাবু। আপনি আমাকে বলেছিলেন, "তোমার যাওয়া দরকার। তোমাকে হিরোইনের রোলটা দেওয়া যায় কী না, আমরা সেটা ভাবছি। তুমি সঙ্গে থাকলে, লেখক একটা ইমেজ পাবে।" '

আমি অবাক হয়ে, অলকের দিকে তাকালাম। অলক আমার দিকে তাকাল না। ও কোনদিকেই তাকাবার পাত্র নয়, নিজের চিন্তা অনুযায়ী, কথা বলা ও কাজ করে যাবার পাত্র। বলল, 'হ্যাঁ, সেটা

তো আছেই, এক কাজে, দু-কাজ হয়ে যাবে। লোকে বলে, পথি নারী বিবর্জিতা। আমি তা মানি না, বরং একজন মেয়ে সঙ্গে থাকলে, ভাল হয়।'

বলে, আমাকে বলল, 'বুঝলে উশীনর, সুদীপ্তাকে নিয়ে, তুমি একটু ভেব।'

আমি অলকের মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। একবার সুদীপ্তাকেও দেখলাম। সুদীপ্তা তখন আমার মুখের দিকেই চেয়ে আছে। কিন্তু অলকের কোন কথাটা সত্যি, কিছু বুঝতে পারছি না। সত্যি কি, সুদীপ্তাকে নতুন নাটকের নায়িকা করতে চায়? না কি, আসলে নিতান্ত মেয়ে-সঙ্গী হিসাবেই নিয়ে চলেছে? সুদীপ্তা কতখানি নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করার যোগ্য আমি তা জানি না। কিন্তু সুপর্ণাকে বাদ দিয়ে, সুদীপ্তা কি 'কিন্নরী'র নায়িকা হতে পারবে? বিশ্বাস হয় না। 'কিন্নরী' আর সুপর্ণা, দর্শক-সমাজের কাছে, প্রায় একটা অভিন্ন সত্তা। প্রযোজক পরিচালক তা ভুলতে পারে না। তা-ই আমার মনে হয়, সুদীপ্তাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়াটাই আসল কথা। সেই সঙ্গে একটু লোভের হাতছানি দিয়ে রাখা। তা না হলে হয়তো, সুদীপ্তা আসত না।

ব্যাপারটা আমার কাছে খুব ভাল লাগল না। যদিও, আমি কখনোই কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রীকে দেখে, ভেবে কোন নাটকই লিখি না। শুনেছি, পাবলিক স্টেজের অনেক নাট্যকার তা করে থাকেন। আমার মনে হয়, তাতে নাটক রচনা ব্যাহত হয়। সমস্ত নাটক জুড়ে, একজন ব্যক্তির একাধিপত্য চলে। নাট্যকার যে সমাজ পরিবেশ ও ঘটনা নিয়ে নাটক রচনা করে, তার দৃষ্টি সেই পরিবেশের বাস্তব চরিত্র ও চেহারার প্রতি থাকা উচিত। সুদীপ্তাকে নায়িকা চিন্তা করে, আমি কখনোই নাটক লিখব না, লিখতে পারব না। এমন কি, সুপর্ণাকে ভেবেও আমি নায়িকা চরিত্র লিখতে পারব না। আমার দৃঢ়বিশ্বাস, অলক নিজেও সে কথা ভালভাবেই জানে। তা না হলে, সুদীপ্তার কথা সে আমাকে

আগেই বলত। কিন্তু এ বিষয়ে, এখন সুদীপ্তার সামনে কিছু বলতে চাই না। ব্যাপারটা আমাকে জানতে ও বুঝতে হবে। এখন আমার মনে পড়ছে, কয়েকদিন আগে অলকের সঙ্গে শান্তনুর কথা হচ্ছিল। অলক বলেছিল, 'কিন্তু এরকম ড্রাই জার্নিটা আমার ঠিক পছন্দ হচ্ছে না।

শান্তনু বলেছিল, 'ড্রাই হবে কেন, বোতল তো যাচ্ছেই।'

অলক : 'আরে দূর মশাই, সে কথা বলছি না? একজন কাউকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া দরকার।'

শান্তনু : 'ও আপনি মেয়ের কথা বলছেন? ওসব ঝামেলার মধ্যে আমি নেই।'

তারপর আর সে বিষয়ে কোন কথা হয় নি। এখন বোঝা যাচ্ছে, সুদীপ্তাকে সেই জন্যই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, কারণ সঙ্গে একজন মেয়ে থাকা দরকার। কিন্তু তার জন্য, সুদীপ্তাকে মিথ্যা কথা বলতে হল কেন? আমার তো ধারণা, সুদীপ্তা এমনিতেই; অলক-শান্তনুর কৃপাপ্রার্থিনী। সঙ্গে যেতে বললে, এমনিতেই কি সে যেত না?

অবিশ্যি, আমি এ ব্যাপারের কিছুই জানি না। সুদীপ্তার বিষয় কিছুই জানি না। শুধু এইটুকু বুঝতে পারছি, তাকে সম্ভবতঃ একটা মিথ্যা আশা দেওয়া হয়েছে।

অলক হঠাৎ দরজা খুলে, নামতে নামতে বলল, 'দেখি তো, লোকটা ভেতরে খেতে বসে গেল কী না।'

ও নেমে গেল। সুদীপ্তা আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'এ নাটকটা লিখতে আপনার কতদিন লাগবে?'

বললাম, 'ঠিক বুঝতে পারছি না। ঘুরে এসে আমি লিখতে বসে যাব। মাস খানেকের মত লাগতে পারে।'

সুদীপ্তা বলল, 'জানেন, আমি আপনার ছুটো নাটকে অভিনয় করেছি।'

'তাই নাকি।'

'হ্যাঁ, শান্তনুদার গ্রুপে আমি আছি। আপনার 'অলকানন্দা' আর 'জীবনসত্ত্ব' দুটো নাটকেই আমি কাজ করেছি।'

এখন বুঝতে পারছি, শান্তনুকে সুদীপ্তা কেন দাদা বলেছিল। জিজ্ঞেস করলাম, 'কিন্নরী'তে বুঝি শান্তনুবাবুই আপনাকে নিয়ে এসেছেন?'

'হ্যাঁ। অবিশ্যি 'কিন্নরী'তে এসে আমি হ্যাপি নই। এত ছোট রোলে আমার কাজ করতে ইচ্ছে করে না।'

আমি মনে মনে উদ্বেগ বোধ করলাম। নতুন নাটকে নায়িকার প্রসঙ্গটা যদি সুদীপ্তা তোলে, তা হলে, আমি কী বলব? মুখের ওপর সরাসরি মিথ্যা কথা বলতে আটকাবে। যদিও সত্যি কথা বলতে, আমার আটকাবার কোন কারণ নেই। এই জার্নির পরে, আর কোনদিনই বোধহয় সুদীপ্তার সঙ্গে আমার দেখা হবে না। তবু আটকাবে, কারণ সুদীপ্তার আশাভঙ্গ করতে চাই না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনি কি শুধু অভিনয় করেন, না আরো কিছু করেন?'

সুদীপ্তা একটু যেন জিজ্ঞাসু চোখে, আমার দিকে তাকাল। আমার প্রশ্নটা তো খুবই সহজ, চোখের দিকে তাকিয়ে বোঝবার কি আছে। কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে, একটু হেসে বলল, 'হ্যাঁ, এখন তো তাই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে দেখছি। পড়াশোনা সব গোল্লায় চলে গেছে।'

'আপনি পড়ছিলেন নাকি?'

'হ্যাঁ, কলেজে পড়তে পড়তে ছেড়ে দিয়েছি। বি.এ. পাসটা আর করা হল না।'

'অভিনয়ের জন্য?'

'পুরোপুরি তা নয়। টাকা-পয়সার অভাবও ছিল, মানে—'

কথাটা শেষ না করে, সুদীপ্তা ওর হাতের ছোট্ট রুমালটা, কোলের ওপর ঝাপটা দিল কয়েকবার। তারপরে মুখ তুলে বলল, 'মানে, সংসার বড় হলে যা হয়, বাবার পক্ষে ঠিক লেখাপড়া শেখানো

সম্ভব হচ্ছিল না। তা ছাড়া আমারও অভিনয়ের দিকে ভীষণ ঝোঁক। আমি দশ বছর বয়স থেকেই অভিনয় করছি।'

আমি যেন, সুদীপ্তার কথার মধ্যে, একটা অনিশ্চয়তা, নিরাপত্তার অভাব এবং দুর্গতির ছবি ফুটে উঠতে দেখলাম। বড় সংসার, বাবার আর্থিক অক্ষমতা, এর পরে, কোন মেয়েরই বোধহয়, নিজের দুরবস্থার কথা আর বেশী বলতে হয় না। এর থেকে বেশী খুঁটিয়ে, জিজ্ঞেস করবারও দরকার হয় না, অভিনয় করাতে, তার বাবা-মায়ের আপত্তি আছে কী না, কিংবা অভিনয় করে, সুদীপ্তা তার বাবার সংসারে সাহায্য করে কী না। যে বাবার লেখাপড়া শেখাবার আর্থিক সামর্থ্য নেই, সেই বাবা যে মেয়েকে বিয়ে দিয়ে, জীবনে প্রতিষ্ঠা করবে, তা সম্ভব না। এখন সম্ভবতঃ, সুদীপ্তার অভিনয়, হাসি, কথাবার্তা, পোশাক, এবং আজকে রাত্রের এই যাত্রা, সবই জীবনের দায়।

আমি সুদীপ্তার দিকে ফিরে তাকালাম। আমার দৃষ্টি পড়ল, শাড়ি-ব্লাউজ থেকে মুক্ত, ওর পেট, নাভিস্থল এবং কোমরের কিছু অংশে। সুদীপ্তা যেন তাতে একটু লজ্জা পেল। শাড়ি দিয়ে, মুক্ত অংশ ঢাকতে চাইল, তবু যেন ঢাকা পড়ল না, এবং কোমরে মোচড় দিয়ে, ও একটু নড়ে চড়ে বসল, আমার দিকে চেয়ে হাসল। আমি হেসে চোখ সরালাম, কিন্তু মনে মনে স্বীকার না করে পারলাম না, সুদীপ্তার সুগঠিত শরীরের একটি আকর্ষণ আছে। ওর পেটে কোথাও মেদ নেই, সুবর্ত নাভির চারপাশ পাতলা এবং মসৃণ, এবং কটির নীচে কোমরের যে অংশটুকু বেরিয়ে আছে, তার বৃত্তের সুঠাম বিস্তৃতি দেখে, বোঝা যায়, ওর কোমর সুন্দর। বুকের গঠন মাঝারি, গ্রীবা দীর্ঘ। পুরুষের চোখ, এতে একটু মুগ্ধ হলে, তাকে দোষ দেওয়া যায় না।

সুদীপ্তা মুখ ফিরিয়ে, ঘাড় কাত করে, হেসে বলল, 'আপনাকে তখন কেন মাঝখানে এসে বসতে বললাম, জানেন?'

'না তো।'

'অলকবাবুকে আমার ভীষণ ভয় করে।'

'ভয়?'

'হ্যাঁ, ড্রিংক করে, কী অবস্থা দাঁড়াবে, কে জানে। এমনিতে ওঁকে আমার বেশ লাগে, কিন্তু মনে হয়, উনি যেন কেমন বেপরোয়া ধরনের।'

'তা হলেও, কী-ই বা করতে পারে।'

'বলা যায় না, আমার ভীষণ ভয় করে!'

আমি হেসে বললাম, 'আমার ওপরেই বা আপনার ভরসা কী!'

সুদীপ্তা ওর বড় চোখ দুটো, আমার চোখের ওপর তুলে বলল, 'আপনাকে দেখে সেরকম মনে হয় না।'

সুদীপ্তার কথায়, আমি আবার হেসে উঠলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'দেখে কি আপনি মানুষ চিনতে পারেন?'

সুদীপ্তা ওর ছোট্ট লেডিজ রুমালটা আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলল, 'কিছুটা বোঝা যায়। যায় না?'

ও আমাকে পাল্টা জিজ্ঞেস করল। বললাম, 'আমি খুব নিশ্চিত নই। কারণ নিজেকেই ঠিক চিনি কী না তাই জানি না।'

সুদীপ্তা আমার দিকে তাকাল, নিঃশব্দে হাসল, বলল, 'সে তো সকলেরই।'

আমি বলে ফেললাম, 'তবে, আপাততঃ বলতে পারি, আপনাকে আমার ভাল লাগছে।'

সুদীপ্তা হেসে উঠে বলল, 'ধন্যবাদ।'

তারপরে মুখে রুমালটা চেপে, আমার চোখের দিকে তাকাল। আমার চিন্তাটা যেন কেমন বল্গাছাড়া হয়ে উঠল, এবং সেই কারণেই, মনে মনে বলে উঠলাম, 'জানি না, এ যাত্রাটা আমার পক্ষে কেমন হবে।'

অলক আর শান্তনু, রেস্তোরাঁর কাঁচের দরজা ঠেলে বেরিয়ে এল। ওদের পিছনে, বেয়ারার দু হাতেই, খাবারের প্যাকেট ঝোলানো। বৈজু তাড়াতাড়ি, ঝুঁকে পড়ে, বাঁ দিকের দরজাটা

খুলে দিল। সামনের দিকেই খাবার তুলে দিল বেয়ারা। অলক বেয়ারাকে কিছু টিপস্ দিল। শান্তনু উঠে বসল। অলক গাড়িতে উঠতে উঠতে বলল, 'এখন খাওয়া হবে না, রূপনারায়ণে গিয়ে খাওয়া হবে।'

শান্তনু ঝেঁজে উঠে বলল, 'এতক্ষণ আমি থাকতে পারবনা।'

অলক বলল, 'বৈজু, গাড়ি ছোড়। হাওড়া বেলিয়াস রোডসে বম্বে রোড পাকড়ো।'

গাড়ি ছুটে চলল হাওড়ার দিকে।
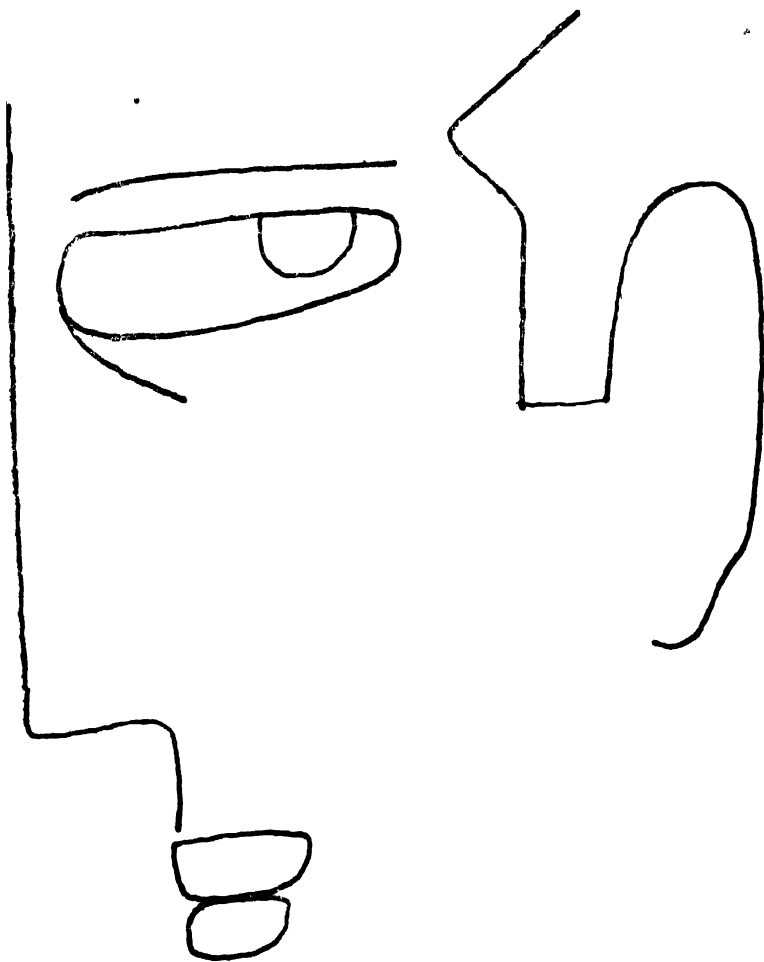
অ ল ক

কিসের যেন একটা শব্দ হচ্ছে খন্‌-খন্‌ করে। গাড়ির কোথাও কিছু গোলমাল হল নাকি। আমি কান খাড়া করলাম। আমার আবার গাড়ির কোনরকম খুঁত থাকলে, মেজাজ বিগড়ে যায়। আমি বৈজুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আওয়াজ কাঁহাসে হোতা ?'

বৈজু ঘাড়টা একটু ফিরিয়ে, আবার সামনের দিকে তাকাল। চুপ করে একটু শুনল, তারপরে বলল, 'গাড়ি কা আওয়াজ নহি, দেখিয়ে কোই সামান হ্যায়, জিসমে ধাক্কা লাগতা।'

একটু শুনে, মনে হল, উইণ্ডস্ক্রীনের পাশে, কোন কিছুতে শব্দ হচ্ছে। হাত দিয়ে খুঁজে দেখলাম, একটা বড় হুইস্কির বোতলের সঙ্গে, জমানো দুধের কৌটার ঠোকাঠুকি হচ্ছে। কৌটাটা সরিয়ে নিয়ে, অন্যদিকে রাখলাম, শব্দটা বন্ধ হয়ে গেল।

সামনে তাকিয়ে দেখলাম, বেলিয়াস রোড ধরে গাড়ি চলছে। কুখ্যাত রাস্তা, রাত প্রায় এগারোটা বাজে। তবে, সেদিন আর নেই, এখন আর ভয় নেই। কখন থেকে ভাবছি একটু ড্রিংক করব, কিছুতেই পারছি না। এসব ভিড়ের রাস্তা পার না হয়ে গেলে, ড্রিংকে মেজাজ আসবে না। শান্তনুটা একেবারে গাধা। ও সেই প্রথম থেকেই ভাবছে, আমি বুঝি সত্যি সত্যি চিঁড়েভাজার সঙ্গে ড্রিংক করতে আরম্ভ করে দেব। আসলে ও যে ব্যাপারটাকে খুব সীরিয়াসলি নিচ্ছে, তা নয়। ও আমাকে কোন কোন সময়, একটু বোকা ভাবে, তাই আমাকে সাবধান করতে চায়। তারপরে আমি যখন ওর পিছনে লাগি, তখন ব্যাপারটা বুঝতে পেরে, আমার ওপর চটে যায়। উশীনরের ঘরে যখন 'মাল' আছে কী না জিজ্ঞেস করলাম, তখন ও সত্যি ভেবেছিল, আমি বুঝি ওখানেই খেতে চাই। তাই কখনো হয় নাকি। আমার একটা সাধারণ বুদ্ধি নেই?

আসলে, শান্তনু সব সময়েই আমাকে একটু সামলে-সুমলে রাখতে চায়। মনে হয়, ও বোধহয় আমাকে একটু ভালবাসে। অবিশ্যি, ওকে আমার বেশ ভাল লাগে। লোকে ওর সম্পর্কে, আমাকে অনেক রকম লাগানি-ভাঙানি করে। কিন্তু আমি ওর কথায় কান দিই না। আমি ব্যবসা করে খাই, যাই হোক, মোটামুটি একটা বিজনেস তো দাঁড় করিয়েছি। আমি লোকচরিত্র কিছুটা জানি। অনেকেই চেয়েছে, 'কিন্নরী' থেকে ওকে যেন আমি তাড়িয়ে দিই। তারা অনেকেই, শান্তনুকে ঈর্ষা করে। সেটা শান্তনুর

সাফল্যের কারণে। তিনটে নাটক পর পর ওর পরিচালনায়, অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে, বলা যায় সার্থকতার শীর্ষে।

যারা শান্তনুকে ঈর্ষা করে, তারা অবিশ্যি, একথা বলবে না। তারা বলে, শান্তনু মূর্খ, অশিক্ষিত, গোঁয়ার, ছোটলোক। কাকে কী বলতে হয় জানে না। ওর নাটক পরিচালনার মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য নেই, খুব সাধারণ। সেন্টিমেণ্টাল, লাউড, যাকে বলে, একেবারে চতুর্থ শ্রেণীর পরিচালক। লোকেরা যখন ওর পরিচালিত নাটক দেখছে, খুশি হচ্ছে, তখন আর ওসব কথা বলে লাভ কী।

আসলে, শান্তনুর একটা ব্যাপার দেখেছি, প্যাঁচ-পয়জার ভালবাসে না। যারা নিজেদের বেশী বুদ্ধিমান মনে করে, নাটক নিয়ে বড় বড় কথা বলে, নানারকম উপদেশ দিতে আসে, পণ্ডিতি সমালোচনা করে, তাদের ও কাছে ঘেঁষতে দেয় না, পরিষ্কার হাঁকিয়ে দেয়। আমি মনে করি, শান্তনু সেটা ঠিকই করে। কাজের ব্যাপারে, যত ঝামেলা বাড়াবার ফিকিরে থাকে লোকগুলো। হটাও ঝামেলা, আমি ওসব পছন্দ করি না।

আমি অবিশ্যি, নাটকের কিছুই বুঝি না। নাটক দেখার কোন নেশাও নেই, নাটক নিয়ে আলোচনাও করি না। তাই তো আমার বউ বলে 'এ যে শুধু ভূতের মুখে রাম নাম, তা-ই না, ভূত একেবারে হনুমান হয়ে গেল। তুমি কী না শেষে, থিয়েটারের মালিক হয়ে বসলে।' কথাটা একেবারে মিথ্যা না। আমাকে বলে বলেও, বউ কোনদিন নাটক দেখাতে নিয়ে যেতে পারে নি। সে-ই আমি, থিয়েটার নিয়ে কথা বলি, থিয়েটারের বিষয় ভাবি। তবে থিয়েটারের বিষয়েই ভাবি, নিতান্ত ব্যবসাগত ভাবে। তা বলে নাটক বুঝি না। তবে আমি এখন নেহাত 'কিন্নরী'র মালিক। তিন তিনটে নাটক সাকসেসফুল হয়েছে, সেইজন্যে লোকে আমাকে নাটক বোঝবার বিষয়ে, একটা কেষ্ট-বিষ্টু ভাবে। অনেক সময় অনেক কথা জিজ্ঞেস করে, এমন কি, উপদেশ পরামর্শও চায়। প্রথম প্রথম তাদের বলতাম, 'আমি ওসব বুঝি টুঝি না।' কিন্তু শান্তনুর সেটা পছন্দ

না। ও বলে, 'ওসব কথা বলতে যান কেন আপনি। বোঝেন না, সেটা আলাদা কথা, লোককে সে কথা বলবার দরকার কী। চুপ করে থাকবেন, মিটি মিটি হাসবেন, ব্যস্ তা হলেই হল।'

পাগল আর কাকে বলে। তবে, আমার আবার একটু বাড়াবাড়ি আছে তো। এখন কেউ প্রশংসা করলে, বা কিছু জিজ্ঞেস করলে, বিজ্ঞের মত, যা মুখে আসে, তাই বলে দিই। সেটাও অবিশ্যি শান্তনুর একদম পছন্দ নয়। তাই ভাবি, নাটকের 'না' যে বোঝে না, তার ঘাড়ে এসে পড়ল কী না থিয়েটার চালাবার ভার; আসলে, শান্তনু আমাকে যার নাটক কিনতে বলে, বা যে লেখককে দিয়ে লেখাতে চায়, আমি তার কাছেই যাই।

এই যে উশীনর, আমার ছেলেবেলার চেনা, ও একজন লেখক নাট্যকার। এ সংবাদ আমি, খবরের কাগজে বা দেওয়ালের পোস্টারে দেখেছি, বন্ধুবান্ধব, বাড়ির লোকের কাছে শুনেছি। ওর যে বেশ নাম-যশ হয়েছে, সেটা আর দশজনের মত আমিও জানি। কালে-ভদ্রে কখনো মুখোমুখি দেখা হলে, দু একটা কথাবার্তা হতো, কেমন আছ, ভাল আছি, এমনি দু একটি কথা। আমার বউ কতবার বলেছে, 'উশীনরবাবু তো তোমার বন্ধু। একদিন বাড়িতে ডেকে এনে আমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও না।' দুত্তোর নিকুচি করেছে আলাপ করবার! কোথায় উশীনর, যোগাযোগ কর, খুঁজে বের কর, বাড়িতে ডেকে নিয়ে এস—এত পোষায়! বউকে অবিশ্যি স্তোক দিতাম, শীগগিরই একদিন উশীনরকে ডেকে নিয়ে আসব।

উশীনরকে ছেলেবেলার বন্ধু ঠিক বলা যাবে না। ও কখনোই আমার সঙ্গে বেশী মিশত না, আমিও না। ভাড়াটিয়া ছেলেদের সঙ্গে, মেলামেশাটা আমাদের বাড়িতে কোনকালেই ঠিক পছন্দ না। আজকাল অবিশ্যি সবই উল্টে গিয়েছে। কিন্তু আমাদের ছেলেবেলায় বাড়িতে শুনতাম, 'ভাড়াটে ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশা করো না।' বড়দের কথায়-বার্তায়, আমাদের মনে হতো, ভাড়াটেদের নিশ্চয় কোন দোষ আছে, তারা লোক ভাল না। ভাড়াটেদের ছেলেরা যে

আমাদের থেকে খারাপ ছিল, তা না, কিন্তু ওই কী রকম একটা বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল, কুসংস্কারের মত। তা ছাড়া, উশীনরের সঙ্গে অন্য কারণেও মেলামেশা বিশেষ ছিল না। ওর আবার ছেলেবেলাতেই পলিটিক্স্-এর দিকে ঝোঁক ছিল। আমি জীবনে কোনদিন পলিটিক্স্-এ যাই নি।

শান্তনুই আমাকে প্রথম বলেছিল, উশীনরের কাছ থেকে নতুন নাটক নেবার কথা। শুনে আমি বলেছিলাম, 'উশীনর তো আমার বন্ধু।'

শুনেই শান্তনুর উৎসাহ আরো বেড়ে গিয়েছিল, বলেছিল, 'বলবেন তো আমাকে সে কথা।'

বলতে গেলে, শান্তনুই আমাকে উশীনরের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। অবিশ্যি, ছেলেবেলার চেনা উশীনরের এখন অনেক পরিবর্তন হয়েছে। কথাবার্তা ভারী সুন্দর, স্বভাবটাও বেশ মিষ্টি, ওর সঙ্গে কথা বলে আনন্দ আছে। শুধু কথাবার্তা স্বভাবই বা কেন। উশীনরের চেহারাটাও বেশ সুন্দর। আমরা তো এ বয়সে, প্রায় বুড়িয়েই গিয়েছি। সে তুলনায় উশীনর এখনো যুবক। ওর নামে কিছু আজে-বাজে কথা শোনা যায়, প্রধানতঃ মেয়েঘটিত ব্যাপারেই। তা কিছুদিন হল, বেশ ঘনিষ্ঠভাবেই তো মেলামেশা করছি, কই সেরকম কিছু তো দেখতে পেলাম না। আমার বউ-ই তো একদিন বলেছিল, উশীনর নাকি আজকাল মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে ডুবে আছে। যত বাজে কথা! মদ খায় বটে, আমার কাছে তুলনায় কিছুই না।

এতদিন মেলামেশা করি নি, সেটা একরকম। এখন ওকে বন্ধু বলে ভাবতে ভাল লাগে। নাটকের বিষয়ে হয়তো আমার একটা স্বার্থ আছে ওর কাছে। কিন্তু নাটক ছাড়াও, ওকে আমার ভাল লাগে। সেই যে কী বলে, বন্ধুবৎসল না কী, উশীনর সেইরকম। অবিশ্যি, বিদ্যা-বুদ্ধিতে ও এখন অনেক এগিয়ে গিয়েছে, ওসব আমাদের মত ব্যবসায়ীরা বুঝব না। যার যা লাইন। তবে, শান্তনু যে

আমার কানে কানে বলেছিল, 'আপনার বন্ধুটির বেশ মেয়ে-পটানো চেহারা' সেটা মিথ্যা না। তবে, মেয়ে কতটা পটাতে পারে, আমি জানি না।

কিন্তু উশীনরের মত লোকেরা তো আবার প্রেম করা ছাড়া, কিছু করতে পারে না। আমার তা-ই বিশ্বাস। এত সময় কোথায় যে, একটা মেয়ের সঙ্গে, ছ'মাস প্রেম করব। আমি বাবা ওসব প্রেম-ট্রেম বুঝি না! কারুর সঙ্গে জমে গেল তো গেল। যা হবে, নগদ বিদায়। আজকালই এসব কথা ভাবি। জীবনটা যে কেন এরকম হয়ে গেল। বলতে গেলে, মেয়েমানুষ নিয়ে একটু বাতিকই এসে গিয়েছে। বয়সের জন্য কী না, জানি না। বিয়ে করে বেশ ভালই ছিলাম। তাব আগেও অবিশ্যি, একটু দোষ-টোষ ছিল। এদিক ওদিক যে কিছু করি নি, তা না। বিয়ের পরে, কয়েকটা বছর বেশ ভাল ছিলাম। তারপরেই, জীবনটা যেন কী রকম ম্যাড়মেড়ে হয়ে গিয়েছিল। সারাদিন কাজ, তার মধ্যে লোকজনের ধূর্তোমি, চুরি, বাটপাড়ি, এ্যাংজাইটি, তারপরে রাত্রে বাড়ি ফিরে, সেই একই জয়া, ছেলেমেয়ে। ঘরে বসে ড্রিংকও করতে ইচ্ছা করত না। বড় অসুখী মনে হতো নিজেকে।

এখনো যে হয় না তা নয়। তবে, এখন মোটামুটি একটা ঠিক করে নিয়েছি। যে-কোন একটা মেয়ের সঙ্গে প্রায়ই একটু এদিকে ওদিক করে কাটিয়ে দিই। তাতে আর যাই হোক, বাড়িতে গয়ে আর তেমন খারাপ লাগে না। এক এক সময় অবিশ্যি, থাগুলো ভাবলে মন খারাপ হয়ে যায়। মেলাই টাকাপয়সা ময়েদের পেছনে নষ্ট করে ফেলি। টাকা অবিশ্যি আমার নিজের ায়ের টাকা। তবু, এক এক সময় মনে হলে, গায়ে বাজে বৈ ক। এ সব মনে হলেই, বউ জয়ার জন্য তাড়াতাড়ি কিছু একটা নে ফেলি।

তবে, এটা আমি বুঝি, কোন মেয়েই আমাকে ভালবাসে। যত মেয়ের সঙ্গে মিশি, তারা আমার সঙ্গে যতই ঢলাক,

সবাই কিছু খিঁচে নিতে চায়। গাড়ি চেপে একটু বেড়াবে, খাবে, কিছু একটা কিনবে-কাটবে, না হয়, দরকারের কথা বলে, কিছু নগদ টাকা নিয়ে যাবে। আমার যা নেবার, তা নিয়ে নিই। এক রকমের গায়ে গায়ে শোধ হয়ে যায়। বেশ্যাবাড়িতে আমার যেতে ইচ্ছা করে না। ঠিক সে ধরনের বায়ুগ্রস্ত নই যে, কিছু না পেলে, সেখানেই ছুটলাম। কখনো যাই নি, তা নয়। তবে, ভাল লাগে না। তা বলে, আমি যে-সব মেয়েদের নিয়ে ঘুরি, তারাও কেউ সতী না। যদিও সব ভদ্দর ঘরের মেয়ে, নেহাতই নাকি আমাকে ভাল লাগার জন্য বন্ধুত্ব করে। দু'চারটি কলেজে পোড়ো মেয়ের সঙ্গেও আমার আলাপ আছে। চৌকস মেয়ে সব। ওই সব মেয়েরা যে এত বেপরোয়া ড্রিংক করতে পারে, চোখে না দেখলে কোনদিন বিশ্বাস করতে পারতাম না। এ সব যোগাযোগের জন্য, আমার কিছু বন্ধুবান্ধব আছে। তারা কী ভাবে যেন এসব মেয়ের সন্ধান পায়। আমার আবার ওসবে বড় ভয়। অচেনা মেয়ের সঙ্গে যেচে কথাই বলতে পারব না। কেউ আলাপ-টালাপ করিয়ে দিলে, তবেই কথা বলতে পারি। এক এক জনের যেমন খুব সাহস থাকে, যার তার সঙ্গে, যেখানে খুশি আলাপ জমিয়ে নিতে পারে। আমি ওসবের ধারে কাছে নেই। অবিশ্যি, আমার সেই সব বন্ধুকে, যারা মেয়েদের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেয়, তাদের আমি মেয়েদের দালাল বলব না। তারা ঠিক দালাল নয়, এলেমদার। তারা মেয়েদের সঙ্গে মিশতে পারে, কথা বলতে পারে, প্রেমও করতে পারে। আমি তা পারি না। আমার যাকে বলে ফিজিক্যাল আর্জ, তা ছাড়া কিছু নেই।

এই যে চলেছে ছুঁড়ি, সুদীপা না সুদীপ্তা, আমি তো ইচ্ছা করেই ওকে সঙ্গে ডেকে নিয়েছি। শান্তনুর খুব একটা ইচ্ছা ছিল না। বরং রাগই করেছিল প্রথমে। পরে অবিশ্যি রাজী হয়েছে। শান্তনু আমাকে বোঝাতে চেয়েছিল, সুদীপ্তা যেতে রাজী হবে না। শালুক চেনাচ্ছে গোপাল ঠাকুর! এই শান্তনু আমি সুদীপ্তা,

কত বার-রেস্তোরা ঘুরে এলাম। প্রথমে তো সুদীপ্তা কিছুতেই ড্রিংক করবে না বলেছিল, কোনদিন করে নি। তারপরে বীয়র খেয়েছিল। কই, একবারও তো বলে নি, বিচ্ছিরি তেতো। আমিই উল্টে বলেছিলাম, 'বীয়র খাবে কেন, তেতো লাগবে, তার চেয়ে লাইম জিন খাও।'

সুদীপ্তা বলেছিল, 'না, বীয়রটাই খাই, শুনেছি ওতে নেশা হয় না।'

তা-ই না বটে, ন্যাকামী। বললেই পারত যে, এর আগে বীয়র খেয়েছে, ব্যাপারটা জানা আছে, সেইজন্যে বীয়রই খাবে। তা না, শুনেছে বীয়র খেলে নেশা হয় না, তাই খেয়েছিল সে। এ ব্যাপারে আমার মনে হয়, শান্তনুও আমার কাছে একটু চেপে গিয়েছিল, এখনো যাচ্ছে। আমার ধারণা, সুদীপ্তার বীয়র খাবার কথা ও জানত, তবু কিছু বলে নি। হয়তো আরো অনেক কিছু জানে, আমার কাছে ফাঁস করতে চায় না। সেটা সুদীপ্তার অনুরোধে, না কি শান্তনুর কোন ব্যাপার আছে, আমি জানি না। তবে, দুজনের মধ্যে যেভাবে কথাবার্তা হয়, ওদের মধ্যে কিছু আছে বলে মনে হয় না। তারপরে জানি না।

দু একবার, আমি আর সুদীপ্তা শুধু দুজনে রেস্তোরাঁয় গিয়েছি, একটু হাত-টাত ধরবার চেষ্টা কবেছি, ও বাব্বা, একেবারে ফোঁসমনসা। নো টাচিং বিজনেস্। পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছে, ওকে যেন আমি সেরকম ধরনের মেয়ে না মনে করি। আবার একথাও আমাকে বলেছে, শী ইজ এনগেজড্। আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'কার সঙ্গে?'

মাথা নেড়ে বলেছিল, 'তা বলতে পারব না।'

আমার একটু সন্দেহ হয়েছিল, শান্তনুর সঙ্গেই সুদীপ্তা এনগেজড্ কী না। তাই জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আমার চেনা নাকি?'

তেমনি মাথা নেড়েই বলেছিল, 'না, আপনি চিনবেন কী করে, সে ড্রামার ধারে-কাছেও থাকে না। সে কলেজে পড়ায়।'

'অধ্যাপক?'

'হ্যাঁ।'

কথাটা আমি পুরোপুরি কোনদিনই বিশ্বাস করি নি। আমি ব্যবসা করে খাই, মেয়েও কম দেখলাম না জীবনে। সুদীপ্তার চালচলন ভাবভঙ্গি দেখলেই বুঝতে পারি, যতটা সতীত্বপনা ও দেখায়, ততটা সতী ও নয়। আসলে, আমাকে খেলাতে চাইছে বোধহয়। আমিও ভাবি, খেলাও, আমিও দেখি তোমার খেলা কতদূর। শান্তনুকে কয়েকবার জিজ্ঞেস করেছি, সুদীপ্তার সম্পর্কে ও কী জানে। শান্তনু তো খিঁচিয়েই আছে। জিজ্ঞেস করলেই খিঁচিয়ে ওঠে, 'আরে দূর মশাই, মেয়েরা কে কেমন, ওসব খবর আমি রাখি না। আমার গ্রুপে থিয়েটার করে চলে যায়, এর বেশি আমি কিছু জান্নি না।'

শান্তনুকে চটিয়ে কথা শুনতে আমার একটু ভাল লাগে, তা-ই, ওকে প্রায়ই জিজ্ঞেস করি, 'তা আপনার কি মেয়েদের দরকার হয় না?'

শান্তনু ঝামটা দিয়ে বলে, 'দরকার হলে, যাকে পাই, তাকেই ডেকে নিই। আপনার মত, আমার অত খোঁজ-খবরের দরকার হয় না।'

'তা, সুদীপ্তাকে কখনো ডাকেন নি?'

'মাথা খারাপ, আমার একটা প্রেস্টিজ নেই। গ্রুপের মেয়ে নিয়ে আমি টানাটানি করি না।'

শান্তনুর কাছ থেকে, সুদীপ্তার বিষয়ে, কিছুই জানতে পারিনি। যা কিছু জেনেছি, সুদীপ্তার মুখ থেকেই শুনেছি, ওর বাবা-মা-ভাই-বোন—সংসারের কথা, আর সুদীপ্তা নিজে একটি ধোয়া তুলসীপাতা, সে কথা অনেকবার শুনেছি। তা সে ওকথা যতই বলুক, ভবী ভোলবার নয়। আমি কখনো বিশ্বাস করি না।

অমন যে নাম-করা অভিনেত্রী সুপর্ণা মজুমদার, তাকেই কত দেখলাম। আমি অবিশ্যি ওর পার্টি না। ওর পার্টিরা সব আমার থেকে অনেক বড়। শুধু বড় বলেই না, ওর আবার পছন্দ না হলে চলবে না। ওই সেই প্রেম। আমার মনে হয়, সুদীপ্তার

ব্যাপারটাও সেইরকমই বোধহয়। বোধহয় প্রেম করতে চায়। যা আমার দ্বারা কোনদিনই হবে না। আমি বুঝি বিজনেস।

আমার নানারকম ভয়ও আছে। সুদীপ্তা এখন আমার থিয়েটারে কাজ করছে। কোন কিছু যদি ফাঁস হয়ে যায়, বা মেয়েটা কিছু বলে দেয়, তাহলে কেলেঙ্কারি। সেই জন্য, কোনরকমেই জোর-জবরদস্তি করতে পারি না। জোর-জবরদস্তি, বলতে গেলে, কাউকেই করি না, ওসব আমার ভাল লাগে না। তোমার পোষায় তুমি আসবে, না পোষায়, আসবে না। এই যে 'কিন্নরী'র হিরোইন সুপর্ণা মজুমদার, তাকে পেতে কি আমার ইচ্ছা করে না? খুবই ইচ্ছা করে। ঠারে-ঠোরে, সে কথা অনেকবার বোঝাবার চেষ্টা করেছি, সুপর্ণা বুঝতেও পারে, কিন্তু গায়ে মাখে না। যেন আমার কথা বুঝতেই পারে না। এমনিতে, কথায় বার্তায়, হাসিতে ঢল ঢল। 'কিন্নরী'র মালিক-প্রযোজক বলে, যথেষ্ট খাতিরও করে। বাড়িতে গেলে, ড্রিংক অফার করে, নিজেও আমাদের সঙ্গে ড্রিংক করে। শান্তনুর সঙ্গে তো প্রায় বন্ধুত্বই বলা চলে। শান্তনু তো সকলের সঙ্গেই একরকম ভাবে কথা বলে। চিৎকার চেঁচামেচি করে, সুপর্ণাকেও অনেক সময় ধমকায়। সুপর্ণাও জানে, শান্তনুর চেঁচামেচি ব্যাপারটা মারাত্মক কিছু না। হাতজোড় করে বলে, 'দোহাই শান্তনুবাবু, মাথাটা ধরিয়ে দেবেন না, বুঝতে পেরেছি, আমার ভুল হয়েছে, দুঃখিত।'

শান্তনুকে সুপর্ণা মানেও খুব। শান্তনুকে সবাই মানে। যে যত বড় অভিনেতা-অভিনেত্রীই হোক, শান্তনু সকলের কাছ থেকেই কাজ আদায় করে নিতে পারে। কাজের বেলায় সে কাউকে খাতির করে না। সেই জন্যই, আমি ওকে এত পছন্দ করি। অনেকে হয়তো মনে করে, 'কিন্নরী'র তিনটে নাটক পর পর কমার্শিয়াল সাকসেস্ হওয়ায়, ওকে আমি খাতির করি। নিশ্চয় সেটা একটা কারণ। কে জানত, শান্তনুর মধ্যে এতটা গুণ আছে। আমার বন্ধু যখন, আমার হাতে 'কিন্নরী' তুলে দিল, তখন তো আমিও

ভেবেছিলাম, কিছু গচ্চা দিয়ে, আমাকেও 'কিন্নরী'তে তালা ঝুলিয়ে কেটে পড়তে হবে।

সেই সময়ে, এই শান্তনু এসে আমার সঙ্গে নিজেই আলাপ করল। তখন ও দাবি করেছিল, যাই হোক, ওর চলে যাবার মত, একটা মোটামুটি বেতন দিলেই হবে। মাত্র দু মাস সময় হাতে নিয়ে, ও একটা নাটক মঞ্চস্থ করতে চেয়েছিল। তখন তো আমার ধারণা, সব ফোর টোয়েন্টির কারবার, আমাকে কবলাতে এসেছে সব। তবে একবার যখন বন্ধুর কাছ থেকে 'কিন্নরী' নিয়েছি, তখন কিছু তো খসবেই। শান্তনু সব মিলিয়ে যে হিসেবটা দিয়েছিল, তার অঙ্কটা খুব বেশি না। আমি রাজী হয়ে গিয়েছিলাম। শান্তনুর কতটা কি যোগ্যতা, তাও কিছুই জানতাম না। তখন থেকেই, অনেকে ওর বিরুদ্ধে আমাকে অনেক কিছু বলেছে। কেবল আমার বন্ধু, 'কিন্নরী'র আগে যে মালিক ছিল, সে বলেছিল, 'একটা চান্স দিয়ে দেখতে পার। হিসাব যা দিয়েছে, তা বেশি দেয়নি। গ্রুপকে ঠিক মত চালাবার ক্ষমতা আছে লোকটার। দু তিনটে নাটক পরিচালনা করে, বেশ নাম করেছে। তবে অ্যামেচারিস্ট, একবার চেষ্টা করে দেখতে পার।'

সেই থেকে শুরু। কাজের ব্যাপারে, ওর কোন ফাঁকি-ঝুঁকি নেই। ও নিজে কারোর কাছ থেকে কোনরকম সুযোগ নেয় না, কাউকে দেয়ও না। খাটতে পারে অসম্ভব। যেখানে দশ টাকায় কাজ হয়, সেখানে দশ টাকার ওপরে আর এক পয়সা খরচ করবে না। আবার এমনিতে যখন আড্ডায় বসে, খুব জমাটি লোক। একাই প্রায় একশো। এখন তো আমাকেই ধমকায়। তা ও ধমকাতে পারে। আমার সঙ্গে, ওর একটা অন্যরকমের ভাব হয়ে গিয়েছে। 'কিন্নরী'র কোন বিষয়ই আমি আর এখন একলা ভাবতে পারি না। ওর সঙ্গে পরামর্শ ছাড়া চলে না। তবে, কিছু কথা-কাটাকাটি ওর সঙ্গে হবেই। আসলে, আমি তো বুঝি অষ্টরম্ভা। আগে তো কিছুই বুঝতাম না, এখন একটু-আধটু বুঝতে পারি।

তবু ওর সঙ্গে যে তর্ক করি, সেটা নেহাতই, ওকে একটু বাজিয়ে নেবার জন্য। ব্যবসায়ী মানুষ তো আমি। কোন বিষয়েই এক কথাতে রাজী হওয়া, আমার ধাতে নেই।

শান্তনুও এখন আমাকে অনেকটা বুঝে নিয়েছে। প্রথম যখন ও এসেছিল, তখন পাঁচশো টাকা মাইনে নিত। তারপরে আমি ওকে দেড় হাজার করে দিয়েছি। উশীনরের লেখা এই নাটকটা শুরু হলেই ভাবছি, পুরোপুরি দু হাজার করে দেব। 'কিন্নরী' লাভ করছে বলেই যে ওকে আমার ভাল লাগে, তা নয়। সে তো, মাইনে বাড়িয়ে দিয়েই খালাস হয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু ওর সঙ্গে মিশতেও আমার ভাল লাগে। শান্তনুব সঙ্গে আমার সময়ও ভাল কাটে। এ কথাটা লোককে বোঝাতে পারি না। যাবা ওব নিন্দা করে, ওকে ঈর্ষা করে, তাদের বোঝানো যায় না, তারা যে শান্তনুকে চেনে, আমি তার থেকে আলাদা একজনকে চিনি।

ওকে আমি কোনদিন, কোন মেয়ে নিয়ে বেড়াতে বা আড্ডা দিতে দেখি নি। তবে শুনেছি, ওর দু একটা ব্যাপার আছে। সে-সব মেয়েদের আমি চিনি না। শুনেছি, একজন সিনেমা-নায়িকার সঙ্গে ওর নাকি প্রেম আছে। লোকেরা অবিশ্যি, কথাটা অত্যন্ত নোংরা ভাবে বলে। যেন, শান্তনু আসলে সেই নায়িকার চাকরের মতন। সেই নায়িকাকে একবার নাকি শান্তনু প্রায় রেপ করতে গিয়েছিল, তাই নিয়ে ওকে পুলিসের হাতে তুলে দেবার কথাও উঠেছিল। শান্তনু হাতে-পায়ে ধরে, কোনরকমে নাকি ব্যাপারটা মেটায়।

একদিন নেশার ঝোঁকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আপনার সঙ্গে হিরোইন রঞ্জাবতীর প্রেম আছে?'

নামটা শুনেই যেন শান্তনু চমকে উঠেছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, 'আপনি কী শুনেছেন?'

'শুনেছি তো অনেক কিছুই, সে-সব তো আর সব সত্যি হতে পারে না। আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই।'

'শোনাবার মত আমার কিছু নেই। রঞ্জাবতীকে চিনি, এই পর্যন্ত। তবে ও নামটা আর করবেন না, আমার ভাল লাগে না।'

কথাটা শুনে আমার যেন কেমন একটু খটকা লেগেছিল। আমিও তো আবার সেইরকম, বলেছিলাম, 'কেন, প্রাণে বড় বাজে নাকি?'

শান্তনু হুম্‌কে উঠেছিল, চেঁচিয়ে বলেছিল, 'আরে দূর মশাই, আপনার সব সময়ে খালি মেয়েমানুষের কথা। বলছি, তার সঙ্গে আমার চেনা-পরিচয় আছে, এই পর্যন্ত, আবার কী। তার নাম আমার কাছে করবেন না, এই বলে রাখলাম।'

'কেন, খুব দাগা দিয়েছে বুঝি?'

শুনে শান্তনু খুবই চটে গিয়েছিল। ডিংকের গেলাস ছেড়ে, আমার কাছ থেকে উঠে চলে গিয়েছিল। তাতেই আমার মনে হয়েছিল, ব্যাপারটা তা হলে খুব সহজ নয়। নিশ্চয় কিছু একটা আছে, যা ও আমার কাছেও বলতে চায় না। তবে, লোকের কথার মধ্যে, কোন সামঞ্জস্য নেই। একটা লোককে কোন মেয়ে যদি পুলিসে দিতে চাইবে, তার বাড়িতে আবার চাকরের মত, সে যায় কেমন করে। তাকে তো, চাকরের মত দেখা দূরের কথা, কুকুরের মত ভাগিয়ে দেবে।

রঞ্জাবতীর বাড়িতে মাঝে মাঝে সে যায়, এ কথা আমি সুপর্ণার মুখেও শুনেছি। সোজাসুজি ভাবে শুনি নি, একদিন কথায় কথায় বলতে শুনেছিলাম, সুর্পণা বলেছিল, শান্তনুর সঙ্গে তার রঞ্জাবতীর ফ্ল্যাটে দেখা হয়েছে। সুপর্ণার সঙ্গেও, রঞ্জাবতীর পরিচয় আছে। এখন রঞ্জাবতীও একটা স্টেজের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ। আমি একটা কথা ভেবে দেখেছি, শান্তনু কখনো রঞ্জাবতীকে 'কিন্নরী'তে আনবার কথা বলে নি। ও যদি আনতে চাইত, আমি নিশ্চয় আপত্তি করতাম না।

যাই হোক, রঞ্জাবতীর সঙ্গে, শান্তনুর যাই থাক, আমার দেখবার দরকার নেই। মোটের ওপর লোকে যা বলে, তাই সব সত্যি নয়। তবে, শান্তনু নিজে আমার কাছে স্বীকার করেছে, লতা ব্যানার্জি বলে একটা মেয়ের সঙ্গে ও কয়েকবার বাইরে গিয়ে কাটিয়ে এসেছে।

লতা ছিল, 'কিন্নরী'তে, আমার দু নম্বর প্রোডাকশনের সহ-নায়িকা। দেখতে শুনতে মেয়েটা মন্দ ছিল না, স্বাস্থ্যটা বেশ ভাল, আর যাকে বলে বেশ চালু, তাই। এক একটা মেয়ের যেমন আছে, কোন কিছুতে পেছ-পা নয়, সেইরকম। তা বলে, বিনা স্বার্থে না। বিজনেস বোঝে। ভাল লাগবার মত মেয়ে।

লতাকে নিয়ে, আমিও অবিশ্যি বার দুয়েক কলকাতার বাইরে কাটিয়ে এসেছি। শান্তনুও সে কথা জানে। তাতে ওর আপত্তি ছিল না। লতাকে ও ভালই চিনত, কী ধরনের মেয়ে। তা হলেও লতাকে ওর ভালই লাগত। শান্তনুর বিষয়ে, এই একটা ব্যাপারই আমার জানা ছিল। লতা অবিশ্যি এখন অন্য থিয়েটারে জয়েন করেছে, কিন্তু যোগাযোগটা রেখেছে। ডাকলে পাওয়া যায়। ও এক জায়গায় বেশি দিন থাকবার মেয়ে নয়।

আমার সঙ্গে কোন মেয়ে থাকলে, শান্তনুর বিরক্তির সীমা থাকে না। আমার যেমন মেয়ে মেয়ে বাতিক, ওর তা নেই। অথচ, মেয়েদের বিষয় নিয়ে, এক একসময় এমন কথা বলবে, শুনলে কানে আঙুল দিতে ইচ্ছা করে, মনে হয় ওর মত মেয়েখোর লোক বোধহয় জগতে নেই।

এই শান্তনুই, সুপর্ণাকে নিয়ে এসেছিল প্রথমে। সুপর্ণা অবিশ্যি, তার আগেই বেশ নাম করেছিল। সেই সুপর্ণা আমাকে যে খাতির দেখাতে রাজী, সুদীপ্তা যেন তাও দেখাতে চায় না। ইদানীং কালে, সুদীপ্তা আমাকে কয়েকবারই শুনিয়েছে, একটা বড় রোল ওর পেতে ইচ্ছা করে। তার মানে, হিরোইন হতে চায়। হয়তো, সেই জন্যই, ও আমাকে এখনো খেলাচ্ছে। এসব খেলার নিয়মই তাই। যার কাছে যেটি পাবার আশা আছে, সেটি যতক্ষণ আদায় না হচ্ছে, ততক্ষণ দরওয়াজা বন্ধ। অন্ততঃ আদায় হবে, তার গ্যারান্টি পাওয়া চাই।

আমি তো, প্রথমে লতাকেই নিয়ে যাব ভেবেছিলাম। উশীনর ব্যাপারটাকে কী ভাবে নিয়েছে, কে জানে। এই সুদীপ্তাকে সঙ্গে

নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা। এই সব লোককে আমি আবার ভাল চিনে উঠতে পারি না। বই-পুঁথি নিয়ে থাকা লোক, লেখা-জোখা নিয়ে থাকে। কথাবার্তায় ঠাণ্ডা মিষ্টি। মুখ দেখে কিছু বোঝবার উপায় নেই। আমি অবিশ্যি আগে উশীনরকে কিছু বলিনি। বলবার আছেই বা কী, আমি কাউকে ডিস্টার্ব না করলেই হল। আর, আমরা তো গিয়েই কাজ করতে বসে যাচ্ছি না। ফিরে এসে কাজে বসা হবে। আসল কাজটা এখন উশীনরেরই। সে একবার একটা পাক দিয়ে আসতে যাচ্ছে। আমরাও সঙ্গে চলেছি। আমার যাবার এমনিতে কোন দরকারই ছিল না। বরং শান্তনুর দরকার আছে। ট্রিপটা ছেড়ে দিতে ইচ্ছা করল না। ভাবলাম, আমিও ওদের সঙ্গে ঘুরে আসি। আব তা-ই যদি যাব, তবে ন্যাড়া ন্যাড়া না, একজন কাউকে সঙ্গে নিতে হবে।

আমার মনে হয়, উশীনর ব্যাপারটাকে খারাপ ভাবে নেয় নি। সুদীপ্তার সঙ্গে দিব্যি তো গল্প করতে করতে চলেছে। উশীনর খুব যে একটা মনোযোগ দিয়ে সুদীপ্তার গল্প শুনছে, তা মনে হচ্ছে না। ঘাড় নেড়ে হুঁ হাঁ করে যাচ্ছে। বোধহয়, বুঝতে পেরেছে, সুদীপ্তা স্রেফ গুল্ দিয়ে যাচ্ছে। এমন গুল্‌বাজ মেয়ে আমি কম দেখেছি। এত মিথ্যা কথা বলতে পারে! প্রথম প্রথম আমি বিশ্বাস করতাম, সত্যি বুঝি ওর বাবা আছে, গরীব ঘরেব মেয়ে, বি. এ. পরীক্ষা দিতে দিতে, দিতে পারে নি। অথচ জীবনে কোনদিন নাকি কলেজেই যায় নি।

এখনো যা শুনতে পাচ্ছি, তা হল জিমনাস্টিক আর অ্যাথলেটিক বিষয়ে, উশীনরকে বলে চলেছে। ছেলেবেলায় ও কত কাণ্ড করেছে, ওর শরীরের কত জায়গায় লেগেছে, ছিঁড়েছে, স্টিচ্ দিয়েছে, ভেঙেছে ...চালিয়ে যা বাবা, চালিয়ে যা। উশীনরও শুনে যাচ্ছে। মনে হয়, উশীনর কিছু মনে করে নি। মনে করলে, এভাবে কথা বলত না, শুনত না। শান্তনুর অবিশ্যি একেবারেই ইচ্ছা ছিল না, সুদীপ্তাকে নিয়ে যাবার। লতাকে নিয়ে যাব শুনে, ও যেমন করে বলে,

সেই ভাবে বলেছিল, 'হ্যাঁ, একটা মড়া নিয়ে, দুজনে টানাটানি করব।'

আমি বলেছিলাম, 'তা আমরা যখন শকুন, তখন আর টানাটানি করতে আপত্তি কী।'

কিন্তু সুদীপ্তার কথায়, সরাসরি আপত্তি করে নি, কেবল বলেছিল, 'যা খুশি তা করুন গে, তবে কাজের সময়, আমি মেয়েমানুষের ব্যাপারে নেই।'

আমি বলেছিলাম, 'ভালই হল, তা হলে আর টানাটানি করতে হবে না।'

কিন্তু আমার মাথায় ঘুরছিল, সুদীপ্তার কথা। লতাকে তার আগেই বলা হয়ে গিয়েছিল, লতা রাজীও হয়েছিল। বেচারি, আমার এখন সত্যি মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। পুরুষমানুষ বড় পাজী হয়। শুধু পাজী না, শয়তান বলতে যা বোঝায়। যা হোক, একটা মিথ্যা কথা বলেও তো, চলে আসতে পারতাম। বলতে পারতাম, 'বাইরে যাওয়া হচ্ছে না, কিছু মনে করো না।'

অবিশ্যি তাতেও অসুবিধা ছিল। তা হলে বলত, ওর সঙ্গেই কোথাও সন্ধ্যেটা কাটানো হোক। একেবারে ফাল্‌তু ছেড়ে দেবে কেন। দুচার পেগ ড্রিংকস্, একটু ভাল ডিনার, আর বিশেষ দরকারে, গোটা পঁচিশ টাকা। তা হোক, এভাবে ওকে চিট্ করা ঠিক হয় নি। কোথায় রয়েছে এখন, কে জানে। ছেলেমেয়ে নিয়ে, স্বামীর কাছেই শুয়ে আছে, নাকি অন্য কারোর সঙ্গে, রাত্রি কাটাচ্ছে, কে জানে। আমার একটা দমকা নিশ্বাসই পড়ে গেল। একে কি সুখ বলে! দূর! যেন এক ধরনের ছুটে দৌড়ে জীবন কাটানো। আমার তো সেইরকমই মনে হয়। আমার নিজেকেও তাই মনে হয়। ভেতরটা যখন অস্থির অস্থির হয়ে ওঠে, তখন মদ আর মেয়েমানুষের পিছনে ছুটে যাই। কিন্তু তাতে সুখটা কী, বুঝি না। আমাকে যদি মা কালীর পায়ে হাত দিয়ে বলতে হয়, এতে আমি আসলে আনন্দ পাচ্ছি কী না, তাহলে কখনোই, 'হ্যাঁ' বলতে পারব না। কেউ-ই বোধহয়

বলতে পারে না, লতাও বলতে পারে না।...

জয়াটা নিশ্চয় খোকাকে পাশে নিয়ে ঘুমোচ্ছে। জয়ার আবার নাক ডাকে। পাগলি! এখন একেবারে বেজায় গিন্নী। মনটা ওর সত্যি ভাল। কাজকর্ম করে, ছেলেমেয়েদের দেখে, সংসার করে, একটু সিনেমা-থিয়েটার দেখার ঝোঁক আছে, আর আছে বই পড়ার নেশা। ভাব তো, শালা এরকম গেরস্থপোষা বউ না হলে, আজ কোথায় গিয়ে দাঁড়াতাম। এক এক সময় আমার মনে হয়, আমার কীর্তিকলাপ জয়া সবই বোধহয় বুঝতে পারে, আমাকে কিছু বলে না।

ওরে বাবা, সে আমি ভাবতে পারি না। জয়া সেরকম মেয়েই নয়। কিছু জানতে পারলে, বলে দিত। বেশিদিন চেপে টেপে রাখার মেয়ে না। দু'একবার তো আমাকে বেমকা জিজ্ঞেসও করেছে, 'তোমার গাড়িতে আজ বিকেলে কে ছিল বল তো?' অথবা, 'তুমি আজ যে রেস্তোরাঁয় গিয়েছিলে, তোমাদের সঙ্গে মেয়েটা কে ছিল?' এমনি সব প্রশ্ন।

এ সব ব্যাপারে আমার জবাব একেবারে রেডি। জয়ার যাতে বিশ্বাস হয়, ঠিক সেই রকম একটা জবাব দিয়ে দিই।

এখন জয়া খোকাকে নিয়ে ঘুমোচ্ছে। ছেলেটার গা-টা একটু গরম দেখে এসেছি। বলে তো এসেছি, আজ বিকেলেই যেন ডাক্তারকে ডাকিয়ে দেখিয়ে দেয়। আমার মেয়েটি আবার বেশ ডাগর হয়ে উঠেছে। বছর দশেক বয়স হল, সে এখন মায়ের কাছে শুতে চায় না। আলাদা খাটে, আলাদা বিছানা না হলে তার চলে না। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, সবাই নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে, আর আমি কোথায় চলেছি। মনের দিক থেকে বলতে গেলে তো, ফুর্তি করতে যাচ্ছি। আমার কোন দরকার ছিল না আসবার। আমি তো এলাম আসলে অন্য মতলবে। এ সময়ে আমার নিজেকে বড় খারাপ লাগে। একটা ব্যাপারেও সত্যি নেই।

যাক গে, এসব ভেবে এখন মন খারাপ করতে চাই না। আজ সকালে হঠাৎ, সুদীপ্তার বিষয়ে, কথাটা আমার মনে এল। একটাই

মাত্র ঢোঁপ ছিল, সেটাই দেওয়া ঠিক করেছিলাম। ভেবেছিলাম, যদি দেখি খেয়েছে, তবে আর ও মেয়েকে চেনার আর আমার কিছু বাকী থাকবে না।

আমার জানা ছিল, পাশের বাড়িতে ফোন করলে, সুদীপ্তাকে ডেকে দেয়। আমি ওকে ফোনে ডেকে, নতুন নাটকে ওকেই হিরোইন চিন্তা করা হচ্ছে, এ কথা বলেছিলাম। আর বলেছিলাম, ও যদি আমাদের সঙ্গে বাইরে যায়, তবে লেখকের একটু সুবিধা হতে পারে, হিরোইনের একটা কনসেপশন দাঁড়াতে পারে।

ঘোড়েল মেয়ে, সব শুনেও, অনেক ধানাই-পানাই করেছিল। 'কিন্নরী'র নাটক ছাড়াও, আরো দু-তিন জায়গায় নাকি ওর নাটকের কথা রয়েছে। বেশী দেরি হলে, তাদের সঙ্গে কথার খেলাপ হয়ে যাবে, ইত্যাদি ইত্যাদি, হাজার খানেক তালবাহানা। তারপরে রাজী হয়েছিল, উশীনরের নামটা খানিকটা কাজ দিয়েছিল। তবে, দুটো মিথ্যে কথা ওকে আমি বলেছি। এক নম্বর, আমরা দু-দিনের জন্য বাইরে যাচ্ছি, এ কথা বলেছি। অথচ কম করে পাঁচ-ছ' দিন প্রায় আমাদের লাগবেই। যে কারণে, আমি 'কিন্নরী'তে, আমার ম্যানেজারকে আগেই জানিয়ে দিয়েছি, সুদীপ্তা সংবাদ দিয়েছে, সে অসুস্থ হয়ে পড়েছে, এ সপ্তাহে সে স্টেজে আসতে পারবে না, কাউকে দিয়ে যেন কাজ চালিয়ে নেওয়া হয়। একমাত্র শান্তনুই এ কথা জানে, সুদীপ্তা নিজেও জানে না, ওর ছুটি হয়ে গিয়েছে এ সপ্তাহে। শান্তনুর এক জবাব, 'যা খুশি তাই করুন গে, আমি কিছু জানি না। আমি দেখছি, আপনি মেয়েটার বারোটা না বাজিয়ে ছাড়বেন না।'

কার বারোটা কে বাজাচ্ছে, জানি না। দু নম্বর মিথ্যা কথা বলেছিলাম, আমাদের সঙ্গে আরো দু-একটি মেয়ের যাবার কথা আছে। সে কথাটা, সুদীপ্তা এখনো কিছু বলেনি বোধহয়, বুঝতেই পেরেছে, ওটা একটু শঠে শাঠ্যং হয়ে গিয়েছে। এখন দেখা যাক, কোথাও একটা ডেরায় গিয়ে ওঠার পরে ব্যাপারটা কী দাঁড়ায়।

সুদীপ্তাকে আমি সতী সেজে থাকতে দেব না। আমার এখনো

মনে আছে, লতা একবার ওর সম্পর্কে একটা কথা বলেছিল। বলেছিল, 'সুদীপ্তাকে জিজ্ঞেস করবেন তো, 'জয়ন্তী'র পরিচালক দীনেশ ঘোষ ওকে কী করেছিল?'

আমি অনেকবার লতার কাছ থেকে কথাটা শুনতে চেয়েছিলাম, কিছুতেই জানতে পারি নি। ওর এক কথা, 'সুদীপ্তাকেই জিজ্ঞেস করবেন।'

সুদীপ্তাকে আমি জিজ্ঞেস করিনি, শান্তনুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। এ লাইনে শান্তনুর অজানা কিছু আছে বলে আমি বিশ্বাস করি না। শান্তনু আমাকে যা বলেছিল, তাতে জেনেছিলাম, দীনেশ ঘোষ সুদীপ্তাকে রেপ্ করেছিল। মাতাল হয়েই দীনেশ ঘোষ তা করেছিল, কিন্তু তখন নাকি সুদীপ্তা প্রায় কিশোরী শিল্পী, ফ্রক পরে স্টেজে যেত। পাছে থিয়েটারের দুর্নাম হয়, তাই থিয়েটারের মালিক সঙ্গে সঙ্গেই সুদীপ্তাকে থিয়েটার থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। শান্তনুর বক্তব্য, তারপরে আর অনেকদিন সুদীপ্তা নাটক করেনি। করলেও নিতান্ত অ্যামেচার দলের সঙ্গে, এক-আধ রাত্রি। তারপরে শান্তনুর গ্রুপে নিয়মিত কাজ করেছে। শান্তনুর মতে, দীনেশ ঘোষ একটা নোংরা পাঁটা।

কথাটা অবিশ্যি আমিও মানি। একটা চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সের মেয়েকে মাতাল হয়ে, গ্রীনরুমের মধ্যে জামা-কাপড় ছিঁড়ে বলাৎকার, খুবই জঘন্য। তবে, আমার আবার জঘন্য! আমি ওরকম কাজ কোনদিন করি নি ঠিকই। করব কি না তা কি জানি! এখন আমার যা মনের অবস্থা, তাতে তো মনে হচ্ছে, সুদীপ্তাকে আমার একবার দেখতে হবে।…

'এ্যাই মশাই, অলকবাবু একটা রামের বোতল আমাকে দিন তো।'

শান্তনুর মোটা গলা শুনতে পেলাম। পিছন দিকে না ফিরেই, ও একটা হাত পিছন দিকে বাড়িয়ে দিল। আমি দেখলাম, এর মধ্যে

কখন ফাঁকা বম্বে রোডে এসে গিয়েছি। আমি বললাম, 'দাঁড়ান মশাই, আগে আমি হুইস্কি দিয়ে একটু গলা ভেজাই। বৈজু, সোডাকেস কীধর হ্যায় ?'

বৈজু জবাব দিল, 'আগে হ্যায় বাবুজী।'

আমি শান্তনুকে বললাম, 'দিন তো, এক বোতল সোডা দিন, আর সামনের খোপে দেখুন, ওপ্‌নারটা আছে, সেটা দিন।'

আমি আগে হাত বাড়িয়ে গাড়ির ভেতরের আলোর সুইচ টিপলাম। শান্তনু বলে উঠল, 'আমার হাতে রামের বোতল না দিলে, সোডা পাবেন না।'

আমি জানি, আগে ওকে রামের বোতল দিতেই হবে। তবু বললাম, 'শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর, কখন থেকে মুখ চোখাচ্ছি, গলা কাঠ হয়ে গেল, আগে ওকে রাম দিতে হবে!'

শান্তনু চুপচাপ বসে রইল। উশীনর হাসছিল, আমি ওর দিকে চেয়ে হেসে চোখ টিপলাম। আমাদের সঙ্গে চার বোতল হুইস্কি, চার বোতল রাম আর চার বোতল বীয়র আছে। জামশেদপুর থেকে কাল সকালে আরো কিছু স্টক করতে হবে। আমি একটা রামের বোতল হাতে নিয়ে, শান্তনুর দিকে তাকালাম। শান্তনু তখনো সেইরকম সামনের দিকে তাকিয়ে, পিছন দিকে হাত বাড়িয়ে রয়েছে। আমি বললাম, 'কী হল, ওপ্‌নার আর সোডার বোতল দিলেন না ?'

শান্তনু বলল, 'আগে রাম, পিছে সোডা।'

'বড্ড জ্বালাতে পারেন মশাই, খাবেন পরের পয়সায়, আবার জেদও করবেন, নিন।'

বলে, রামের বোতলটা শান্তনুর হাতে জোরে ঠুকে দিলাম। ও বোতলটা ওর সীটের পাশে রেখে আবার হাত বাড়িয়ে বলল, 'দিন, আপনার গেলাস দিন। সোডা ঢেলে দিচ্ছি।'

আমি বললাম, 'দাঁড়ান মশাই, আগে বোতলের কর্ক খুলি। গেলাসে পেগ্‌ ঢালি। এখন তো খালি নিজের কথা ভাবছেন। আরো দু জনের কথা মনে আছে কী ?'

শান্তনু সঙ্গে সঙ্গে পিছনে ফিরে, একেবারে জোড়হাত তুলে, উশীনরের দিকে চেয়ে বলল, 'সরি স্যার, ক্ষমা করবেন।'

উশীনর হেসে বলল, 'না না, ক্ষমা করার কী আছে। আপনারা চালান।'

আমি বললাম, 'আমরা চালাব কী, সব কি কেবল আমাদের দু জনের জন্য আনা হয়েছে? তুমি কী খাবে বল, হুইস্কি না রাম?'

উশীনর যেন একটু বিব্রত হল, একবার সুদীপ্তার দিকে তাকাল। কী বাবা, এর মধ্যে জমে গেল নাকি? সুদীপ্তার অনুমতি নিয়ে খেতে হবে?

সুদীপ্তা বলল, 'আরম্ভ করুন। আপনার চলে তো?'

উশীনর আমার দিকে ফিরে বলল, 'আমার একটু বীয়র হলেই ভাল হতো।'

আমি বললাম, 'রাত্রের জন্য বেস্ করবে?'

'না না, বেস্ টেস্ না, রাত্রে আর ড্রিংক করব না।'

শান্তনু বলে উঠল, 'তা বললে কি চলে স্যার, কলকাতার জীবনটার কথা এখন ভুলে যান।'

উশীনর হাসল। আমি মনে মনে ঠিক করলাম, উশীনরকে রাত্রে খাওয়াতেই হবে, আর ওকে দিয়েই যদি সম্ভব হয়, সুদীপ্তাকেও খাওয়াতে হবে। বললাম, 'ঠিক আছে, এখন তুমি বেস্ কর, চার বোতল বীয়র এসেছে, সুদীপ্তার জন্য।'

উশীনরের চোখে-মুখে অবাক ভাব দেখা গেল, কিন্তু সেটা ধরা পড়তে দিল না। বলল, 'না না, থাক, ওঁর কোটার থেকে আমাকে দেবার দরকার নেই।'

সুদীপ্তা সোজা হয়ে বসে, চোখ বড় করে বলল, 'ও মা, চার বোতল বীয়র কে খাবে? তা ছাড়া গাড়িতে আমি একদম ড্রিংক করব না।'

আহা, মরে যাই আর কী, গাড়িতে উনি ড্রিংক করবেন না।

আমি বললাম, 'ইয়ারকি! গাড়িতে খাবার জন্যই তোমার বীয়র আনা হয়েছে। তুমি তো আমাকে বলেছিলে, একটু খানি খাবে।'

সুদীপ্তা প্রায় ঠোঁট ফুলিয়ে, আদুরে ভাব করে বলল, 'না, লক্ষীটি অলকবাবু, আমার শরীর মোটেই ভাল না, বীয়র খেলে আমার বমি হয়ে যাবে।'

বললাম, 'তা হলে হুইস্কি খাও।'

'ও বাবা, মাথা খারাপ!'

শান্তনু বলে উঠল, 'এই সুদীপ্তা, ঝামেলা বাড়িও না তো বাপু। একটু শান্তিতে খেতে দাও। বীয়রের বোতল কোথায় আছে?'

আমি বললাম, 'দেখুন, সোডা-কেসের পাশেই একটা প্লাস্টিকের ব্যাগের মধ্যে আছে।'

সুদীপ্তার দিকে ফিরে বললাম, 'তোমার পাশে দেখ, দুটো র‍্যাকে দুটো গেলাস আছে, দুটোই দাও।'

সুদীপ্তা গেলাস দুটো তুলে দিতে উশীনর বলে উঠল, 'তোমার গাড়ি তো একটা সেলার দেখছি। ব্যবস্থা একেবারে সব পাকা।'

আমি বললাম, 'ওই জন্যই তো বড় গাড়ি করেছি। সারাক্ষণ কি আর গাড়িতে গেলাস হাতে করে থাকা যায়? এ গাড়ি জার্ক কম দেয়, র‍্যাকে গেলাস রাখলেও, চলকে পড়ার ভয় নেই।'

শান্তনু হাত বাড়িয়ে, সুদীপ্তার হাত থেকে গেলাস দুটো নিয়ে নিল। আগে কাঁচ বন্ধ করল, তা না হলে, বাতাসে বীয়র উড়ে চলকে যাবে। পাকা লোক আমার ডিরেক্টরটি। ওপ্‌নার দিয়ে, বীয়রের বোতল খুলে, প্রথম গেলাসে ঢেলে, আগে বাড়িয়ে দিল উশীনরের দিকে। উশীনর সেটা এগিয়ে দিল সুদীপ্তার দিকে। সুদীপ্তা বলল, 'আপনি নিন।'

উশীনর বলল, 'লেডিজ ফার্স্ট। আপনি নিন, আমি নিচ্ছি।'

সুদীপ্তা বলল, 'থ্যাংক্যু।'

আহ্, মরে যাই। ব্যাপার বুঝতে পারছি না, উশীনরের সঙ্গে

দেখছি, বেশ নরম সুরে কথা হচ্ছে, মিঠি মিঠি হাসি ছড়ানো হচ্ছে। হিরোইনের রোল পাবার আশায় নাকি? গাছে কাঁটাল গোঁফে তেল। চল, তোমাকে আমি দেখছি। শান্তনু আর এক গেলাস বীয়র দিল উশীনরকে। আমি তাড়াতাড়ি আমার পাশের র‍্যাক থেকে একটা গেলাস তুলে নিলাম। হুইস্কির বোতল আগেই বের করেছিলাম। মোচড় দিয়ে, কর্ক খুলে, পুরো একটা পাতিয়ালা পেগ ঢাললাম। শান্তনুর ততক্ষণে সোডার বোতল খোলা হয়ে গিয়েছে। আমি গেলাস দিতেই, ঢক ঢক করে সোডা ঢেলে দিয়ে, গেলাস আমার হাতে দিয়ে বলল, 'শালা, আমাকে বেয়ারা পেয়েছে।'

বলেই উশীনরের দিকে ফিরে বলল, 'আপনাকে কিন্তু কিছু বলিনি স্যার, আপনারটা আমি গ্ল্যাডলি ঢেলে দিয়েছি।'

উশীনর হেসে বলল, 'এখন দেখছি, আপনিই বেশি ফর্মাল হয়ে উঠছেন।

আমি একটু খোঁচা না দিয়ে পারলাম না, বললাম, 'উনি এর পরে আরো অনেক কিছু হবেন, তখন দেখবে। এখন নিন শান্তনুবাবু, আপনারটা ঢালুন, আর কতক্ষণ হাতে ধরে থাকব।

জানতাম, শান্তনু একটা ধমক দেবেই, 'আপনি চুপ করুন তো মশাই, আপনি খান না।'

বললাম, 'বাঃ সবাই মিলে, নতুন নাটকের জন্য টোস্ট্ করব তো।'

রামের বোতলের কর্ক খোলার শব্দ হল। শান্তনু বোতলটা হাতে তুলে ধরে বলল, 'ফর দ্য সাকসেস্ অফ্ নেক্স্ট্ ড্রামা।'...

ছিপি খুলে, ঢক ঢক করে সে খানিকটা নীট্ রাম গলায় ঢেলে দিল। আমরা সকলেই গেলাস তুলে ধরেছিলাম। লক্ষ্য রেখেছিলাম, সুদীপ্তা গেলাসটা তুলে ধরে কী না। ধরেছে, আর গেলাস তুলে ধরে, যেন একটা তাচ্ছিল্যের বাঁকা হাসি ঠোঁটে নিয়ে উশীনরের দিকে তাকাচ্ছে। আমি শান্তনুর সঙ্গে সঙ্গেই চুমুক দিলাম।

উশীনর বলে উঠল, 'একি শান্তনুবাবু, আপনি একেবারে নীট্ খেলেন ?'

শান্তনু যেন গুড়িয়ে উঠল, 'ইয়া স্যা।'

আমি বলে উঠলাম, 'পিপিলিকার পাখা ওঠে মরিবার তরে।'

শান্তনু একটা খিস্তি করল, যেরকম ও করেই থাকে। আমি দেখলাম, উশীনর অবাক হল, আমার দিকে তাকাল। আমি বাঁ হাতটা নেড়ে, ঠোঁট বাঁকিয়ে দিলাম। বোঝাতে চাইলাম, এ কিছু নয়। উশীনর সুদীপ্তার দিকে ফিরে তাকাল। অনেকক্ষণ থেকে দেখছিলাম, মেয়েটা উশীনরের দিক থেকে চোখ ফেরাচ্ছে না। এখন দেখছি অন্য দিকে তাকিয়ে আছে। বোধহয়, নতুন মানুষ উশীনরকে বোঝাতে চাইছে, শান্তনুর খিস্তিটা ও শোনে নি, বা শুনলেও বুঝতে পারে নি।

উশীনর কি এতই বোকা, এত মানুষকে নিয়ে নাটক লেখে, আর এই ঢঙীর ধূর্তোমি বুঝতে পারবে না! বলা যায় না, এরা হয়তো লেখার সময় এক রকম, আর এমনি চলায় ফেরায় আর এক রকম। কিন্তু, এর মধ্যেই তো দেখছি, দু জনের কোমরে ছোঁয়াছুঁয়ি হচ্ছে। আমি ওভাবে বসলে হয়তো, এতক্ষণে সুদীপ্তা আর একটু সরে বসতে চাইত। কী জানি বাবা, উশীনরের প্ল্যান আছে নাকি। শোনা তো যায় অনেক কিছুই ওর নামে।

সুদীপ্তা তখন কী রকম শয়তানিটা করল। মনে হতেই, এক চুমুকে গেলাসের হুইস্কি তলিয়ে দিলাম। উশীনরের কাছে প্রায়, আমাকে বেইজ্জত করে দিল। আমাকে সরিয়ে দিয়ে, উশীনরকে ডেকে বসাল মাঝখানে। এর একটা শোধ না নিয়ে, আমি ছাড়ব না। উশীনর অবিশ্যি খুব ভদ্রতা করেছিল, বসতে চায় নি। কী ভেবেছিল উশীনর, কে জানে।

তবে, উশীনরের সঙ্গে যদি, সুদীপ্তার কিছু হয়, আমার আপত্তি নেই। উশীনর আমার কাজের জন্যই চলেছে। তাছাড়া, সে আমার বন্ধু। আমাকে মাঝখান থেকে তুলে দিয়ে, সুদীপ্তা যদি উশীনরকে

নিয়ে খুশি থাকতে চায়, থাকুক। আর উশীনরও যদি খুশি হয়, খুবই ভাল। আমি ওর কাছ থেকে ভাল কাজ পাব। উশীনরের মত নাট্যকারকে, সুদীপ্তাকে দিয়ে যদি আমি কিছু সুবিধা আদায় করে নিতে পারি, এর থেকে ভাল আর কী হতে পারে। কিন্তু সুদীপ্তাকে যদি আমি চিনে থাকি, বিনা স্বার্থে, কাউকে ধরা দেবার মেয়ে ও না।

শান্তনু আবার বোতল তুলে গলায় রাম ঢালল, আর হেঁড়ে মোটা গলায় গেয়ে উঠল, 'আমি কী কারণে, কারণ খাই মা, তার কারণ জানি না।'

আমি আমার গেলাস শেষ করে, বললাম, 'বহুত আচ্ছা বেটা, অওর জোরসে লাগাও, মুঝে এক সোডা ডালো।'

'ধুত্তোরি সোডার নিকুচি করেছে, নিজে খুলে নিন মশাই। বোতল আর ওপ্‌নার দিয়ে দিচ্ছি।'

আমি আমার গেলাসে হুইস্কি ঢালতে ঢালতে বললাম, 'দিমাক মত খারাপ করো বেটা, তুম মাতোয়ালে বন গয়া। জলদি সোডা লাও।'

শান্তনু আবার রামের বোতল তুলে গলায় ঢালল। উশীনর বলে উঠল, 'সোডা' দিয়েই খান না শান্তনুবাবু, শরীর টরীর খারাপ করে বসবেন।'

শান্তনু বলল, 'আরে দূর মশাই, আমার ওরকম জলো মাল ভাল লাগে না। গলা দিয়ে নামবে, পেটে গিয়ে পড়বে, সবটা একেবারে চনচনিয়ে যাবে, তবে তো।'

বলেই সে, শব্দ করে সোডার বোতল খুলল। আমি ভাবলাম, যাক, শান্তনু উশীনরকেও 'দূর মশাই' বলতে আরম্ভ করে দিয়েছে। ফর্মে আসতে যতক্ষণ। আমি শান্তনুর হাত থেকে সোডা নিয়ে, হুইস্কিতে ঢাললাম। বোতল ফিরিয়ে দিয়ে, গেলাসে চুমুক দিতে লাগলাম। উশীনর সিগারেট এগিয়ে দিল আমাকে। গেলাস র‍্যাকে রেখে, সিগারেট নিলাম। দেখলাম, উশীনর ওর ভাল ফিল্‌টার-টিপড্‌ সিগারেটের প্যাকেট, সুদীপ্তার দিকে বাড়িয়ে ধরল। সুদীপ্তা একটা সিগারেট তুলে নিয়ে, একটু হাসল।

হু, আচ্ছা, এত! উশীনরের কাছ থেকে আবার সিগারেট নিয়েও খাওয়া হচ্ছে! বীয়রের গেলাসও, দুজনের প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। আমাকে তো ওর রেয়াত করার কিছুই নেই জানি, ওর শান্তনুদার মুখেও যে, ইয়ে করে দিচ্ছে। সময়ে সবই হয়। শান্তনুদা সবই জানে, বোঝে, কিছু বলে না। উশীনর শান্তনুর দিকে প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বলল, 'শান্তনুবাবু, সিগারেট।'

শান্তনু একবার পিছন ফিরে দেখল, বলল, 'না স্যার, ও সিগারেট আমার চলবে না, বড্ড নরম, আমি একটু কড়া মালের ভক্ত।'

বলবার সময়েই লক্ষ করলাম, সুদীপ্তার আঙুলের ফাঁকে সিগারেটটা একবার শান্তনু দেখল, তারপরে বৈজুকে বলল, 'অন্দরকা বাত্তি অফ্ কর দো বৈজু।'

বৈজু বাতি অফ্ করে দিল। উশীনরের হাতে বীয়রের গেলাস, সিগারেট বের করতে পারছে না। সুদীপ্তা নিজেই প্যাকেট থেকে একটা সিগাবেট বের করে, উশীনরের ঠোঁটের মধ্যে গুঁজে দিল। উশীনর বলল, 'থ্যাংক্যু।'

চমৎকার! উশীনর বেশ এলেমদার ছেলে বলে মনে হচ্ছে। শান্তনুর কথা মত, খালি মেয়ে-পটানো চেহারা না ওর, পটাতেও পারে। আমি তো আবার এত হ্যাঁপা পোয়াতে পারি না। কই, আমার তো এ পর্যন্ত একদিনও, সুদীপ্তার সঙ্গে ড্রিংক-টেবিলে বসে, ওকে সিগারেট অফার করবার কথা মনে হয়নি। কিছুই খেতে চায় না, কোনরকমে একটু বীয়র, তাকে সিগারেট খেতে বলব! আমি বললে হয়তো উঠেই চলে যেত।

উশীনর ওর পকেট থেকে, সিগারেট-লাইটার বের করে, জ্বালিয়ে আগে সুদীপ্তার মুখের কাছে দিল। সুদীপ্তা সিগারেট ধরিয়ে, উশীনরের দিকে চেয়ে, হাসল। উশীনর আমাকে আগুন এগিয়ে দিল, আমি ধরালাম, তারপরে ও নিজে ধরাল। এসব কায়দা-কানুন, আমার দ্বারা কোনদিন হবে না। আমি বাবা ব্যবসাদার মানুষ

এত চাল আমার আসে না। সিগারেট ধরিয়ে দিতে হবে, গেলাস আগে এগিয়ে দিতে হবে, তখন আবার ছুঁড়ির চোখের দিকে চেয়ে একবার হাসতে হবে, উশীনরকে তো তাই করতে দেখছি, ধুর, গুলি মারো। মেয়েমানুষকে অত তোয়াজ করতে পারব না। যখন যা কাজ, তাই করে যা বাপু, এত রপোট কিসের।

শান্তনুও ইতিমধ্যে সিগারেট ধরিয়েছে, টোস্টেড টোবাকোর কড়া সিগারেট। উশীনর বলল, 'কই শান্তনুবাবু, বেশ তো শ্যামাসঙ্গীত ধরেছিলেন, গানটা হোক।'

শান্তনু বলল, 'দূর মশাই, আমি কি গান গাইতে পারি নাকি। আমার হল, ষাঁড়ের ডাক।

আমি বলে উঠলাম, 'যাক, আমার ডিরেক্টর তার নিজের গলাটা চেনে।'

সুদীপ্তা খিল খিল করে হেসে উঠল। উশীনর বলল, 'আমার কিন্তু বেশ লাগছিল। ওই গলাতেই, শ্যামাসঙ্গীত মানায়।'

শান্তনু বলল, 'ঠাট্টা করছেন স্যার ?'

উশীনর বলল, 'বিশ্বাস করুন। আমি এত লোকের গলায় শ্যামাসঙ্গীত শুনেছি, কিন্তু একবার শ্মশানে, মদ খেয়ে টঙ্ হয়েছিলেন এমন একজন তান্ত্রিকের গলায় শ্যামাসঙ্গীত শুনেছিলাম, সে-রকম আর কখনো মনে হয়নি। একে গভীর রাত, চারদিকে অন্ধকার, শ্মশানের চেহারা বুঝতেই পারছেন, বর্ধমানের এক পাড়াগাঁয়ের শ্মশান। সে গান শুনে মনে হয়েছিল, হ্যাঁ, এর নাম শ্যামাসঙ্গীত। কোথায় লাগে, রেডিও-রেকর্ডের শ্যামাসঙ্গীত।'

শান্তনুর যেন উশীনরের কথাটা মনে ধরল। 'হ্যাঁ, তা হতে পারে, সে হচ্ছে, ভক্তের গান। আমার ভক্তি-টক্তি নেই, আমার মেজাজ এল, একটু হাঁক দিলাম।'

আমি বললাম, 'ষাঁড়ের মতন।'

শান্তনু ধমকে উঠল, 'কেন মশাই বাজে বক বক করছেন।'

তার আগেই আমি উশীনরকে বললাম, 'দাও দাও, তোমার

গেলাস শেষ করে দাও, এভাবে খেলে তো, বীয়র সব পড়েই থাকবে। এই সুদীপ্তা, শেষ কর।'

উশীনর আগে শেষ করে, গেলাস আমার হাতে দিয়ে দিল। আমি দিলাম শান্তনুকে। সুদীপ্তা বলল, 'আমি কিন্তু আর খাব না।'

বলে, ফ্রন্ট সীটের পিছনে, অ্যাশ্‌ট্রে-তে, আঙুলের টোকায় সিগারেটের ছাই ঝাড়ল। ন্যাকামি! কী খিস্তি যে করতে ইচ্ছা করে না! শান্তনুর গম্ভীর মোটা গলা শোনা গেল, 'দাও সুদীপ্তা, তোমার গেলাস দাও।'

আবার সেই, আদুরে গলায়, এক কথা, 'আমি আর খাব না, শান্তনুদা।'

শান্তনু বলল, 'খাবে না, পান করবে।'

'উঁ উঁ উঁ, নাঁ। আঁ-আঁ-আঁ।'

ইস্‌, যেন টালির চালে, বেড়ালিটার মত ওঁয়া ওঁয়া করছে। শান্তনু বলে উঠল, 'তাড়াতাড়ি দাও তো, আমার ভাল লাগছে না। এই নিন স্যার।'

উশীনরের গেলাস ভরে দিল ও। সুদীপ্তা এবার গেলাস এগিয়ে দিল। উশীনর নিজেই, সুদীপ্তার গেলাসটা শান্তনুর হাতে দিল। দিয়ে, উশীনর সুদীপ্তার দিকে তাকাল, আর সুদীপ্তা, চোখগুলোকে কেমন করে, ঠোঁটটা কুঁকড়ে, একটা ভঙ্গি করল। বাঁ হাতটায় একটা ছোট ঝটকা মেরে, শান্তনুর দিকে দেখাল। তার মানে, শান্তনুর ওপর রাগ দেখাচ্ছে। আমি দেখছি সবই। আর ভাবছি, উশীনর তো কই, একবারও সুদীপ্তার হয়ে, বারণ করল না, 'যাক উনি যখন খেতে চাইছেন না, আর দেবেন না।' সেবেলায় বেশ চুপ করে রইল। তার মানে কি, সুদীপ্তাকে একটু খাওয়াতে চায় উশীনর, না কি সুদীপ্তার ঢঙটা বুঝতে পেরেছে। বুঝতে পেরেছে বোধহয়, সুদীপ্তা আসলে খেতে চায়, তবে সব বিষয়েই, একটু ঘোলা করে না নিলে, জমে না। আবার এও হতে পারে, উশীনরের

চোখের দিকে চেয়ে হয়তো, সুদীপ্তা বুঝেছে, ও খেলে, উশানর খুশি হবে, তাই খেতে রাজী হয়েছে। যে রকম দুজনের চোখে চোখে চেয়ে হাসা, ওসব তো আমাকে মেরে ফেললেও হবে না। অত ন্যাকামি করা যায়। আমার ওরকম হবেই না।

শান্তনুর ধমকের ভয়েও হতে পারে। কিন্তু ড্রিংক করার জন্য, শান্তনু যে সুদীপ্তাকে এভাবে বলতে পারে, আমি কোনদিন ভাবি নি। এ একেবারে নতুন। যেন, ঝেঁজে ধমক দিয়ে খাওয়াচ্ছে। তা হলে বুঝতে হচ্ছে, মাল কট্, সুদীপ্তার অনেক বিষয়ই ও জানে। তা না হলে, ড্রিংক করার জন্য, এভাবে ধমক দিত না।

উশানরের চুমুক এবার একটু ঘন ঘন হচ্ছে। ও বলল, 'একেবারে এভাবে চুপচাপ গাড়িতে বসে থাকা যায় না।'

সামনের সীট থেকে শান্তনু বলল, 'হ্যাঁ, খাওয়া দরকার।'

উশীনর বলল, 'আমি সে কথা বলি নি। একটু গান টান হলে ভাল হতো।'

সুদীপ্তা হেসে উঠল। আমি বললাম, 'যার যা চিন্তা, পেটুকের খালি খাওয়া।'

শান্তনু আবার ঝেঁজে উঠল, 'হ্যাঁ, আপনি বসে বসে, চিঁড়ে-ভাজাগুলো সাবড়ালেন, আর আমি হলাম পেটুক।'

বলেই সেই রামের বোতল তুলে গলায় ঢালল। আমি বললাম, 'মাল খাচ্ছেন কেন, বেশি খিদে পাবে যে।'

আমি দেখলাম, উশীনর আর সুদীপ্তা চোখাচোখি করে হাসছে। সুদীপ্তার গেলাসও এবার খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে আসছে। আমি হলে কি, পাশাপাশি বসে, এতক্ষণ, চুপ করে বসে, খালি চোখে চোখে চেয়ে হাসতে পারতাম। অন্ততঃ সুদীপ্তাকে গায়ে হাত দিয়ে, একটু আদর করে ফেলতামই। এত ধৈর্য আমার নেই, মাথা খারাপ। উশীনর এরকম পারছে কেমন করে। আমার মনে হয়, শান্তনু হলেও, এতক্ষণে, সুদীপ্তার কাঁধে পিঠে, স্নেহ করবার জন্য, দু'চারবার চাপড়ে বুলিয়ে দিত। ওনাদের কর্ম, ওনারাই পারে।

নিজের বউয়ের সঙ্গেই কোনদিন ওসব ন্যাকামি করতে পারলাম না, তা আবার, বাইরের মেয়ের সঙ্গে।

আমার গেলাস শেষ হতে, আবার একটা নরমাল বড় পেগ ঢালতে ঢালতে বললাম, 'বয়, সোডা।'

'হ্যাঁ, আপনার বাবা কালের বয় হল শান্তনু গাঙ্গুলী।'

আমি জানতাম, ঠিক এরকমই একটা কিছু বলবে শান্তনু। আমি বললাম, 'নো, নট কারোর বাবা কালের বয়, শান্তনু ইজ এ গুড বয়।'

সুদীপ্তা আর উশীনর, দুজনেই, একসঙ্গে হেসে উঠল। সুদীপ্তা ওর শরীরটা এগিয়ে নিয়ে এসে, এমন ভাবে হেসে ঢলে পড়ল যে, ওর মাথাটা প্রায়, উশীনরের বুকের কাছে এসে ঠেকল, আর উশীনরের গেলাস শুদ্ধ একটু উঁচুতে তোলা হাতের কনুই, সুদীপ্তার কাঁধে ঠেকল। হুঁ, জমে গিয়েছে মনে হচ্ছে। উশীনর আমার দিকে তাকাল। আমি শান্তনুকে দেখিয়ে, ওকে একটু চোখ টিপলাম।

শান্তনু বলল, 'ধাক্কা দিয়ে যখন গাড়ি থেকে ফেলে দেব, তখন মজাটা টের পাওয়া যাবে, আমিও মাতাল হয়ে গেছি।'

আমি বললাম, 'তাহলে, হ্যাম ফটাস্, স্টেজ-ওনার অ্যাণ্ড ব্লাডি প্রোডিউসার ইজ ডেড, অ্যাণ্ড ইওর সারভিস উইল বী নো লঙ্গার রিকোয়ার্ড।'

শান্তনু বলল, 'বাঁচা যায়। ফুটানি না করে, ঠোঙায় চিঁড়েভাজা থাকলে ওটা দিন, আমার পেটে ইঁদুরে ডন মারছে। তা না হলে, এখুনি খাবারের প্যাকেট খুলে, খেতে আরম্ভ করে দেব।'

আমি বললাম, 'ও ইয়েস, আই অ্যাম অলওয়েজ অ্যাট ইওর সারভিস রাজা।'

তাড়াতাড়ি ঠোঙাটা খুঁজে, শান্তনুর দিকে দিলাম। তখনো কিছু চিঁড়েভাজা রয়েছে। শান্তনু সোডার বোতল খুলে, এক হাতে আমাকে দিল, আর এক হাতে, ঠোঙা নিল। এ সময়ে, আমার চোখে পড়ল, উশীনরের গেলাস খালি। আমি খুব গম্ভীর স্বরে,

অথচ মোলায়েম করে বললাম, 'শান্তনুবাবু, উশীনরের গেলাস ফাঁকা, দয়া করে একটা বীয়রের বোতল খুলবেন ?'

শান্তনুর মুখে চিঁড়েভাজা। গস্ গস্ করে বলল, 'নিশ্চয়ই।'

উশীনর বলল, 'না, আর থাক।'

আমি বললাম, 'না, থাকবে না, আরে বাবা, বীয়র তো। সুদীপ্তা, তোমার গেলাস খালি কর।'

সুদীপ্তা বুঝতে পারছে না, ও যে ঘাড় নাড়াচ্ছে, আমি তা দেখতে পাচ্ছি। ও উশীনরকে ঘাড় নেড়ে জানাচ্ছে, আর খাবে না। উশীনর আমার দিকে তাকাল। আমি তাকালাম না। উশীনর একবার শান্তনুর দিকে তাকাল, তারপরে আবার সুদীপ্তার দিকে। সুদীপ্তা নাকটা কোঁচকালো। শান্তনু উশীনরের গেলাস চেয়ে নিল। বলল, 'সুদীপ্তা, গেলাস দাও।'

সুদীপ্তা বলল, 'আমি আর পারছি না শান্তনুদা।'

শান্তনু উশীনরের গেলাসে বীয়র ঢালতে ঢালতে বলল, 'তুমি, কতটা পার, তা আমি জানি।'

তারপরে উশীনরের গেলাস দিতে গিয়ে, সুদীপ্তার দিকে চেয়ে বলল, 'বাজে বাজে কথা বল কেন, বুঝতে পারি না। তুমি কি জলে পড়ে আছ, নাকি, তোমাকে এই রাত্রে এখন বাড়ি ফিরে যেতে হবে ? দাও, গেলাস দাও।'

বাঃ বাঃ রে শান্তনু গাঙ্গুলী, বাপের ব্যাটা। আমি তারিফ না করে পারলাম না। ছুঁড়ি দেখছি, শক্তের ভক্ত। সুদীপ্তা তবু উশীনরের দিকে একবার তাকাল। উশীনর বলল, 'যতটা পারেন, ততটা নিন, পুরো গেলাস নেবার দরকার কী।'

সুদীপ্তা শান্তনুকে গেলাস বাড়িয়ে দিতে দিতে বলল, 'না, খাব তো পুরোটাই খাব। গেলাস ভরে দিন শান্তনুদা।'

শান্তনু একটুও ফ্যানা না করে, পুরো গেলাস ঢেলে দিল। সুদীপ্তা নিয়েই, এক চুমুকে প্রায় অর্ধেক করে দিল। উশীনর ওর দিকে ঠায় তাকিয়ে আছে। যেন মাগ-ভাতারের খেলা চলছে। এই

চালগুলো কোনদিন শিখলাম না। শান্তনু আবার বোতল তুলে গলায় ঢালল, তারপরেই এক খাবলা চিঁড়েভাজা মচমচ করে চিবোতে লাগল।

আমার নেশা ধরে উঠেছে। কত দূরে এলাম, বুঝতে পারছি না। মনে হয়, রূপনারায়ণ আর বেশী দূরে নেই। জয়াটা এখন খোকাকে কোলের কাছে নিয়ে ঘুমোচ্ছে, আর আমি, কোথায় কী করছি। কে জানে, ছেলেটাকে বিকালে ডাক্তার দেখানো হয়েছে কী না। তারপরেই হঠাৎ আমার বুকটা ধড়াস করে উঠল, আয়রন চেস্টের মধ্যে, চেক-বইগুলো রেখে এসেছি তো! মনে করতে পারছি না কেন। দাঁড়াও, ভাবি, ভাবি একটু। রমেশকে ডেকে বিকালে সাতটা চেক দিয়েছি। এ সবের সঙ্গে, 'কিন্নরী'র কোন সম্পর্কই নেই। আমার নিজস্ব ব্যবসার ব্যাপার। সাতটা চেক রমেশকে দিলাম। ক্যাশিয়ার বাবুকে তার খাতাপত্র সবই ফিরিয়ে দিয়েছি। তাঁর নিজের প্রয়োজনে যে চেক-বই আছে, সেটা দেখে শুনে ফেরত দিয়েছি। রমেশকে বললাম—হ্যাঁ হ্যাঁ, মনে পড়ছে, রমেশ যখন আয়রন চেস্ট খুলে, চেক-বইগুলো রাখছে, তখন আমি তাকিয়েছিলাম। এখন স্পষ্ট মনে পড়ছে। বাব্বা, বুকের থেকে যেন একটা পাষাণভার নেমে গেল। অবিশ্যি, কয়েকজন কর্মচারী, আমার খুবই বিশ্বাসী। তাদের ফাঁকি দিয়ে কোন কিছু করা সম্ভব না। কেন না, চাবি বন্ধ করে এলেও, চুরি হতে কতক্ষণ। সেদিকটা আমি অনেক নিশ্চিন্ত।

আমি সিগারেট ধরালাম। উশীনর আবার সুদীপ্তাকে সিগারেট অফার করল। সুদীপ্তার মুখটা দেখতে পাচ্ছি না। কিন্তু ওর খালি গেলাসটা দেখতে পাচ্ছি। উশীনরের গেলাসে, এখনো বীয়র রয়েছে। সুদীপ্তা সিগারেট নিয়ে, ঠোঁটে গুঁজে দিল। উশীনরকে সিগারেট বের করে, আগের বারের মত ওর ঠোঁটে গুঁজে দিল না। উশীনর হয়তো আশা করেছিল, কিন্তু কিছুই বলল না, লাইটার জ্বালিয়ে সুদীপ্তার মুখের কাছে নিয়ে গেল। দেখলাম, সুদীপ্তার কপালের এক

পাশ, রুক্ষ চুলে ঢাকা পড়ে গিয়েছে। বুকের এক পাশ থেকে আঁচলটা একেবারে সরে গিয়েছে। উশীনর ওর সিগারেটে যখন আগুন ছোঁয়াল, তখন সুদীপ্তা উশীনরের চোখের দিকে তাকাল। আমার যেন বুকের মধ্যে চলকে উঠল। দারুণ দেখাচ্ছে এখন সুদীপ্তাকে, একেবারে ফিল্‌ম্।

সুদীপ্তা সিগারেটটা ধরিয়ে, একমুখ ধোঁয়া ছাড়ল। ঘাড়ে ঝাঁকুনি দিয়ে, কপালের চুল সরিয়ে বলল, 'উড ইউ মাইণ্ড, ইফ আই অফার ইউ দিস্ সিগারেট, বিকজ আই কা'ন্ট।'

উশীনর যেন একটু কেমন হয়ে গেল, ও আমার দিকে তাকাল। আমি একটা গাধা, মুখটা তাড়াতাড়ি ফেরাবার আগেই, ওর সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। আমি বলে উঠলাম, 'ক্যারি অন্।'

সুদীপ্তা উশীনরকে বলে উঠল, 'ও, আপনার খেতে ইচ্ছা করছে না? তাহলে থাক।'

উশীনর একটু হাসল, কিন্তু দেখলাম, হাত বাড়াল না। শাবাশ্, বাপের ব্যাটা। আমি ও সিগারেট মুখে নেব না। মেয়েমানুষের সিগারেট খাব কী।

কিন্তু, এ আবার কি, উশীনর যে সিগারেটটা সত্যি নিয়ে নিল সুদীপ্তার হাত থেকে।

সুদীপ্তা একবার উশীনরের দিকে তাকাল। ওদিক থেকে শান্তনু বলে উঠল, 'জয় কালী কেলকাত্তাওয়ালী। একটু গাঁজা নিয়ে আসতে পারলে হতো।'

ঠিক তখনই, যেন রেকর্ড বেজে ওঠার মত, সুদীপ্তার গলায় গান শোনা গেল। গানটার কথা আর সুর শুনে তো মনে হচ্ছে, রবিঠাকুরের গানই হবে বোধহয়। কী বলছে, কী—'তুমি মোর পাও নাই, পাও নাই পরিচয়। তুমি যারে জান, সে যে কেহ নয়, কেহ নয়।'

বাহবা, মেয়েটার গলাটা মিষ্টি আছে। গান গাইতে জানে, এটা তো কোনদিন জানতাম না। আমি একেবারে উশীনরের

পিঠের পাশ দিয়ে হুমড়ি খেয়ে বললাম, 'বাঃ রে পাগলি সুদীপ্তা, বেড়ে।'

শান্তনু বলে উঠল, 'চুপ করুন না।'

আমি বোধ হয় এবার সত্যি মাতাল হয়ে যাচ্ছি। তা না হলে, সুদীপ্তার মত মেয়ের গান এত ভাল শুনছি কেন। আমার কি কান খারাপ হয়ে গিয়েছে। সুদীপ্তা কেন ভাল গাইতে পারবে। কী জানি বাবা, ডাকিনী বিদ্যা-টিদ্যা জানে নাকি মেয়েটা। কিন্তু একটা জিনিস দেখছি, উশীনর সিগারেটটা আঙুলে ধরেই আছে, টানছে না। খাবে না বোধহয়। উশীনরের মত ছেলে, তা কখনো পারে। একটা ছোট অভিনেত্রীর মুখের সিগারেট, নিজের মুখে নেবে?

তবে, কী জানি, এও হয়তো মেয়ে পটানোর কোন তুক হতে পারে। সুদীপ্তার তো এ গান নির্ঘাত ডাকিনী বিদ্যা। ওর মত মেয়ে কখনো এমন গাইতে পারে না। গলার মধ্যে, ও নিশ্চয় কোন নাম-করা গায়িকার রেকর্ড লুকিয়ে রেখেছে। জানি না, তা হতে পারে কী না। তা না হলে এরকম গাইবেই বা কেমন করে।

এখন সবাই গান শুনছে। গানটা শেষ হল। উশীনর সামনের দিকে তাকিয়ে গান শুনছিল। সুদীপ্তা ওর হাত থেকে সিগারেটটা নিয়ে অ্যাশট্রে-তে গুঁজে দিল। উশীনর যেন দিতে চাইছিল না, সুদীপ্তা কেমন করে যেন ঘাড় ঝাঁকালো। ভাবটা, ঠিক আছে, আমি রাগ করি নি। সিগারেটটা অ্যাশট্রে-তে গুঁজে দিয়ে সুদীপ্তা জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। ওর জানালার কাঁচটা তোলা রয়েছে। উশীনরই এক সময়ে তুলে দিয়েছিল, আমার মনে আছে। সুদীপ্তার চুল উড়ছিল খুব, সেইজন্য। জানালার দিকে তাকিয়ে, সুদীপ্তা গুন গুন করতে লাগল।

এই সময়ে শান্তনু যেন আমার মুখের কথাটা বলে উঠল, 'সুদীপ্তা, আর একটা গান কর।'

সুদীপ্তা কোন কথা বলল না। আমি বললাম, 'আমিও সে কথা বলতে যাচ্ছিলাম।'

আমার বেলা সব গণ্ডগোল, কথাটা শেষ করবার আগেই, সুদীপ্তা গেয়ে উঠল :

আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে, চাও কী,
হায় বুঝি তার খবর পেলে না
পারিজাতের মধুর গন্ধ পাও কী—
হায় বুঝি তার নাগাল মেলে না।

না, ছুঁড়ি আমাকে পাগল করে ছাড়বে। জানি না, গানটা কাকে শুনিয়ে গাইছে। বোধহয় উশীনরকে, না হয়, শান্তনুকে। আমাকে নিশ্চয়ই না। কিন্তু আমার মত রসকষহীন লোকেরও বলে উঠতে ইচ্ছা করছে, আমি চাই তোমার প্রাণের—প্রাণের আবার সুধা কী। ওই যাই হোক, রবিঠাকুরের ব্যাপার তো, আমি ওটার মানে ঠিক বুঝে নিয়েছি। পারিজাতের না হোক, মধুর গন্ধও আমি পাচ্ছি। তবে, এ মেয়েটা যে মারাত্মক, তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। আঠারো কলার বেশি, চৌষট্টি কলা শিখে রেখেছে, যখন যেটা কাজে লাগে। এসব মেয়েদের দস্তুরই এরকম। এখন উশীনরকে ঘায়েল করা হচ্ছে। দেখো বাবা নাট্যকার, আমার মত রসাতলে গিয়ে বসে থেকো না, মরবে। অবিশ্যি, আমি জানি না, মেয়েটা মাতাল হয়ে গান শুরু করে দিয়েছে কী না। গেলাস চারেক বীয়র খাওয়া হয়েছে। আমার সঙ্গে বসেও গেলাস চারেক বীয়র খেয়েছে। কই বাবা, কখনো তো গান গাইতে শুনি নি, বরং জ্ঞান একেবারে টনটনে, একটু হাত এদিক ওদিক করতে গেলেই, ঝটকা মেরে সরিয়ে দিয়েছে।

এ ব্যাপার আলাদা রকম ঘটছে। বেশ বুঝতে পারছি, উশীনর আর ওর মধ্যে, কী একটা খেলা যেন শুরু হয়ে গিয়েছে। আর সেটা যে রসের খেলা, তাতে আমার কোন সন্দেহ নেই। ম্যাজিক নাকি রে বাবা! কেবল আমিই বঞ্চিত হব? লতাকে ওভাবে ছেড়ে দিয়ে, এত বুজরুকি করে, মেয়েটাকে নিয়ে এলাম, সব ফক্কিকারি! দেখা যাক।

গানটা শেষ হবার আগেই, রূপনারায়ণের ব্রিজের আলো দেখা গেল। ব্রিজে ওঠার আগেই, গান শেষ। আমি বৈজুকে বললাম, 'ব্রিজ পার হোকে, বাঁয়ে কিসি জায়গা পর খাড়া কর, খানা খা লেঙ্গে।'

শান্তনু বলল, 'জলের পাত্র একটা আনবার কথা ছিল।'

'সব ব্যবস্থা হচ্ছে।'

গাড়ি দাঁড়াল। আশেপাশে কিছু লরি দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তার নীচের দিকে, এখনো কোন কোন খাবারের দোকান খোলা রয়েছে। বাতি জ্বলছে, লোকজনও কিছু কিছু রয়েছে। আমি বললাম, 'খেতে দেবার কাজটা তুমি কর সুদীপ্তা।'

সুদীপ্তা কোন কথা না বলে, দরজা খুলে নেমে গেল। উশীনর যেন একটু চিন্তিত হয়ে পড়েছে, কথাবার্তা কিছু বলছে না। নিশ্চয়ই, কয়েক গেলাস বীয়র খেয়েই, মাতাল হয়ে যায় নি। গোলমাল বোধহয়, সুদীপ্তাকে নিয়েই। আমিও নীচে নেমে গেলাম। বৈজুকে ডেকে বললাম, 'পিছে কেরিয়ার মে, সিলভার ওয়াটার জাগ হ্যায়, উসকো নিকালো।'

বৈজু নেমে এসে বলল, 'ঠিক হ্যায়, হম সব দেখতা, আপ খানা খাইয়ে।'

শান্তনুও ইতিমধ্যে নেমে পড়েছিল। দরজাটা খুলে রেখেছিল। সুদীপ্তা খাবারের প্যাকেটগুলো ধারের দিকে এনে, কাগজের প্লেটে, চিকেন ফ্রায়েড রাইস, ফ্রাই চিলি চিকেন আর চিকেন চাউ চাউ ভাগ করছে। আমি কেরিয়ারে রাখা বড় বাক্স থেকে রেকর্ড প্লেয়ারটা বের করলাম। মারী কুইনের রেকর্ড বের করে, সামনের দিকে নিয়ে এসে, পিছনের সীটের দরজা খুলে, সীটের ওপর রেখেই, রেকর্ড চালিয়ে দিলাম।

উশীনরকে বললাম, 'কী হে, চুপচাপ ভেতরে বসে কেন, বাইরের হাওয়ায় এস।'

উশীনর বলল, 'বড্ড ঘুম পাচ্ছে ভাই।'

মনে মনে বললাম, 'কী জানি ভাই, এ তোমার ঘুম না আর কিছু, তা জানি না। খেলা যা জমিয়েছ, চমৎকার।'

উশীনর গান শুনে বলল, 'ব্রিলিয়ান্ট। তোমার দেখছি, গাড়িতে সব ব্যবস্থাই আছে।'

আমি বললাম, 'গাড়িটাকে তুমি আমার একরকমের সংসার বলতে পার।'

'তাই দেখছি।'

ইতিমধ্যে সুদীপ্তা, রেকর্ডের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গান গাইতে আরম্ভ করেছিল, 'দিস্ নাইট, দিস মুনলিট নাইট, ইওরস্ অ্যাণ্ড মাইন'। অথচ হাতের কাজও সমানে চালিয়ে যাচ্ছে। শান্তনুকে দেখছি, সুদীপ্তার গায়ের কাছে ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, খাওয়া শুরু করে দিয়েছে, বলছে, 'ফাইন, সুদীপ্তা আমাকে একটু কাঁচালঙ্কা দাও তো। ওটা কী? চিলি সস্? দাও। আর একটা কী .দেখছি, পলিথিনের পুঁটলিতে? সয়াবীন সস্? না, দরকার নেই।'···

সবই করছে সুদীপ্তা, আবার গানও করছে। তার মানে, মারী কুইনের গানও ওর জানা আছে। এলেমদার মেয়ে সত্যি। আমি একেবারে ওর পাশে চলে গেলাম। শান্তনু আমাকে একটু পাশ দিল, সুদীপ্তার কাছে যাবার জন্য। আমি একেবারে সুদীপ্তার গা ঘেঁষে দাঁড়ালাম। সুদীপ্তা কাগজের থালায় আমাকে খাবার এগিয়ে দিল, তখনো ওর গলায় রেকর্ডের সঙ্গে গান। আমি আর থাকতে পারলাম না, ওর গাল টিপে দিয়ে বললাম, 'বিউটিফুল।'

ভেবেছিলাম, রাগ করে সরে যাবে বুঝি। কিন্তু, আজ দিন অন্যরকম। সুদীপ্তা হাসল, বলল, 'এগুলো খান, আরো দেব, অনেক রয়েছে।'

তা হলে কি পালে বাতাস লাগল নাকি? সুদীপ্তা কি মেতে উঠেছে? আর একটু বীয়র খাইয়ে দিলে হতো। আমি আর পাশ থেকে নড়ছি না। কিন্তু ও বাবা, এ কি, টলে পড়ে যাচ্ছি যে। সুদীপ্তা আমার ঘাড়ের কাছে, শার্টের কলারটা চেপে ধরল, বলল,

'দেখবেন, আপনি টলছেন অলকবাবু, পড়ে যাবেন। ভেতরে গিয়ে বসে খান।'

মাথা খারাপ, আমি এখান থেকে এক চুলও নড়ব না, বরং একটা পা এগিয়ে, আমার উরত দিয়ে সুদীপ্তার কোমরের কাছে চাপ রেখে বললাম, 'না ঠিক আছে, পড়ব না।'

সুদীপ্তা কি শান্তনুর দিকে তাকিয়ে হাসল। যেন মাতালের কথা শুনে হাসছে। কিন্তু আমি তো জানি, সুদীপ্তা কেবল চটেই যায়। হঠাৎ এত রাত্রে, রূপনারায়ণের এ কি দয়া। ও যে কিছুই বলছে না, যদিও আমার উরতের কাছ থেকে কোমর সরিয়ে নিল। আমি বেশ মাতাল হয়ে গিয়েছি, চোখের সামনে কিছুই ঠিক নেই, সব যেন এলো-মেলো নড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে, কেবল সুদীপ্তাকেই ঠিক দেখতে পাচ্ছি।

শান্তনু বলে উঠল, 'যত মাতালের কারবার!'

আমি বললাম, 'শাট আপ্।'

সুদীপ্তা গাড়ির ভেতরে মুখ নিয়ে বলল, 'উশীনরবাবু, আপনাকে কি ভেতরেই দেব?'

উশীনরের গলা শুনলাম, 'হ্যাঁ, তা-ই দিন, খুব অল্প করে দিন।'

একেবারে ভদ্রলোক, কথাবার্তায় কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সুদীপ্তার পিছনটা আমার দিকে, উপুড় হয়ে, গাড়ির সীটে খাবার বাড়ছে। ও এত নীচে কাপড় পরেছে, কোমরের খানিকটা বেরিয়ে পড়েছে। ফর্মেশনটা বেশ! আমি কয়েক ইঞ্চি এগিয়ে গেলাম, আর তখনই সুদীপ্তা ভেতরে হাত বাড়িয়ে, উশীনরের খাবার দিল। আমি আরো কয়েক ইঞ্চি এগিয়ে গেলাম, আর তখনই সুদীপ্তা গাড়ির ভিতর থেকে, মাথাটা বের করে আনবার সময়, ওর পাছার ধাক্কায়, আমি টলে গেলাম। সেই টাল সামলাতে, হাত থেকে খাবারের প্লেট পড়ে গেল। শান্তনু আমাকে ধরে ফেলে, ঝেঁজে উঠল, 'আরে দূর মশাই, যান, গাড়ির মধ্যে গিয়ে, শুয়ে পড়ুন তো, শালা যত মাতালের কারবার!'

হ্যাঁ, মাতাল হয়ে গিয়েছি ঠিকই, হাত-পা ঠিক বশে নেই।

আমি হাত বাড়িয়ে, সুদীপ্তার কাঁধে রাখলাম। সুদীপ্তা কাঁধ থেকে আমার হাতটা তুলে সরিয়ে দিল, কিন্তু রাগ করে কিছু বলল না। বলল, 'খাবার তো সব পড়ে গেল, আর একটু খান।'

শান্তনু বলল, 'না না, আর খেতে দিতে হবে না। যান, শুয়ে পড়ুন গে।'

আমি বললাম, 'না, খাব, আমার খিদে রয়েছে। আমার খাবারটাও সাঁটবার তালে আছেন, না? কী পেটুক লোক রে বাবা।'

কথা জড়িয়ে গেলেও, বলছি ঠিকই। কিন্তু গান আর শোনা যাচ্ছে না কেন? আমি রেকর্ড না দিলে কি, কেউ দিতে পারে না? বললাম, 'এই উশীনর, রেকর্ডের কেসটা তো ওখানে রয়েছে, একটা রেকর্ড চাপাও না।'

শান্তনুর সেই খ্যাঁকানি, 'না না, আর এত রাত্রে, রাস্তায় রেকর্ড বাজাতে হবে না।'

সুদীপ্তা আবার আমার সামনে একটা প্লেট ধরল। আমি বললাম, 'তুমি খাবে না?'

'খাচ্ছি, আপনি খান।'

'আচ্ছা, গুড গ্যাল।'

চামচটা দেখছি আমার হাতে নেই। হাত দিয়েই মুখে পুরলাম। কী খাচ্ছি, কী না খাচ্ছি, কিছুই ঠিক বুঝতে পারছি না। বললাম, 'বৈজু, পানী পিলাও।'

বৈজু গেলাসে জল দিতে, গেলাস হাতে নিলাম। কিন্তু খাবারের প্লেটটা আবার পড়ে গেল। দুর শালা, মাতালের নিকুচি করেছে। জল খেয়ে, আমি আমার জায়গার দিকে গেলাম। বৈজু তাড়াতাড়ি, রেকর্ড-প্লেয়ার সরিয়ে নিল। আমি বসে এলিয়ে পড়লাম। সুদীপ্তা বোধহয় আমার ওপর এখন খুশি, মানে, তেমন রাগ টাগ নেই মনে হচ্ছে। দেখা যাক···জয়াটা এখন খোকাকে নিয়ে ঘুমোচ্ছে, কে জানে ছেলেটাকে ডাক্তার দেখেছে কী না। আর আমি এখন, একটা কে সুদীপ্তা বলে মেয়ের জন্য, কোথায় যাচ্ছি, কী হবে, কিছুই জানি না। কেন যে এরকম হয়, যাচ্ছেতাই···
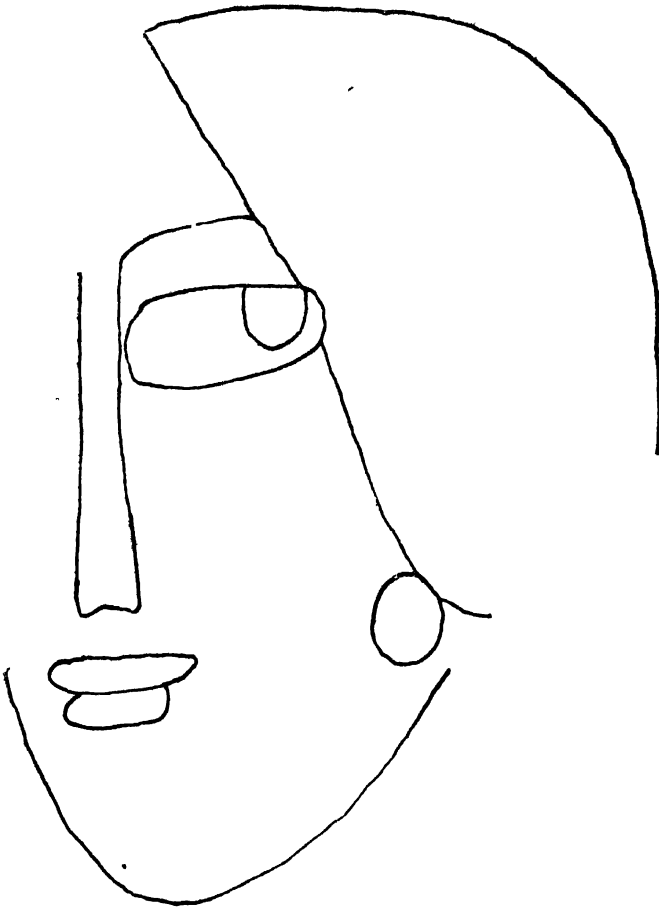
সু দী প্তা

অলকবাবুকে দেখে, আমার হাসি পেল। মনে মনে বললাম, ‘যাক, একটা কালাপাহাড় ধসেছে, এখন আর ওঠবার ক্ষমতা নেই।’ বাকী দুজনের বিষয়ে, আমি তা ভাবি না। ওরা না ধসলেও আমার ক্ষতি নেই। অলকের মত, বাকী দুজন আমাকে নিশ্চয়, এত জ্বালাতন করবে না। কথাটা ভাববারই দরকার নেই। বাকী

হুজন, আর অলকে অনেক তফাত। চান্স্ পেলেই, একটু গায়ে হাত ঠেকাবে। এত রাগ হচ্ছিল তখন, পা ফাঁক করে, প্রায় আমার কোমর জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করছিল। কলকাতায় হলে, আমি দেখিয়ে দিতাম। মদের জন্য টলতে হতো না, আমি এক ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিতাম। লোকটার কোন তন জ্ঞান নেই। আমাকে দেখলেই, এক ভাবনা, এক চিন্তা, এক ইচ্ছা। চোখের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। অলকের চোখের দিকে তাকালেই, মনে হয়, ওর হাত যেন আমার সারা গায়ে ঘুরছে, যেন আমাকে হুহাতে জড়িয়ে ধরে, শুষে কামড়ে দিচ্ছে। এত লুভিষ্টির খিদে কেন। শুনতে তো পাই, লোকটির মেয়ের অভাব নেই। এমন কি সুপর্ণা মজুমদারের সঙ্গেও নাকি, খুবই হলায় বলায়। তবে অত হাঁই হাঁই কিসের।

অবিশ্যি, অলকের আমি তেমন কোন দোষ দেখি না, সেটা সাধারণ ভাবে। পুরুষমানুষের অভাব না থাকলেও, তাদের অভাব মেটবার নয় যেন। একমাত্র অলকের চোখ দেখলেই যে আমার ওরকম মনে হয়, তা না। অনেক পুরুষের চোখ দেখেই, ওরকম মনে হয়। পুরুষেরা অন্যভাবে তাকাতে পারে বলেই, আমার মনে হয় না। কারোর চোখের কথা হয়তো একটু মিষ্টি, একটু ভদ্রতা মেশানো, কারোর একেবারে কাঁচা খাওয়া। অলকের হল, একেবারে কাঁচা খাওয়া।

তবে, এমন যে দেখিনি তা নয়, যে, প্রশংসা আর অবাক, হুইয়ে মেশানো চোখে চেয়ে দেখা। সেটা খুব কম। আমার কোনটাতেই আপত্তি নেই। পুরুষেরা কে কী ভাবে চেয়ে দেখছে, সেটা ভেবে এমনিতে আমার কিছু যায় আসে না। মোটের ওপর, আমি এটা বুঝেছি, ওরা আমাদের গালাগাল দিক, নিন্দা প্রশংসা যা-ই করুক, পুরুষেরা নিতান্তই পুরুষ। সব মিলিয়ে সে-ই এক জিনিস। সেই জন্যই তো, আমি এভাবে পোশাক পরি। পরতে অবিশ্যি ভাল লাগে, তবু সত্যি বলছি, অন্ততঃ আমার নিজের মনের কথা জানি, একটা কেমন রাগও যেন মনের মধ্যে মিশে থাকে। আমার মত,

এরকম নাভির নীচে শাড়ি পরা, কাঁধ আর বগল কাটা, পেট বের করা জামা পরা, আজকাল চলতি ফ্যাশান। এসব দেখলে সকলের মেজাজ খারাপ। এসবের তো আজকাল খুবই সমালোচনা। কিন্তু হাঁ করে চেয়ে দেখবার বেলায় তো, নজর একেবারে খাড়া। কেবল খাড়া কেন, আরো ফাঁক-টাঁক কোথাও আছে কী না, চোখ দিয়ে তাও খুঁজে মরে। তখন তো আমার মনে হয়, টপ্‌লেস্‌ পোশাক পরে, এদের সামনে দিয়ে চলে যাই। লোয়ার-লেস্‌টা নিজেরই ভাবতে কেমন গা শিরশিরিয়ে ওঠে। ক্ষতিই বা কী। ওরা গালাগাল দিলেও চেয়ে দেখবে, হাততালি শিস্‌ দেবে, চান্স পেলে, ধরে ছিঁড়ে খাবে।

এগুলো অবিশ্যি, খানিকটা রাগের কথা। আমাকে দেখে, পুরুষদের চোখ ঝলকে উঠছে, এটা দেখলে, আমি মনে মনে খুব খুশি হই। মনটা কেমন একটা খুশিতে যেন ফুলে ওঠে, দুলে ওঠে। কে-ই বা খুশি না হয়। আমি সুন্দর করে সাজলে সবাই যদি চেয়ে দেখে, তাহলে সাজব না কেন। তাছাড়া, আমি জানি, আমার যা চেহারা, আমার যা শরীর, তাতে আমাকে সাজলে মানায়। এভাবে সাজার কথা বলছি, নাভির নীচে শাড়ি, কাঁধ আর বুকের অনেকখানি কাটা জামা। বড় হাতা, পেট ঢাকা জামা, নাভির ওপরে শাড়ি, এরকম পরে দেখেছি, আমাকে যেন তৎক্ষণাৎ কেমন গেঁয়ো গেঁয়ো মনে হয়। হয়তো সত্যি সত্যি তা মনে হয় না, ওটা আয়নাতে আমার নিজেকে দেখারই ভুল। তবু পোশাকে-আশাকে আমি যতটা সম্ভব, হাল ফ্যাশনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে চাই। তা না হলে, অনেক সময় অনেক জায়গায়, অনেকে যেন কেমন কৃপার চক্ষে দেখে। তা দেখতে দেব কেন। আমি সব সময়ে, সকলের চোখে পড়বার মত থাকতে চাই, চলতে চাই।

তা বলে, চোখে পড়বার জন্য, অদ্ভুত একটা কিছু করতে চাই না। আর এও চাই না, প্রকাণ্ড একটা ভুঁড়ি বের করে, নাভির নীচে শাড়ি পরে রাস্তায় বেরোব, কিংবা আটচল্লিশ ইঞ্চি বুক নিয়ে,

পেট-কাটা জামা গায়ে দিয়ে বেরোব। কী অখাদ্য দেখতে লাগে। তবু অনেকেই ওরকম বেরোয়। আমি জীবনে কোনদিন তা বেরোব না, এমন কি, যেখানে আমাকে কেউ দেখতে পাবে না, সেখানেও।

সকলেই নিজের চেহারা নিয়ে ভাবে। মেয়েরা হয়তো একটু বেশীই ভাবে। একটা সুন্দর ছেলে বা পুরুষ, নিজের রূপ সম্পর্কে যত না ভাবে, একটা মেয়ে, তার থেকে বেশি ভাবে। রূপের দেমাক বলতে যা বোঝায়, তা মেয়েদেরই আছে, ছেলেদের তেমন না। ছেলেদের দেমাক, ছেলেরা চাপতে পারে, মেয়েরা কিছুতেই পারে না, হাঁটতে চলতেও তা ফুটে ওঠে। আমি মনে করি, সে জন্য দায়ী ছেলেরাই। একটা সুন্দর মেয়ে দেখল তো, তাদের আর চোখের পলক পড়বে না। তখন মেয়েরা ইচ্ছে করলেও, তার ভেতরের ব্যাপারটা চেপে রাখতে পারে না। কোথায় দিয়ে কী হয়ে যায়, তার সারা শরীরের নড়া-চড়ায়, চোখের দৃষ্টিতে, মুখের ভাবে ফুটে ওঠে। এ ব্যাপারে, দুজনেই সমান। একজনের পলক পড়ে না, আর একজনের ভেতরে গর্বে আর দেমাকে টলটলে অবস্থা।

আমি তো জানি, ছাব্বিশ ইঞ্চি বুকের দিকে বারে বারে চোখ পড়া, আর বারে বারেই হাত উঠে যায় বুকে, ঢাকা দিই, তবু ঢাকা পড়ে না, দেখাতে চাই না, তবু দেখানো হয়ে যায়, এ কী খেলা। তার ওপরে, আমার প্রফেশনটাও দেখতে হবে। অভিনয়। হ্যাঁ, এখন তো প্রফেশনই বলতে হবে, আর অ্যামেচারও বলা চলবে না, 'কিন্নরী'তে যখন যোগ দিয়েছি। আমার নামের শেষে 'অ্যাঃ' লেখাও থাকে না। মেয়েদের এমনিতেও বোধহয় একটু অভিনয় করতেই হয়, প্রায় বেঁচে থাকারই একটা অঙ্গ। পুরুষদের বেলায়, এটা কতখানি সত্যি, আমি ঠিক জানি না। প্রয়োজন বোধহয় হয় না। তবে অভিনেতা পুরুষও আমি কম দেখি নি। মঞ্চের কথা বলছি না। একেবারে জীবনের ক্ষেত্রেই তারা অভিনেতা, অভিনয় ছাড়া তাদের চলে না। এই মুহূর্তে, রূপনারায়ণের ধারে, আমার সামনেই এমন অভিনেতা আছে। তবে, সে কথা এখন আমি ভাবতে

চাই না। এ যাত্রায় আমাকে আরো অনেক কিছুই তো দেখতে হবে। তখন আরো ঠিক বলতে পারব।

তবে, পুরুষ অভিনেতা যারা তারা কতখানি বাঁচবার জন্য অভিনয় করে জানি না। মেয়েদের বাঁচবার জন্যই অনেককে অভিনয় করতে হয়। আমার মত মেয়েকে তো করতেই হয়। মঞ্চে করি, জীবনেও করি। সে হিসাবে সংসারটাও আমার কাছে একটা মঞ্চ। আমার এই পোশাকটা তো একজন অভিনেত্রীরই পোশাক। আমার প্রফেশনের সঙ্গে একে যতটা খাপ খাওয়ানো যায়, আমি তারই চেষ্টা করি। আমি অনেক বড় বড় কথা শিখেছি। সে সব কথার মানে বুঝি না, কিন্তু বুঝি এমন ভাবে বলতে পারি। যেমন, একটু আগে মারী কুইনের গান করলাম। এখন হয়তো গাইতে গাইতে অনেক কথারই মানে বুঝতে পারি। তা ছাড়া, গানের কথা তো একটু সহজই হয়। তাই বলছিলাম, নিজেকে একটু যাকে বলে, লোক-লোচনে আকর্ষণীয় করে তোলার একটা স্বাভাবিক ইচ্ছা আমার থাকবেই। সেই জন্যই তো আমি এরকম পোশাক পরি। পরি, তার কারণ, আমাকে যাতে সকলের চোখে পড়ে। দর্শকদেব এবং দর্শকদের জন্য যারা আমাদের দিয়ে কাজ করায়, তাদের সকলের। মুখে যা-ই বলি, সমাজের কথা ভাবলে, এখনো পুরুষদের কথাই আগে মনে হয়। দর্শকের কথা ভাবলে, যারা কাজ করাবে, তাদের কথা ভাবলে, আগেই পুরুষ। ভাল লাগা, মন্দ লাগা, রাগ করা, ঘৃণা করা, যা-ই ভাবি, আগে পুরুষ।

পুরুষদের জন্যই পরি। এই ব্যাপারে, পুরুষের রাগ ঘৃণা ভাল লাগা আমাকে যে ভাবে খুশি চাওয়া, সব কিছুর যোগফল, এক জায়গায়। বরং মেয়েদের কথা আলাদা। এ ব্যাপারে তাদের খুশি আর বিরক্তি খাঁটি। একটা মেয়েকে, তার সাজগোজসহ, ভাল না লাগলে, রাগ আর বিরক্তিটা এখানে যোগফল খালি হিংসা না। যেমন, একজন ভুড়িওয়ালি, আটচল্লিশ ছাতিওয়ালি ওরকম পোশাক পরলে, আমার খারাপ লাগে, তার মধ্যে আমার হিংসা থাকে না।

অবিশ্যি, একথা বলছি না যে, মেয়েদের মধ্যে, নিজেদের ব্যাপারে হিংসা নেই। বরং মেয়েদের হিংসা অনেক বেশী। পুরুষের যেমন লোভ, মেয়েদের তেমনি হিংসা। আমি নিজেকে সুন্দরী মনে করি না। কিন্তু এরকম জামা-কাপড় পরায়, আমি পুরুষের চোখে অনেক বেশী সুন্দর হয়ে উঠি। সুপর্ণা মজুমদার আমার থেকে সুন্দরী কী না, জানি না। হয়তো সুন্দরী, তবু সে-ও আমার মত করেই শাড়ি পরে। পারপাস্ সার্ভ কথাটার মানে আমি জানি। এই পোষাকটা পারপাস্ সার্ভ করে, আমার মত মেয়েদের জন্য। ছি ছি, হাসিও পায়, নিজেকে যাচ্ছেতাই করে গালাগালিও দিতে ইচ্ছা করে একটা ঘটনা মনে করে।

একদিন বাসের জন্য দাঁড়িয়ে আছি রাসবিহারী-কালীঘাটের মোড়ে। বেলা প্রায় বারোটা। কোথাও একটু ছায়া নেই, রোদে পুড়ছি। সাজগোজ আমার যেমন থাকে, তেমনই ছিল। চোখে সানগ্লাস, হাতে ব্যাগ। অন্য ফুটপাতে ছায়া দেখে, ওখানে গিয়ে দাঁড়ালাম, বাস এলে আবার ওদিকে চলে যাব। গাছতলার ছায়ায় বেশ জঁাদরেল চেহারার এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়েছিলেন। দেখে বেশ সমীহ হয়। জঁাদরেল মানে, মোটাসোটা না, বেশ লম্বা দোহারা চেহারা, ফর্সা রঙ। মাথায় অল্প টাক পড়েছে, চোখে চশমা, নাক চোখ মুখও বেশ ভাল। ধবধবে সাদা ফুলপ্যাণ্ট, সাদা শার্টের কলারে কালো নেকটাই। হাতে অ্যাটাচি। কেন জানি না, ভদ্রলোককে দেখে, উকীল বলে মনে হয়েছিল। বয়স পঞ্চান্ন-ষাটের মধ্যেই। তবে, উকীলদের সে সময়ে কোর্টে থাকবার কথা।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই, টের পেলাম, ভদ্রলোক আমাকে দেখছেন। এমন কি আর আশ্চর্য ঘটনা, ওরকম বয়সের লোকেরা, আমাকে হামেশাই দেখেন। কিন্তু উনি বারে বারেই আমার পেট নাভি আর কোমরের দিকে দেখছিলেন। খিদেয় পেট চুঁই চুঁই করছে, মশাই তখন আমার নাভি আর পেট দেখছিলেন। আমার সম্পূর্ণ চোখ ঢাকা সানগ্লাসের জন্য, উনি আমার চোখ দেখতে পাচ্ছিলেন না।

একবার গাছের দিকে তাকিয়ে, পাখী না কী যেন দেখলেন, অন্ততঃ সেরকম ভাব করলেন, তারপরে আমার দিকে এক পা এগিয়ে এসে দাঁড়ালেন। মাথা নীচু করে, (উনি আমার থেকে অনেক লম্বা) আমার খোলা জায়গায়, বারে বারে দেখতে লাগলেন। আমিও ব্যাগটা এ হাত ও হাত করতে গিয়ে, কাপড় সরিয়ে একেবারে নাভির আর কোমরের খোলা অংশ ওঁকে দেখতে দিলাম, মনে মনে বললাম, 'নিন দেখুন, কী দেখবেন।'

ভদ্রলোক পকেট থেকে রুমাল নিয়ে, মুখ মুছলেন। কিন্তু চোখ সরাতে পারলেন না। বুঝতে পারলাম, উনি একটু কাতর হয়ে পড়েছেন। তা বলে, এতটা মনযোগ। আমার মনে একটা পেজোমি চিন্তা এল। অথচ লজ্জাও করছিল। সে সময়েই, দূর থেকে আমার বাসটা আসতে দেখেছিলাম। আমি হঠাৎ, আমার নাভির চারপাশের পেশী কাঁপিয়ে দিলাম। এই কসরৎটা আমি পারি ভালই। হয়তো, চেষ্টা করলে, বেলি ড্যান্সার হতে পারতাম। এখনো একটা নাটকে, একটি বিশেষ ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য, একটা সীনে আমাকে এই কসরৎটা দেখাতে হয়। তখন দর্শকদের মধ্য থেকে, নানা রকম আওয়াজ ওঠে।

ভদ্রলোক যেন নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারেন নি, এমন ভাবে তাকিয়েছিলেন। তাঁর চোখের দৃষ্টি বদলে গিয়েছিল। আর মনে মনে বলেছিলাম, 'নিন, হয়েছে।' বলেই আমি, অন্য ফুটপাতে তাড়াতাড়ি চলে গিয়েছিলাম। লক্ষ করেছিলাম, ভদ্রলোক চোখ থেকে চশমাটা খুলে ফেলেছেন। পিছনে পায়ের শব্দও পেয়েছিলাম। গাড়িতে উঠে ওঁকে দেখতে পাই নি। এত করে দেখবার কী ছিল। আমাকে একলাই কি দেখেছেন? পথে-ঘাটে এত মেয়ে যে ওভাবে ঘোরে, তাদের দিকে দেখলেই পারেন।

কিন্তু পরে আমার খুবই খারাপ লেগেছিল। খালি ছি ছি করে মরেছিলাম। একজন বয়স্ক লোককে, কেন মিছিমিছি ওরকম করতে গেলাম। নিশ্চয়ই, মনে মনে আমাকে যা তা গালাগাল দিয়েছেন।

তাতে অবিশ্যি, আমার কিছু যায়-আসে না। কিন্তু আমার এই পোশাক, এই জীবন, কোন কিছুর জন্য, ওঁরই কি কিছু যায় আসে? কিছুই না। তবু আমার সেই পাজী বুদ্ধির জন্য নিজেকে গালি দিয়েছি। এরকম কি কেউ করে।

শাড়ি ছাড়া সালোয়ার-কামিজও আমি পরি। যতটা হাই হওয়া যায়, ততটাই করি। জিন-স্ল্যাকও বাদ দিই না। তবে, সবই জায়গা আর ব্যবস্থা বুঝেই করি। এটা যেমন বাইরের দিক থেকে, কেবল চোখে দেখার জন্য, দেখিয়ে বাঁচার জন্য, প্রয়োজনের জন্য করি, তেমনি মিথ্যা কথা বলি।

মিথ্য কথা আমার জীবন মরণ, মিথ্যা কথা ছাড়া, এক পা চলবার উপায় নেই। মিথ্যা কথা আমার সধবার শাঁখা-সিঁদুর। মিথ্যা আমাকে বলতেই হয়। মঞ্চে অভিনয় করি, সে তো সবাই জানে, ওটা একটা ভূমিকা মাত্র। জীবনে চলতে ফিরতে, সবখানেই আমাকে মিথ্যা কথা বলতে হয়। মিথ্যা না বললে, বাঁচতে পারব না।…

'এই সুদীপ্তা, কী ভাবছ কী? বৈজুকে খাবার দিয়ে, তোমার খাবার খেয়ে নাও।'

শান্তনুদা একেবারে আমার গায়ের কাছে এসে, প্রায় ধমকে উঠল। অথচ, আমি শান্তনুদার অপেক্ষাতেই আছি, ও আরো খেতে চাইবে। বললাম, 'আপনাকে আরো দেব যে।'

'তা হলে বৈজুকে দিয়ে দাও, ও দাঁড়িয়ে আছে।'

বৈজু বলে উঠল, 'নহি বাবুজী, আপলোগকো হম পানী দেঙ্গে।'

আমি গাড়ির মধ্যে একবার দেখলাম, উশীনর একটু একটু করে খাবার মুখে দিচ্ছে। গাড়ির ভিতরে আলো জ্বলছে। উশীনর ডান দিকে তাকিয়ে আছে। তবু মনে হচ্ছে যেন এদিকেই তাকিয়ে রয়েছে। আমার মুখটা বাইরের অন্ধকারে। আমার ঠোঁটের কোণটা একটু বেঁকে গেল। হাসি পাচ্ছে মনে। নাট্যকার একটু ব্যোমকে

গিয়েছেন, অথচ ব্যাপারটা যে কার চালাকি, সেটা বোধহয় আমরা দুজনেই বুঝতে পেরেছি। তবু ছলনা।

আমি বৈজুর খাবার বাড়তে বাড়তে তাকে বললাম, 'তুমি গাড়ির সামনে সিলভার জাগটা রাখ, কতক্ষণ ওটা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। আমরা জল নিয়ে নেব। তুমি খেয়ে নাও।'

বিরক্তিকর। রাত দুপুরে রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে লোক খাওয়াতে হচ্ছে আমাকে। এটা কি আমি ইচ্ছা করে মনের আনন্দে করছি? মোটেই না। ওই যে মরা ভল্লুকের মত এখন হাত-পা ছড়িয়ে গাড়ির মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আছে, 'কিন্নরী'র ওনার, আমাকে খেতে দিতে বলল। এটা যে আবার রীতি। একটি মেয়ে সঙ্গে থাকলে, সে-ই একটু জলটা খাবারটা হাতের সামনে বেড়ে দেবে, এগিয়ে দেবে। সব জায়গাতেই, ঘরোয়া পুরুষালি ভাবটা চাই। মেয়েদের হাত থেকে নিয়ে খেতে খুব ভাল লাগে। একটি মেয়ে চোখের সামনে বেশ বেড়ে চেড়ে হাতে তুলে দেবে, দেখতেও ভাল লাগে, খেতেও ভাল লাগে। এই হল পুরুষের মন।

আমার কোথায় নেশা ধরে গিয়েছে। খিদেও পেয়েছে অসম্ভব। রীতিমত জল কাটছে মুখে, খাবারের গন্ধে। কিন্তু আমাকে এখন কর্তব্য করতে হচ্ছে। এমন কিছু নেশা অবিশ্যি না, পেটে খাবার থাকলে হয়তো আরো কিছু খেতে পারতাম। না থাকলেও পারতাম, কিন্তু তাতে বেশি নেশা হয়ে যেত, কী বকবক করতে আরম্ভ করতাম, পাগলের মত গান গাইতেই থাকতাম, তা হলে, এ গাড়ির সকলেই বেশ খুশি হতো। অলক তো তাই চাইছিল, যাতে খেয়ে খেয়ে আমি বেহেড হয়ে যাই। শান্তনুদাও চাইছিল, আমি যেন আরো খাই। উশীনরের মতলবটা প্রথমে ধরতে অসুবিধা হয়, তবে আমি খেয়ে বেশ তর্ হব, এটা ওরও একটু ইচ্ছা ছিল।

বৈজুর হাতে খাবার দিয়ে আমি আবার একবার গাড়ির মধ্যে দেখলাম। জিজ্ঞেস করলাম, 'উশীনরবাবু, আপনাকে আর একটু দেব?'

উশীনর জবাব দিল, 'না।'

শান্তনুদা আমার কাঁধে একটা হাত রাখলেও, আমি কিছু ভাবতে চাই না। আমাকে অনেক ছেলেবেলা থেকে দেখেছে, একসঙ্গে অনেকবার অভিনয় করেছি। তবু মেয়েদের মন তো, একটু হাসি ঠোঁটের কোণে যেন ঝিলিক দিয়ে যায়। শান্তনুদা খেতে খেতে আমাকে দেখছিল, এখনো দেখছে। এখন তো ঠিক নিজের জায়গায় নেই, বাইরে। একটা অন্যরকমের জার্নি, রাত্রি, রাস্তা, পেটে প্রচুর কাঁচা রাম। ড্রিংক করা অবস্থায় যে শান্তনুদাকে কখনো দেখিনি, তা নয়। বহুবার দেখেছি। শান্তনুদা যেমন তেমনই, হেঁকে-ডেকে বকে-ধমকে ছাড়া কথা বলে না। হাত ধরে হ্যাঁচকা টেনে সরিয়ে দেয়, কাছে টেনে নেয়, পোজিশন ঠিক করে দেয়। আমাকে একলা না, অনেক মেয়েকেই ওরকম করে। আড়ালে আবডালে না, সকলের সামনেই। তাতে কেউ কিছু মনে করে না।

শান্তনুদার মুখও খুব মিষ্টি না। এমন সব কথা বলবে, আমাদের মেয়েদের সামনেই, এমন কথা বলবে, যাকে খিস্তি ছাড়া বলা যাবে না। মানে আমাদেরই খিস্তি করে কথা বলে। সেটা কারুর কানেই খুব বাজে না। সকলেরই সয়ে গিয়েছে। আজও গাড়ির মধ্যে কয়েকবার অলকের সঙ্গে খিস্তি দিয়েছে। উশীনর একটু অবাক হয়েছে, একটু অস্বস্তিবোধ করেছে। অমন খিস্তি যে উশীনর শোনে নি, তা না। আমি কাছে রয়েছি বলেই, ওর অস্বস্তি। উশীনরের নাটকে অনেক চলতি গালাগাল থাকে, খচ্চর, বানচোত্, শুয়ারের বাচ্চা। আরো কয়েক ধাপ নীচের গালাগালও ওর না জানা থাকার কথা না। কিন্তু মেয়েদের সামনে, নিজেরা খিস্তি করবে, এতে বোধহয় ঠিক অভ্যস্ত না। তাই, শান্তনুদার খিস্তির সময়ে, বারে বারেই আমার মুখের দিকে দেখছিল। আমি হেসে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছিলাম। আমি ভাবটা করছিলাম, করুকগে, ছেড়ে দিন। আর উশীনর খানিকটা যেন অসহায়, বন্ধুবান্ধবের ব্যাপার, অথচ তেমন ঘনিষ্ঠতাও জমে ওঠে নি, তাই কিছু বলতেও পারছিল না।

শান্তনুদার সবই সামনা-সামনি। সবকিছুতেই হাঁকডাক চেঁচামেচি ছুটে বেড়িয়ে দাপাদাপি, বিশেষতঃ কাজের সময়, তবু— তবু কেন জানি না, শান্তনুদা যে পুরুষমানুষ, এ কথাটা আমি ভুলতে পারি না। এমনিতে শান্তনুদাকে আমি ভয় করি। কাজকর্মের ব্যাপারে, কোথায় কখন কী ভুল করে ফেলি, তা হলেই হাঁকাহাঁকি। তা ছাড়াও আমি শান্তনুদাকে ভয় করি। কখনো কখনো, কোন কোন মুহূর্তে, আমি যেন কী দেখেছি শান্তনুদার চোখে।

সেটা যে ঠিক কী, আমি যেন তেমন বুঝিয়ে বলতে পারি না। শান্তনুদার এক একটা সময় আসে, এক একটা মুহূর্ত, তখন ও হাঁক-ডাক করতে ভুলে যায়, দাপাদাপি করতে ভুলে যায়। সব থেকে মারাত্মক, ওর মুখে তখন কথা ফোটে না। হঠাৎ যেন লোকটা বদলে যায়। তখন ওর চোখের দৃষ্টি থেকে, নিজেকে সরিয়ে নিয়ে, ছুটে চলে যেতে ইচ্ছা করে। শান্তনুকে তখন একেবারে চেনা যায় না। একলা একলা এমন মুহূর্ত, কখনো কখনো আমার জীবনে এসেছে। কথাটা এভাবে বললে বোধহয় ভাল হয়, তখন বাঘ নিজেই যেন অপরের শিকার হয়ে পড়েছে। সে যেন সেই যে কথাটা কী বলে, ওসব ব্যাপার ট্যাপার বুঝি না, হিপনোটিজম্, ও তখন যেন হিপনোটাইজড্ হয়ে যায়। আর তখন অনেক কথা আমার মনে পড়ে যায়। আর একই সঙ্গে, তখন ওই অলকের চোখের দিকে চেয়ে যেমন মনে হয়, ওর হাত ছুটো আমার বুকে ঘুরছে, ও যেন আমাকে জড়িয়ে ধরে শুষছে কামড়াচ্ছে, সেইরকম মনে হয়। আমার ভাল লাগে না। আমার রাগ হয়, ভয়ও হয়। ওরকম অবস্থায়, আমি চলে যাবারই চেষ্টা করি।

তবে, এমন ঘটনা, এত কম, মনে করে রাখবার মত না। কিন্তু সময়ে সময়ে মনে পড়ে যায় বৈকি। যেমন এখন মনে পড়ে যাচ্ছে। পুরুষমানুষকে ভুল বোঝাবার কোন কারণ নেই আমার। বিশেষ করে আমার। আমি বুঝি, আমি কে, আমার সম্পর্কে লোকে কী ভাবে! তা বলে, সমস্ত পুরুষমানুষ সম্পর্কেই কি আমি এক

কথা ভাবতে পারি। আমি কি অন্য রকমের পুরুষও দেখি নি, যাদের আমার সম্পর্কে, কোন উৎসাহই নেই। যারা আমার দিকে ভাল করে চেয়েও দেখে না। অবিশ্যি, তেমন পুরুষের সংখ্যা কম, দেখেছি অনেক কম। কেউ হয়তো, আত্মমর্যাদার জন্য মুখ ঘুরিয়ে রেখেছে, কেউ না-দেখার ভান করেছে। কারো কারোর স্বভাবেই আছে, পেটে খিদে, মুখে লাজ। দেখবার ইচ্ছা খুব, অথচ চোখ তুলে তাকাতে পারে না। এদের আমার একটুও ভাল লাগে না। এদের কথা আমি বলছি না। এমন মানুষও আছে, আমাকে নিয়ে যার কোন উৎসাহই নেই।

আমি ভাবি, বিশেষ করে, আমার চারপাশের পরিবেশের কথা। আমাকে যাদের সংস্পর্শে, নিয়মিত আসতে হয়, তাদের ভুল বোঝবার কোন কারণ নেই আমার। শান্তনুদাকেও আমি বুঝি। শান্তনুদার মধ্যে একটা অহংকার আছে। আমার মনে হয়, একটা অহংকার এই যে, আমি শান্তনু গাঙ্গুলী আমিই, আমি আমিই আছি, এখন তোমার বিবেচনা, তুমি শান্তনু গাঙ্গুলীকে কী ভাবে নেবে। যেটাকে লোকে কথায় বলে, 'ইট ইজ আপ টু ইউ।' অবিশ্যি আমার এ ধারণা ভুলও হতে পারে। তবে, 'সেইরকম কয়েকটি মুহূর্ত' ছাড়া, ওর সম্পর্কে আমার এ-রকম ধারণা।

আমি একটু সরে গিয়ে, শান্তনুদার খাবারের জন্য, গাড়ির মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে দিলাম। শান্তনুদার হাতটা আমার কাঁধ থেকে খসে পড়ল। আমি নতুন প্লেটে, শান্তনুদাকে আবার খাবার বেড়ে দিতে দিতে, চট করে একবার উশীনরকে দেখে নিলাম। উশীনর এখনো বাইরের দিকেই চেয়ে আছে। এদিকে, বা আমার আর শান্তনুদা, কারোর দিকেই যেন ওর নজর নেই। এটা যেন আমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। যদিও, না বিশ্বাস করবার কী কারণ থাকতে পারে। এটা আবার আমার নিজের ছকের ভাবনা হতে পারে। আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, 'উশীনরবাবু, সত্যি আপনার আর খাবার লাগবে না?'

উশীনর হেসে বলল, ‘এই নিয়ে, এ কথাটা আপনি আমাকে তিনবার জিজ্ঞেস করলেন।’

ও বাবা, ভদ্রলোক চটেছে মনে হচ্ছে। কী জন্য, কোন কারণে? সিগারেটের ব্যাপারে, নাকি, অলক আর শান্তনুকে হিংসা করে, আমার ওপর রাগ করে? অথবা কী জানি, এদের মতিগতি আবার কেমন। হয়তো, নিতান্ত ভদ্রতার খাতিরেই, আমার সঙ্গে, একটু ঘনিষ্ঠভাবে কথাবার্তা বলছিল? আসলে, আমাকে ভাল লাগে নি। অর্থাৎ, এমনি আলাপ-পরিচয় করতে ভাল লাগার কথা ভাবছি। কিন্তু চটেছে, না কোন কারণে গম্ভীর আর চিন্তিত হয়ে রয়েছে?

যাই হোক, সেটা পরে জানা যাবে; আমি বললাম, ‘না, খুব কম খেলেন তো, তাই বারে বারে জিজ্ঞেস করছি। রাগ করলেন?’

‘না না।’ হেসে এমন ভাবে বলল, যেন, পাছে আমি ভুল বুঝি, সেই উদ্বেগে। অথচ ভঙ্গিটা সত্যি বলে মনে হল না। আমি শান্তনুদাকে খাবার দিলাম। শান্তনুদা বলল, ‘এবার তোমার খাবার নিয়ে নাও।’

সে কথা বললেও নেব, না বললেও নেব। তবে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেতে, আমার আর ভাল লাগছে না। আমি ঘুরে গিয়ে, ড্রাইভারের সীটে বসলাম, কারণ শান্তনুদার বসবার জায়গা অবধি, প্যাকেট ছড়িয়ে পড়েছে। উশীনর সঙ্গে সঙ্গে নেমে গেল। কী হল আবার, আমার কোন অপরাধ হল নাকি! আমি একবার চোখ ঘুরিয়ে দেখলাম, যাতে উশীনর না দেখতে পায়। দেখলাম, উশীনর কাগজের প্লেটটা রাস্তার এক পাশে গিয়ে ফেলে এল। ওর হাতে বীয়র খাওয়া গেলাসটাই রয়েছে। গাড়ির সামনে এসে, সিলভার জাগ থেকে জল ঢেলে নিয়ে খেল। তারপরে হাঁটতে হাঁটতে ব্রিজের দিকে চলে গেল।

আমি খাবার নিতে নিতে, শান্তনুদার দিকে তাকালাম। শান্তনুদা উশীনরের যাওয়ার দিকেই চেয়ে রয়েছে। যদিও মুখ ভরতি খাবার

চিবিয়ে চলেছে। দেখে মনে হচ্ছে, এখন শান্তনুদারও কেমন টলমল ভাব। বলল, 'উশীনরের মুড এসে গেছে।'

শান্তনুদাকে দেখে, এমনিতেই আমার হাসি পাচ্ছিল। রাস্তার ধারে, প্রায় অন্ধকারে দাঁড়িয়ে, গাল ফুলিয়ে খাচ্ছে। চোখগুলো লাল। পুরোপুরি সেন্স যে আছে, তা মনে হয় না। তার ওপরে উশীনরের বিষয়ে, এরকম একটা গম্ভীর মন্তব্য। কথাটা যদি শান্তনুদা ঠাট্টা করে বলত, তা হলে একটা কথা ছিল। কিন্তু শান্তনুদাকে সীরিয়স্ মনে হচ্ছে।

আমি খেতে খেতে, অলকের দিকে তাকালাম, আর ফ্রায়েড রাইস্ প্রায় আটকে যাবার মত হল, আমার গলায়। লোকটাকে এখন কী রকম নিরীহ লাগছে, আর মনে হচ্ছে, একটা মড়ার মত পড়ে আছে। লোকটা এখন আমার মনিব। এর কথা ভাবতে ভাবতেই, পুরুষদের সম্পর্কে এত কথা আমাকে ভাবতে হয়েছে। অলক কি নিজের মনের ভাব, একটু চেপে চলতে পারে না? সব ব্যাপারেই সে ভাল। টাকা অ্যাডভান্স চাইলে পাওয়া যায়, পান-ভোজনে খরচ করতে কোন আপত্তি নেই, নিজের বিজনেস বাঁচিয়ে যদি হাতে সময় থাকে, তা হলে গাড়িতে করে অনেক দূর বেড়াতে নিয়ে যেতে পারে। তার জন্য যে, কোনরকম বড়লোকি দেমাক আছে, তাও নেই। কিন্তু সব গোলমাল এক জাগায়। যে ওর সঙ্গে রয়েছে, তার ভাল মন্দের কোন কথা, ওর মাথায় আসে না। তার যে মন বলে একটা পদার্থ আছে, তার যে ভাল লাগা মন্দ লাগা আছে, এ কথা ও চিন্তাই করে না।

আমার তো মনে হয়, লোকে যদি বেশ্যাবাড়ি যায়, (আমাকে লোকে কি ভাবে? এই অলকই বা কী ভাবে?) বেশ্যারও মনটা একটু জানা দরকার। যদি মন জানার ধৈর্য না থাকে, নিদেন, তার ইচ্ছা-অনিচ্ছাটাও জানা দরকার।

অলক যাকে পছন্দ করে না, যাকে ওর ভাল লাগে না, এরকম কোন মেয়ে যদি ওর পাশে বসে, ওর হাত ধরতে চায়, ওকে জড়িয়ে

ধরতে চায়, ওকে চুমো খাবার চেষ্টা করে, তাহলে কী করবে? ওর যা চরিত্র, আমার তো মনে হয়, এক থাপ্পড় কষিয়ে দেবে। অথবা, যা তা গালাগাল দেবে। ও কি কোনদিন ভেবে দেখেছে, একটা মেয়েরও ঠিক সেই রকম মনে হতে পারে? একটা মেয়েরও ঠিক তেমনি, ওর গালে থাপ্পড় মারতে ইচ্ছা করতে পারে?

ভেবে আমার হাসি পায়। এটা অলক বলে না, কোন পুরুষই বোধহয়, এরকম চিন্তা করতে পারে না। কারণ, তারা পুরুষ। আমার এরকম ভাবতে বেশ মজা লাগে, (খাবারগুলো একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। চীনে খাবার ঠাণ্ডা হয়ে গেলে, খেতে খুব বাজে লাগে।) একজন মহিলা, তার চেহারা ভাল না, বয়স হয়ে গিয়েছে, কোন ছেলেরই আর তাকে ভাল লাগে না, শুধু ছেলে কেন, কোন পুরুষেরই ভাল লাগে না, কিন্তু তার অর্থ বিত্ত বাড়ি গাড়ি সম্পত্তি আর পোজিশন আছে। সে, যেদিন যাকে ভাল লাগে, এরকম ছেলেদের ডেকে, যা খুশি করবে। ছেলেটাকে তার যা ইচ্ছা তা-ই করবে। তাকে কেউ কিছু বলতে পারবে না। বেশ স্বাস্থ্যবান সুন্দর ছেলেরা, তাকে খুশি করবে। মনে মনে যতই রাগ হোক, ঘৃণা হোক, তবু কিছু বলার উপায় নেই।

অবিশ্যি, আমি এবকম কিছু কিছু মহিলাব কথা শুনেছি। এই কলকাতার বুকেই তারা বাস করে। একজন প্রাক্তন অভিনেত্রীকে জানি, যার এখন বেশ বয়স হয়ে গিয়েছে, নিজের মেয়েও অনেক বড় হয়ে গিয়েছে, তার ছেলে-মেয়ে হয়ে গিয়েছে, তার অনেক বয়ফ্রেণ্ড আছে। যুবক ছেলেরা তার বন্ধু। তাদের সে গাড়িতে নিয়ে বেড়াতে যায়, হোটেলে খাওয়াতে নিয়ে যায়, তারা কেউ না কেউ, সব সময়ে তার সঙ্গে থাকে, এমন কি তার ঘর-সংসারেরও দেখাশোনা করে। শুধু এই কারণেই, মা মেয়ের সঙ্গে, কোন বনিবনা নেই, কেউ কারোর মুখ দেখে না। মহিলাকে আমি দেখেছি। বাঁধানো দাঁত, চুলে রং মাখেন শুনেছি, কিন্তু ববড্ চুল, মুখে প্রচুর রং মাখেন, খুব সাজগোজ করেন। এরকম, আরো, অনেক নাম-করা মহিলার কথা

আমি শুনেছি, সমাজে যাদের বিশেষ প্রতিপত্তি আছে।

মনে করছি বটে, ভাবতে বেশ মজা লাগে। কিন্তু সত্যি কি মজা লাগে! লাগে না, কেমন যেন খারাপই লাগে, পারভারশন বলে মনে হয়। সেই সব যুবকদের জন্য আমার মায়া হয়। কেবল মাত্র অর্থ, উঁচু পরিবেশ এবং ভোগের জন্য, দিনের পর দিন একজন বয়স্কা মহিলার মনোরঞ্জন করে যাওয়া। এরকম ক্ষেত্রে, মহিলা পুরুষ সমান। তাদের স্বাধীনতা আছে, কারোকে পরোয়া নেই, অর্থ বিত্ত প্রতিপত্তি, সব কিছু তার সহায় করে দিয়েছে। তারা জীবনকে জোর করে, অন্যায়ভাবে ভোগ করে যাবে।

তাহলে মোট ব্যাপারটা কী দাঁড়াল? কাকে দায়ী করা যায় এ জন্য? এ-রকম একটা জঘন্য ব্যবস্থা, টাকা থাকলেই যা ইচ্ছা খুশি করা যায়। এদের টাকা ছিনিয়ে নেওয়া উচিত, এদের কোন স্বাধীনতা থাকা উচিত না, আর দশ জনের মতই এদের করে দেওয়া উচিত। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ আমার হাসি পেয়ে গেল। টাকা-পয়সা যাদের আছে, আর তার জন্যই যারা এ ব্যাপারে যা খুশি তা করে, ঘটনাটা কি তা-ই? যাদের টাকা-পয়সা নেই, সাধারণ মানুষ, তাদের মধ্যেও কি, এরকম প্রবৃত্তি আমি দেখিনি? হয়তো তাদের সাধ্যে কুলায় না, উপায় নেই।

আশ্চর্য, শান্তনুদা কী যেন বিড়বিড় করে বকছে, আর কাগজের প্লেটের ওপরে এখনো চামচ নেড়ে যাচ্ছে। সব খাবার খাওয়া হয়ে গিয়েছে, প্লেটে আর কিছুই নেই। অদ্ভুত লাগছে শান্তনুদাকে। শক্ত মজবুত চেহারা। প্যান্ট-শার্ট পরা, মাথার চুলগুলো বাতাসে উড়ছে। কি বিড়বিড় করছে, কে জানে। আমার ভয় লাগে, ভয় লাগার কিছু কারণ আছে। শান্তনুদার পিছনে, এমন দু-একটা ঘটনা আছে, যেগুলো আমাকে ভয় দেখায়। দেখলাম, কাগজের প্লেটটা দূরে উঁচু করে ছুঁড়ে দিল। সেটা বাতাসে খানিকটা উড়ে গিয়ে, দূরে পড়ল। তারপরে গাড়ির ভিতরে তাকাল। আমি যে ড্রাইভারের জায়গায় বসে আছি, সেটা প্রথমে ওর চোখে পড়ল না। বুঝতে পারছি, শান্তনুদার দৃষ্টি ঠিক নেই, হয়তো এখন একটু

ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। যে পরিমাণ কাঁচা রাম খেয়েছে! পেটে অনেক খাবার পড়ে, চোখে হয়তো ঘুমও আসতে পারে।

শান্তনুদা আমাকে দেখতে পেল। সিলভার জাগের নলের মুখ খুলে, জাগ তুলে, গলায় জল ঢালল। শান্তনুদার সবই তুলে গলায় ঢালা। গেলাস-টেলাসের প্রয়োজন নেই। পকেট থেকে সিগারেট বের করে ধরাল, তারপরে আস্তে আস্তে আমার দিকে এগিয়ে এল। দরজাটা আমি বন্ধ রেখেছিলাম। দরজার কাছে এসে, জানালার ওপর কনুইয়ের ভর রেখে, আমার দিকে ঝুঁকে তাকাল। আমি খাওয়াতে ব্যস্ত থাকতে চেষ্টা করলাম। যদিও, খিদের ঝোঁকে, প্রথম কয়েক চামচ মুখে দিয়েই, আমার আর খেতে ভাল লাগছে না। ফ্রায়েড চিকেনগুলো শুকিয়ে চামড়ার মত লাগছে এখন। চিকেন চাউ-চাউটা তবু একটু ভাল লাগছে, তা-ই একটু একটু খাচ্ছি। কিন্তু এখন আর খেতে পারছি না। শান্তনুদা ঝুঁকে পড়ে, তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। আমি বেশ বুঝতে পারছি, আমাকে দেখছে। আমাকে শান্তনুদা জীবনে বহুবার দেখেছে। কিন্তু ড্রিংক করে, মাঝরাত্রে, বম্বে রোডে, গাড়িতে কোনদিন দেখে নি। ড্রাইভারকে আমি দেখতে পাচ্ছি, সে রাস্তার অন্য ধারে, আমাদের দিকে পিছন ফিরে খাচ্ছে, আর একজন শিখ লরি-ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলছে। দূরে, রাস্তার নীচে, কয়েকটা দোকানে কিছু লোক, টিমটিম করে কেরোসিনের আলো জ্বলছে। তাদের স্পষ্ট দেখা যায় না, কথা শোনা যায় না। আমাদের গাড়ির সামনের দিকেই, একটা ত্রিপল-ঢাকা লোডেড্ লরি দাঁড়িয়ে আছে।

উশীনর কোথায় গেল? অলকের তো মদের নেশার ঘুম, এখন কিছুতেই কাটবে না। আমি যে ঠিক ভয় পাচ্ছি, তা না। শান্তনুদাকে আমি ভয় পাই বটে, তবে এখন সে ধরনের কোন ভয় আমার লাগছে না। অস্বস্তি বোধ করছি। আর তা কাটাবার জন্য, আমাকেই ফিরে তাকিয়ে কিছু বলতে হবে। ঠিক এসময়েই, শান্তনুদা জিজ্ঞেস করল, 'খাচ্ছ?'

খুব খারাপ এ ধরনের প্রশ্ন, যার মাথা-মুণ্ডু নেই, এ সময়ে এরকম প্রশ্ন করার মানেই, শান্তনুদার মাথায় অন্য কিছু ঘুরছে। তবু আমি বললাম, 'হ্যাঁ, হয়ে গেছে খাওয়া।'

শান্তনুদার তাতে জানালা থেকে সরবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। বলল, 'উশীনর লোকটা বেশ ভাল, আমার খুব ভাল লাগে।'

হঠাৎ এ কথার মানে কী, আমি বুঝতে পারলাম না। কিন্তু আমি শান্তনুদার দিকে ফিরে তাকালাম না, কোন জবাবও দিলাম না। উশীনর ভাল লোক, ওর খুব ভাল লাগে, সে-কথা আমাকে শোনাবার, এখন কী দরকার হল। আমাকে কী পরীক্ষা করা হচ্ছে? কারণ আমি উশীনরের সঙ্গে হেসে হেসে গল্প করছিলাম, তাকে আমার পাশে ডেকে বসিয়েছি, তার কাছ থেকে সিগারেট খেয়েছি, তার মানে, আমি উশীনরের প্রেমে পড়ে গিয়েছি কী না, শান্তনুদা কি তারই খোঁজ করছে। আমার তো মনে হয়েছে, এমনি সাধারণ ভাবে, উশীনর অত্যন্ত ভদ্রলোক। যাকে বলে, সোবার, তা-ই। সে যে একজন নাট্যকার, এত যে তার নাম, তার জন্য কোনরকম দেমাক বা চাল নেই একটুও। যথেষ্ট বিনয় আছে, ম্যানার্স জানে, আর সব থেকে যেটা বেশি জানে, অন্ততঃ কলকাতা থেকে এ পর্যন্ত যা দেখলাম, একজন নতুন পরিচিত মেয়ের সঙ্গে, যথেষ্ট ভদ্র ব্যবহার করতে জানে।

অবিশ্যি, উশীনরকে আমি আর কতটুকু জানি। জীবনে এই প্রথম তাকে দেখলাম, আগে তার ছবি দেখেছি কাগজে, তার জীবন সম্পর্কে স্কেচ্ জাতীয় লেখা পড়েছি। তাকে দেখে, কাছে পেয়ে খুব খুশী হয়েছি। আমার মনে হয়েছে, আমাকে দেখে তার ভাল লেগেছে, তাতে আমি আরো খুশী হয়েছি, তাকেও আমার ভাল লেগেছে, সে কথা আমি তাকে প্রতি পদে পদে বুঝতে দিয়েছি। আমার চোখের দৃষ্টিতে, আমার হাসি দিয়ে। তার চোখের দিকে চেয়েও, আমি সেটা বুঝতে পেরেছি। তাছাড়া, আর একটা জিনিস, আমাদের দুজনের হাসিগুলো একই কারণে ঘটছিল, একই কারণে আমরা দুজনের সঙ্গে চোখাচোখি করছিলাম। এক এক সময় এরকম হয়, যে

কারণে আমার হাসি পাচ্ছে, আর একজনের ঠিক সেই কারণেই হাসি পায়। অথচ বাকী লোকেরা সেই কারণটা ধরতে পারে না, হাসে না, হাসির কারণও বুঝতে পারে না। তাতে এইটুকু বোঝা যাচ্ছিল, আমরা দুজনে, নিজেদের বুঝতে পারি। তার পাশে বসে, আমি বেশ নিরাপদ-নিরাপদ বলার কোন মানে হয় না, আমি ঠিক তা ভাবতেও চাই নি, তার পাশে বসে বসে, আমি বেশ সহজ ছিলাম। তার ব্যবহার কথাবার্তা থেকেই বোঝা যাচ্ছিল, পাশে বসে কোন রকমেই বিরক্ত হবার কোন কারণ নেই।

উশীনর আমাকে কী চোখে দেখছে, আমি এখনো সঠিক জানি না। তবে, আমাকে তার খারাপ লাগছে না, এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। অলক বা শান্তনুদা যদি আমার পাশে বসত, আর ড্রিংক করত, তা হলে, আমার কী অবস্থা হতো, আমি ঠিক বলতে পারি না। না, শান্তনুদার কথা ঠিক বলতে পারি না। অলকের কথা ঠিকই বলতে পারি। অলক আমাকে জ্বালাতন করবার চেষ্টা করত। করতই। কলকাতার বার-রেস্তোরাঁ না, তার গাড়িতে, কলকাতার বাইরে আমরা চলেছি। অলককে আমি বুঝতে পেরেছি। অলক ধরেই নিয়েছে, আমি কী টাইপের মেয়ে, অতএব ওর যা ইচ্ছা, আমাকে তাই করত। অবিশ্যি, আমি বলে না, যে-কোন মেয়ে থাকলেই, অলক একই কাজ করত।

উশীনরের বিষয়ে, আমি সে-কথা বলতে পারি না। আমি বরং উশীনরকে বোঝবার জন্য, ইচ্ছা করেই, ওর সঙ্গে, গায়ে গা ঠেকিয়ে বসেছিলাম। উশীনর নিজের থেকে, আমার গা ঘেঁষে বসতে আসে নি। ও যেখানে বসেছিল, সেখানেই ছিল। কিন্তু কোমরে কোমরে ঠেকিয়ে বসেও, আরো ঘন হয়ে বসার কোন লক্ষণই, উশীনর দেখায় নি। দু' একবার, অলক আর শান্তনুদার কথায় হাসতে হাসতে, আমি উশীনরের দিকে ঢলে পড়েছি। সে সুযোগ যদি উশীনর নিত, তা হলে আমার বুকে গায়ে তার হাত ঠেকে যাওয়া, কিছুমাত্র আশ্চর্য ছিল না। কিন্তু উশীনর, সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে নিয়ে, সীটের পিছন

দিকে সরে গিয়েছে। তারপরে যদি উশীনর আমার কাঁধে বা কোলের ওপর, এক-আধবার একটু হাত রাখত, আমার কিছুমাত্র মনে করবার ছিল না।

আমি প্রথম দিকে ইচ্ছা করেই, উশীনরকে একটু বোঝবার জন্য, তার কাছাকাছি হয়েছিলাম। সত্যি বলতে কি, আমার মাথায় তখন এ চিন্তাটা এসেছিল, সারা রাত্রি যার সঙ্গে যাব, দেখি আসলে, ঘোঘটাকে তাড়িয়ে বাঘটাকে নিয়ে এলাম কী না। কিন্তু আমি নিশ্চিন্ত হয়েছি। আমি জানি, অলক হলে, কখনোই আমাকে সিগারেট অফার করত না। শান্তনুদার কথা তো আসেই না। শান্তনুদা জানে, আমি মাঝে-মধ্যে সিগারেট খাই, কিন্তু ও কখনো আমাকে দেয় নি। কারণ, শান্তনুদার চরিত্রের মধ্যে ওটা নেই। তা বলে অলক কি আমাকে কোনদিন সিগারেট অফার করতে পারত না? সত্যি বলতে কি, সিগারেট খেতে আমি ভালই বাসি। উশানর যখন ওর ফিলটার-টিপড্ সিগারেটের সুন্দর সোনালী প্যাকেটটা বের করল, তখন আমি ঠোঁট বাঁকিয়ে মনে মনে বলেছিলাম, 'লোকটা নিশ্চয় আমাকে অফার করবে না।'

কিন্তু উশীনর এ সব বিষয়ে ভুল করে না। ও অবিশ্যি একটু দ্বিধার সঙ্গেই, প্যাকেট বাড়িয়ে আমাকে অফার করেছিল। আমি খুব খুশী হয়ে তুলে নিয়েছিলাম। ওর হাতে বীয়রের গেলাস ছিল বলে ওকেও ঠোঁটে গুঁজে দিয়েছিলাম। সে সময়ে অলক কী রকম হাঁ করে, অবাক হয়ে দেখছিল। একটি বুদ্ধু। নিশ্চয় ভাবছিল, আমার মত খারাপ মেয়ে আর হয় না। সে কথা অবিশ্যি ও প্রথম থেকেই আমার বিষয়ে ভেবে আসছে। আমার বিষয়ে, অধিকাংশ লোকই তা ভাবে।

দ্বিতীয়বার যখন উশীনর সিগারেট অফার করেছিল, তখন আর আমার ঠিক খাবার ইচ্ছা ছিল না, সেইজন্য ওর মুখে কোন সিগারেট না দিয়ে, আমারটা ধরিয়ে, ওকে দিতে চেয়েছিলাম। ও প্রথমটা নিতে চায় নি। আমি অবিশ্যি, খুব স্বাভাবিক ভাবেই দিতে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম আমার মুখের সিগারেট খেতে ওর কোন

আপত্তি হবে না। এমন অনেকেই তো দেখেছি, আমার মুখের সিগারেট খেয়ে যেন বর্তে গিয়েছে। আমার মনে একটু লেগেছিল বৈকি। তবে, সে লাগাটা আমারই দোষ। উশীনরের সঙ্গে আমার কতটুকু পরিচয়, কেনই বা সে আমার মুখের সিগারেট খাবে। আমার বোঝা উচিত ছিল, উশীনর কে, উশীনর কী ওজনের মানুষ, কাকে আমি আমার মুখের সিগারেট দিতে যাচ্ছি। অবিশ্যি উশীনর প্রথমটা ভাব করেছিল যেন, অলকের জন্য ওর লজ্জা করছে। অলক আবার ওকে উৎসাহ দিয়েছিল। আমি তখন সিগারেট ফিরিয়ে নিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু উশীনর তা নিতে দেয় নি। ও আমার হাত থেকে সিগারেট নিয়েছিল।

সত্যি বলতে কি, আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। মনটা যে কারণে একটু খারাপ হয়ে যাছিল, সেই কারণেই এত খুশি হয়েছিলাম, আমি যা কখনোই করব না ভেবেছিলাম, বিশেষ করে, এই গাড়িতে, এই জার্নিতে, আমি গান গেয়ে উঠেছিলাম। আমি আমার বাঁ পা, এতদূর সরিয়েছিলাম, যাতে উশীনরের পায়ের সঙ্গে ঠেকে। 'তুমি মোর পাও নাই পরিচয়' গানটা যে সে মুহূর্তে, আমি বিশেষ কিছু ভেবে গেয়েছিলাম, তা না। আমার মুখ দিয়ে আপনিই বেরিয়ে এসেছিল। আমার মনে ছিল, উশীনর গান শুনতে চাইছিল, আমি সেইজন্যই গেয়েছিলাম।

কিন্তু আশ্চর্য, আমি দেখছিলাম, উশীনর সিগারেটটা একবারও মুখে তুলছে না। সে গানটা আমি শেষ করেছিলাম। আমার ভিতরে তখন কেমন একটা অপমান বাজছিল, রাগ হচ্ছিল মনে মনে। কী ভেবেছে উশীনর, আমি কি ওকে সিগারেটটা ধরে রাখবার জন্য দিয়েছি? আমার গান শেষ হয়ে গেলে, আবার আমি ওর হাত থেকে সিগারেট নিয়ে খাব? তাই আমি ওর হাত থেকে সিগারেটটা নিয়ে, অ্যাশ্‌ট্রে-তে গুঁজে দিয়েছিলাম। কিন্তু মুখের ভাব, এমন করি নি, যাতে আমার মনের কথা ধরা পড়ে। যেন স্বাভাবিক ভাবে হেসে তাকিয়ে বোঝাতে চেয়েছিলাম, 'বললেই তো পারতেন।'

কেন, আমার মুখের সিগারেটে কি উশীনরের ঘৃণা? নাকি মান-সম্মানের ভয়? এ গাড়িতে এদের সামনে এমন কি মান-সম্মানের ভয় থাকতে পারে? এদের কি উশীনর চেনে না বোঝে না? এরা তো ওকে বন্ধু বলেই মনে করে। যাই হোক গে, অভিনয় আমাকে একটা জিনিস থেকে বাঁচিয়েছে, নিজেকে আমি ধরা পড়তে দিই না। আমি আবার গান গেয়ে উঠেছিলাম। 'আমার প্রাণের মাঝে সুধা আছে, চাও কী'—জানি না, সে গান শুনে আবার উশীনর কী ভেবেছিল। আসলে আমি দ্রুত লয়ে একটা গান গাইতে চাইছিলাম, যাতে বোঝানো যায়, আমি কিছুই মনে করি নি। গানটা আমি জানালার দিকে তাকিয়ে করেছিলাম, আর খুব আস্তে আস্তে, উশীনরের পায়ের কাছ থেকে পা সরিয়ে নিয়ে এসেছিলাম, একটু একটু করে, খানিকটা সরে এসেছিলাম।

তারপর থেকে উশীনর আর একটি কথাও বলে নি। চার গেলাস বীয়র আমিও খেয়েছি, কিন্তু মাতাল হই নি। খেতে আমার ভালই লাগছিল। বিশেষ করে, উশীনরও যখন দেখলাম, হার্ড ড্রিংকসের দিকে গেল না, বীয়র খেতে চাইল, তাতে আমার আরো ভাল লেগেছিল। তবু যে বার বার আপত্তি করেছিলাম, তাও তো উশীনরের জন্যই। কারণ উশীনর ভাববে, একটা পাঁড় মাতাল মেয়ের সঙ্গে ও যাচ্ছে। প্রথমেই একজন নতুন আলাপী লোকের সামনে, বিশেষ করে একজন বিখ্যাত নাট্যকারের সামনে ড্রিংক করব, এতটা স্পোর্টিং আমি নই। তা ছাড়া, আমি চাইছিলাম, উশীনরও আমাকে খেতে বলুক। ও বলেছে, তেমন জোর দিয়ে বলে নি। আরো বেশী আপত্তি করেছিলাম দুটো কারণে, হয় উশীনর আমাকে খাবার জন্য, আরো জোর করুক, না হয় অলক-শান্তনুদাকে ধমক দিয়ে থামিয়ে দিক। কিন্তু কোনটাই উশীনর করে নি। যে কারণে শেষ গেলাসটা আমি প্রায় এক চুমুকেই শেষ করতে চেয়েছিলাম। সেটা শান্তনুদার ওপরে রাগ করে না, উশীনরের নির্বিকার হাসি-হাসি ভাবকে ধাক্কা দেবার জন্য।

কিন্তু তখনো উশীনর মুখে কিছু বলে নি, কেবল আমার দিকে তাকিয়েছিল। আমি তখন ওর মুখের দিকে তাকাই নি, একটু পরে তাকিয়েছিলাম, দেখেছিলাম—দেখেছিলাম—জানি না, সত্যি তাই দেখেছিলাম কী না, ওর চোখে যেন কষ্টের ভাব, একটা অনুরোধ মেশানো কষ্টের ভাব। তারপরে, সেই গানের পর থেকে, উশীনর আর একটা কথাও বলে নি। কেন? কী হয়েছে উশীনরের? নিশ্চয় আমি কোন দোষ করি নি? আমি মনে মনে এত অবাক হয়েছি, অলকের মত লোক আমার গান শুনে বাহবা করে উঠল, শান্তনুদা আবার গাইতে বলল, অথচ উশীনর আমাকে একটা কথাও বলল না! আমার মুখের সিগারেটটা দিয়ে কি এতই অন্যায় করেছি? নাকি ওর হাত থেকে সিগারেট নিয়ে, অ্যাশ্‌ট্রে-তে গুঁজে দেওয়া আমার অপরাধ হয়েছে? খাবেই না যখন, তখন আর ঢঙ করে লক্ষ্মণের ফলের মত হাতে ধরে রেখে লাভটা কী।

কিন্তু উশীনর গম্ভীর কেন? আমি সরে বসেছিলাম বলে, ওর রাগ হয়েছে? নাকি, সিগারেটটা হাত থেকে নিয়েও, না খাওয়ায়, মনে মনে অপরাধ ভেবে এখন গম্ভীর থেকে, উলটো চাপ দিতে চাচ্ছে। যে কারণে, আমি তখন ভাবছিলাম, এটা একটা চালাকির খেলা। উশীনরকে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয়, হয়তো উশীনর ভীষণ চতুর, দারুণ চালাক, ওর প্রত্যেকটি স্টেপ খুবই ভেবে ভেবে ফেলা। সেই সুন্দরবনের বাঘের মত দূর থেকে চক্র দিতে দিতে, হঠাৎ এক সময়ে ঘাড়ের ওপর এসে পড়বে। অবিশ্যি, ওকে এতটা শঠ শয়তান ভাবতে আমার খারাপ লাগছে। আবার তাই বা বলি কেমন করে। মেয়ে পুরুষের একটা খেলা তো, এ রকমই হয়। প্রথমে একটা এই ধরনের দূর থেকে নিঃশব্দ খেলা, তারপরে নিষ্পত্তি। সেটা আবার এক ধরনের পেশাদার এক্সপার্ট প্রেমিকের মত আমার মনে হয়। অথবা উশীনর অন্য জগতের লোক, ও ওর নিজের চিন্তাতেই বিভোর।

কিন্তু তাই বা হবে কেমন করে। প্রথম থেকে তো উশীনর এরকম

ছিল না। যাকে বলে, চার্মিং পার্সোন্যালিটি, সেইটাই যেন দেখেছিলাম। নিরহঙ্কার, মিষ্টি হাসি। মন দিয়ে হাসতে হাসতে আমার গল্প শুনেছে, সত্যি মিথ্যা যা-ই বলে থাকি। আমার মাথার চুল উড়ে যাচ্ছিল বলে, তাড়াতাড়ি জানালার কাঁচ তুলে দিয়েছে। সব দিক দিয়েই ওকে বেশ ভাল বলতে হবে। এখন ওর কী হয়েছে, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

'তোমার কেমন লাগল ওকে, উশীনরকে?'

শান্তনুদার মোটা নীচু গলা আবার শোনা গেল। আসলে এ কথাটাই জানতে চায় শান্তনুদা। কিন্তু হঠাৎ আমার ভাল-লাগা মন্দ-লাগার বিষয়ে খোঁজ কেন? তাতে শান্তনুদার কী লাভ? বললাম, 'এমনিতে তো বেশ ভাল লোক বলেই মনে হচ্ছে।'

মোটা নীচু গলায় শান্তনুদা বলল, 'শুধু বেশ ভাল বলছ ময়না। আমার তো মনে হচ্ছে, তোমার যেন রঙ লেগে গেছে।'

শান্তনুদা আমার ডাক-নাম ধরে কথা বলছে। বলতেই পারে। কারণ আমাকে ডাক-নাম ধরেই ও ডাকাডাকি করে অধিকাংশ সময়। কিন্তু আমার হাসি পেল ওর কথা শুনে। হেসে বললাম, 'কী রঙ দেখতে পেলেন?'

শান্তনুদা আমার কথার জবাব না দিয়ে বলল, 'এতে অবাক হবার কিছু নেই, হি ইজ সুইট অ্যাণ্ড সোবার, আমাদের মত চোয়াড়ে নয়।'

আমাদের বলতে শান্তনুদা বোধহয়, ওর আর অলকের কথাই বলছে। কথাটা একেবারে মিথ্যে না। কিন্তু এ বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই। শান্তনুদা যেন নিজের মনেই বলে চলেছে 'উশীনর ইজ এ জীনিয়াস, সন্দেহ নেই। ওর নাটক পড়ে, ওকে আমার মডার্ন সেক্সপীয়র বলে মনে হয়। উশীনর যে কেন নাটকে অভিনয় করে না, আমি জানি না। চেহারাটা সুন্দর, গলার স্বর ভরাট।'

এসব কথা আমাকে শোনাবার কী আছে, বুঝতে পারছি না।

উশীনর মডার্ন সেক্সপীয়র কী না জানি না, কারণ আমি অত শত বুঝি না। উশীনর একজন প্রথম শ্রেণীর নাট্যকার। তার নাম লোকের মুখে মুখে, কাগজের পাতায় পাতায়। কিন্তু সে কেন অভিনয় করবে, তা আবার আমি বুঝি না। যাদের চেহারা ভাল, গলায় স্বর ভরাট, তারা, সবাই কি অভিনয় করে? অবিশ্যি, উশীনরের কথা আলাদা, সে নিজে একজন নাট্যকার। শুনেছি, সেক্সপীয়র নিজে অভিনয় করতেন। কিন্তু শান্তনুদার এসব কথা শুনতে গেলে আমার চলবে না। আমার জলতেষ্টা পাচ্ছে। খাওয়া হয়ে গিয়েছে। শান্তনুদা যেভাবে গাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে আছে, তাতে আমার পক্ষে বেরনোই মুশকিল।

আমি কথা বলবার জন্য মুখ তুলতেই, শান্তনুদা আবার বলল, 'উশীনরকে সব মেয়েরই ভাল লাগবার কথা। ও আমাদের মত না। দেখ এখন মুড এসে গেছে, পাগলের মত ব্রিজের ওখানে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, রূপনারায়ণকে দেখছে। ময়না, আমার আপত্তি নেই যদি উশীনরের নাটকে তোমাকে হিরোইন করা হয়। উশীনর যদি মনে করে, তা হলে নিশ্চয়ই তোমাকে নায়িকা করতে পারে।'

কথাটা আমার মাথায়, নতুন করে বাজল যেন। আমার মনে আছে, অলক তখন উশীনরকে বলছিল, 'সুদীপ্তার কথাটা একটু ভেব।' সত্যি কী উশীনরের এতখানি ক্ষমতা আছে যে, তার কথায় আমাকে নায়িকার ভূমিকা দেওয়া হবে। তা যদি হয়ও, শান্তনুদা এ কথাটা আমাকে এখন বলছে কেন। আমি নায়িকা হতে চাই, মনে করি আমার সে যোগ্যতা আছে, কিন্তু শান্তনুদার এ কথার বলার কারণ কী।

হঠাৎ আমি চমকে উঠলাম, শান্তনুদা এক হাত বাড়িয়ে আমার কাঁধে রাখল। বলল, 'ময়না, তোমাকে দেখে এখন আমার সোনার কথা মনে পড়ছে।'

আমি চমকে উঠলাম। শান্তনুদার চোখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, আমার মুখের দিকে ও ঠায় তাকিয়ে আছে। সোনার

কথা মনে পড়া, আর আমার মুখের দিকে ঠায় তাকিয়ে থাকা, ব্যাপারটা আমাকে কেমন ভয় ধরিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু সেটা আমি বুঝতে না দিয়ে একটু হাসলাম, বললাম, 'তাই নাকি ?'

'হ্যাঁ ময়না, আমি খুব দুর্ভাগা, তাই কিছুই পেলাম না জীবনে, কিন্তু সোনা কি—'

আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম, 'সরুন শান্তনুদা, আমার ভীষণ জলতেষ্টা পেয়েছে, বাইরে যাব।'

শান্তনুদা নিজেই দরজাটা খুলে দিল, বলল, 'এস।'

গাড়ির ভেতর থেকে বাইরেই ভাল। বাইরে এসে, সিলভার জাগ থেকে গেলাসে জল ঢেলে নিলাম। শান্তনুদা আবার আমার পাশে এসে দাঁড়াল। বলল, 'সোনা তোমাকে কোন চিঠি-পত্র দেয় ?'

ক্রমাগত, ভয়ের সঙ্গে, একটা রাগ আর ঘৃণাও আমার মনে জাগতে আরম্ভ করল। শান্তনুদা এতদিন বাদে এসব কথা তুলছে কেন। এসব কথা মনে পড়িয়ে দেবার কী দরকার। নিশ্চয়ই, সোনার অভাব ময়না মেটাতে পারবে না। আমি জল খেয়ে বললাম, 'না, আমার সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই!'

শান্তনুদা আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি ভুল করেছি ময়না, তারই প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে মনে মনে। সোনা আমাকে ছেড়ে চলে গেল।'

'সোনা আপনাকে ছেড়ে চলে গেছে ?'

আমি হেসে উঠলাম। শান্তনুদা বলল, 'কিন্তু আমি কি ওকে তাড়িয়ে দিয়েছি বলতে চাও ? মানুষের মন সব সময় একরকম থাকে না, আমি তখন বুঝতে পারি নি।'

আমি বলে উঠলাম, 'তাই ওকে নার্সিং-হোমে পর্যন্ত নিজের থেকে ছুটতে হয়েছিল ক্যুরেট করতে, আপনি সেটুকু সাহায্যও করতে পারেন নি। আমি মনে করি, আপনি ওকে সরিয়ে দিয়েছেন, তাই ও সরে গেছে।'

শান্তনুদা আমাকে দুহাত দিয়ে প্রায় জড়িয়ে ধরল, বলল, 'আমার 'অন্যায় আমি অস্বীকার করছি না ময়না, কিন্তু ও যদি ওভাবে চলে না যেত, তাও বিশেষ করে সেই বদমাইস দীনেশের সঙ্গে—'

আমি শান্তনুদার হাত সরিয়ে দিয়ে, একটু ফুঁসে উঠেই বললাম, 'রাস্তার ওপর এভাবে কথা বলবার দরকার নেই শান্তনুদা। আমি ময়না আপনি ভুলে যাবেন না। আর এসব কথা শুনতে আমার একদম ভাল লাগছে না।'

বলে আমি ডান হাত তুলে ঘড়ি দেখলাম। বৈজুর দিকে ফিরে তাকাতে গিয়ে, চোখে পড়ল, উশীনর এগিয়ে আসছে। বাতাসে ওর পায়জামা-পাঞ্জাবী উড়ছে, কপালের ওপরে চুল উড়ে এসে পড়েছে। আমি বললাম, 'কী ব্যাপার উশীনরবাবু, গোটা রাতটা কি রূপনারায়ণের ধারে কাটবে নাকি?'

উশীনর এগিয়ে এসে বলল, 'আমি তো ভাবলাম, আপনাদের এখনো হয় নি।'

আমি বৈজুর দিকে ফিরে বললাম, 'আর দেরি করা উচিত না, এবার চলা দরকার।'

শান্তনুদা বলল, 'বৈজু, গাড়ি ছোড়।'

বৈজু জলের জাগ গাড়ির পিছনে ক্যারিয়ারে নিয়ে রাখল। আমি সমস্ত প্যাকেটগুলো গাড়ির ভেতর থেকে বাইরে ফেলে দিলাম। উশীনর শান্তনুদাকে বলল, 'আপনি তো সামনেই বসবেন শান্তনুবাবু?'

আমি তৎক্ষণাৎ ঘাড় ফিরিয়ে, উশীনরের মুখের দিকে দেখলাম। ওর চোখ আমার দিকে নেই। শান্তনুদা এখন টলছে, হাত জোড় করে প্রায় ঘুমন্ত গলায় বলল, 'এই একটা ব্যাপারে আমাকে দয়া করুন উশীনরবাবু।'

উশীনর হেসে বলল, 'না না, আমি সেজন্য জিজ্ঞেস করিনি, ভাবলাম, এখন যদি আপনার পিছনে বসতে ইচ্ছে হয়ে থাকে, তা হলে আপনি বসতে পারেন।'

উশীনরের মুখের ওপর থেকে, চোখ সরাতে, আমার এক মুহূর্ত দেরি হল। কী ভাবছে লোকটা? এ কথা ভাবছে নাকি যে, শান্তনুদা আর আমি এতক্ষণ প্রেম করছিলাম? তাই সে সরে গিয়ে, আমাদের পাশাপাশি বসার সুযোগ করে দিতে চায়। তাহলে বলব, এ নাট্যকারের কোন প্রতিভাই নেই, মানুষকে দেখতে আর চিনতে শেখে নি। নাকি, আসলে, সেই একই চিরাচরিত পুরুষ চরিত্র, একজনের সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলতে দেখে, মনের কোণে জ্বালা ধরে গিয়েছে। তার ওপরে আবার, শান্তনুদা আমার দুই কাঁধে, দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছিল, সেটাও নিশ্চয় চোখে পড়েছে।

শান্তনুদা বলল, 'না স্যার, আমি সামনেই বসতে চাই।'

উশীনর আমার দিকে চেয়ে বলল, 'আচ্ছা, আমি তা হলে উঠি, তা না হলে আপনি উঠতে পারবেন না।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনার কি পিছনে বসতে কষ্ট হচ্ছে?'

উশীনর গাড়িতে উঠতে উঠতে বলল, 'না, আমার কষ্ট আর কী, আপনারই হয়তো একটু কষ্ট হতে পারে।'

আমি বললাম, 'এতবড় গাড়িতে আবার কষ্ট কী, প্রচুর জায়গা। আপনি কি জানালার ধারে বসতে চান?'

উশীনর মাঝখানে বসে বলল, 'না না, কষ্ট আবার কী।'

আমি উঠে বসলাম, যতটা সম্ভব, কোণ ঘেঁষে, যাতে উশীনর মাঝখানে বসলেও অনেকখানি জায়গা পায়। উশীনরকে আমি বুঝি না। পুরুষমানুষ একটু সোজাসুজি কথা না বললে, আমার আবার ভাল লাগে না। সব কথা মনের মধ্যে চেপে রেখে দিলাম, মুখ ফুটে কিছু বললাম না, এ আমার ভাল লাগে না। গরম লাগছিল বলে, জানালার কাঁচ নামিয়ে দিলাম। বৈজু তৈরি ছিল, গাড়ি ছেড়ে দিল। স্পীডোমিটার না দেখতে পেলেও, আমার মনে হল, কিছু না হোক, আশী নব্বুই কিলোমিটার স্পীডে চলছে। অলক একেবারে কাত হয়ে পড়ল এক ধারে। আমার চুল উড়ে ঘাড়ে গালে মুখে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সরিয়ে সরিয়ে দিতে

লাগলাম। উশীনর সিগারেটের প্যাকেট বের করল। ওর ভদ্রতাবোধের শেষ নেই, জিজ্ঞেস করল, 'খাবেন ?'

আমি হেসে বললাম, 'নো, থ্যাংকস।'

উশীনর চকিতেই, সিগারেট মুখে দিয়ে, প্যাকেট পিছনে রেখে দিল। দারুণ বাতাসেও, চট্ করে সিগারেট ধরাল। আমাদের দুজনের মাঝখানেই, বেশ খানিকটা ফাঁক। বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে, আবার শান্তনুদার কথাগুলোই, আমার মাথার মধ্যে পাক খেতে লাগল।

সোনা আমার দিদির নাম। সংসারে, আপনজন বলতে আমার একজনই ছিল। ছিল বলব না, দিদি এখনো বেঁচে তো আছেই, হয়তো আমার আপনই আছে। দিদির সঙ্গে যোগাযোগ ঠিকই আছে আমার, শান্তনুদাকে ইচ্ছা করেই আমি সে কথা বলি নি কারণ, দিদি চায় না, ওর কোন খবর, শান্তনুকে দেওয়া হোক। সেটাও সত্যি কথা, ছেঁড়া চুলে গেরো বেঁধে লাভটাই বা কী।

আমাদের বাবা-মায়ের আমরা দুই সন্তান, আমাদের আর কোন ভাই-বোন নেই। যদিও লোকে জানে, বাবা মা ভাই বোন মিলিয়ে, আমাদের বিরাট সংসার, রাবণের গোষ্ঠি। অবিশ্যি, কথাটা এক দিক থেকে একেবারে মিথ্যা না। শুনেছি, পাবনায় আমাদের জন্ম, ছেলেবেলাটা কিছু কেটেছে শিলিগুড়িতে, তারপর কলকাতায়। দেশ-বিভাগের পরে শিলিগুড়িতে এসেছিলাম, তখন আমার বয়স দুই-তিন বছর। শিলিগুড়িতে যখন এসেছিলাম, তখন কেবল বাবা, মা মারা গিয়েছিল দেশে থাকতেই। শিলিগুড়িতে যাবার কারণ, সেখানে মাসীমা-মেসোমশায় আগেই গিয়েছিল। আমাকে আর দিদিকে দেখাশোনা করার লোক দরকার ছিল। সেইজন্য বাবা আমাদের নিয়ে শিলিগুড়িতেই গিয়েছিল। মাসীমার তখন একটি ছেলে হয়েছে। মেসোমশায়ের অবস্থা ভাল না। সেই তুলনায়, বাবার অবস্থা তখন ভাল। মেসোমশাই সেইজন্যই তার সংসারে

আমাদের তখন খাতির করেই নিয়েছিল। এসবই আমার শোনা কথা। আমি তো, মাসীমা-মেসোমশাইকেই, মা বাবা বলে ডাকতাম, এখনো ডাকি।

বাবার নগদ টাকা ক্রমাগত খরচ হয়ে গিয়েছিল। মেসোমশাই বরাবরই উঞ্ছ প্রকৃতির লোক। কখনো কোন চাকরি বা ব্যবসা, ঠিক মত করে নি। বাবা যতদিন বেঁচেছিল, বলতে গেলে, সে-ই মেসোমশায়ের সংসার চালাত। অথচ ঠিক দেড় বছর অন্তর, মাসীমার একটি করে বাচ্চা হতো। আমার যখন আট বছর বয়স, তখন মাসীমার সব শুদ্ধ ছ'টি সন্তান।

আমার আট বছর পূর্ণ হবার আগেই, বাবা মারা গিয়েছিল।

তখন বাবার হাতে বেশ ভাল টাকা। পাবনার জমি বাড়ি সবই বিক্রি করে দিয়ে এসেছিল। বাবা মারা যাবার পরে, সমস্ত টাকাই মেসোমশায়ের হাতে পড়েছিল। আমরা যে একেবারে বাপ-মা-হারা হয়েছিলাম, সেটা আমি তখনো তেমন বুঝতে পারি নি, দিদি যতটা বুঝেছিল। ইস্কুলে পড়ে, মাসীমার সংসারে ছেলে-মেয়ে কোলে করে, একরকম ছিলাম।

মেসোমশাইয়ের মাথায় তখন অনেক বুদ্ধির খেলা। এতগুলো টাকা হাতে রয়েছে, কী ভাবে তাকে কাজে লাগাবে, তারই চিন্তা। সেই সময়ে, মেসোমশাই একলা কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় এসেছিল। ফিরে গিয়ে আমাদেরও নিয়ে এসেছিল কলকাতায়। বাসা একটা আগে থাকতেই ভাড়া করে গিয়েছিল। এখনো আমরা সেই বাসাতেই আছি। কলকাতায়, মেসোমশাইয়ের কিছু চেনাশোনা লোক ছিল। তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, একটা ছোটখাট ফ্যাক্টরিতে, কেরানীর কাজ পেয়েছিল। তখনো তার বয়স চল্লিশ হয় নি।

কলকাতায় এসেও, আমরা ইস্কুলে ভরতি হয়েছিলাম। কিন্তু দিনের পর দিন, অবস্থা এত খারাপের দিকে নামতে আরম্ভ করেছিল, সংসারের চেহারা তাতে বদলে গিয়েছিল। দিদি ইস্কুল-ফাইনালে

ফেল করেছিল। আমার বিদ্যা ক্লাস সেভেন অবধি। এখন অবিশ্যি, বাইরের লোকদের বলি, বি. এ. পরীক্ষা দিতে পারি নি। কেন না, এর মধ্যে অনেক জল গড়িয়ে গিয়েছে, সে ময়না আর এ ময়নাতে অনেক তফাত, অনেক কিছু শিখে নিয়েছি।

দু'টো ঘর, মাসীমার এগারোটি ছেলেমেয়ের মধ্যে, ন'টি জীবিত। একটাই রক্ষে, সাতটাই ছেলে, দুটো মেয়ে। মেয়েগুলোই ছোট। সব থেকে বড় ছেলের বয়স এখন বাইশ। সব মিলিয়ে আমরা এগারোটি, আর মাসীমা মেসোমশাই। এখন অবিশ্যি, আমাদের বাড়িতেই, আর একটা আলাদা ঘর ভাড়া নিয়েছি। আমার দুই বোন রাত্রে আমার কাছে থাকে।

কিন্তু তখন এগারোটা ছেলে-মেয়ে, গাদাগাদি পাশাপাশি থাকা। খাবার অভাব। নিজেদের মধ্যে কোনরকম লজ্জা-শরমের ব্যাপারই ছিল না। মারামারি, খেয়োখেয়ি, একটা সাংঘাতিক তার চেহারা। আমরা সকলেই নির্লজ্জ, মাসীমা মেসোমশাই নির্লজ্জ। মাসীমার বড় দুই ছেলে কোনরকমে ক্লাস টেন অবধি পড়েছিল। বাকীদের প্রাইমারিতেই শেষ। প্রাইমারি বলেই, ফ্রি ইস্কুলের সুযোগ পাওয়া গিয়েছিল উদ্বাস্তু বলে।

দিদি তখন থেকেই, পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে বেশ মেলামেশা করত। আমিও করতাম। দিদি আর আমি দেখতে শুনতে মন্দ ছিলাম না, স্বাস্থ্যও, অভাবের ঘরে খারাপ ছিল না। তাই, সকলের চোখেই পড়ছিলাম। দিদি ইস্কুল-ফাইনালের আগেই, পাড়ায় থিয়েটারে নেমেছিল। আমি রেডিও-রেকর্ডের গান শুনে, ভাল নকল করতে পারতাম। আমার কাছে সবাই গান শুনতে চাইত। দশ বছর বয়সে, দিদিই আমাকে প্রথমে থিয়েটারে নামিয়েছিল। তা ছাড়া, আমি পাড়ায় একটা জিমনাসিয়াম ক্লাবে যেতাম। সেখানে আমি অনেক খেলাও শিখেছিলাম। কিছু কিছু ট্রাপিজের খেলা শিখেছিলাম, ছেলেদের মত, হরাইজেনটাল বারে, ঘুরপাক খাওয়া বা, ছেড়ে দিয়ে ডিগবাজী খেতেও শিখেছিলাম। তা ছাড়া এমনিতে

আর্চ পিকক তো জল-ভাত হয়ে গিয়েছিল।

জিমনাসিয়ামের মাস্টার বিমলদা আমাকে খুব যত্ন করেই শেখাত। সুদেহী বলে, কয়েকবার পুরস্কার পেয়েছে বিমলদা। আজও বিয়ে করে নি, আজীবন নাকি ব্রহ্মচারী থাকবে। কিন্তু, বিমলদাকে আমি অন্যরকম চিনেছি। বিমলদা আমার গায়ে হাত দিলে, আমার অস্বস্তি এবং ভাল দুই-ই লাগত। বিশেষ বিশেষ জায়গায়, বিশেষ বিশেষ ভাবে হাত দেবার মধ্যে যে একটা বিশেষ ব্যাপার আছে, সেটা আমি বুঝতে পারতাম, কিন্তু বিমলদা এমন ভাব করত যে, তার যেন ওসব খেয়ালই নেই। অথচ, এগারো-বারো বছরের মেয়ে আমি, আমার রক্তের মধ্যে কীরকম দপদপিয়ে উঠত। আমার মনে মনে ভীষণ লজ্জা করত, ভয় পেতাম। বিমলদা তো শরীরের সব জায়গাতেই হাত দিত, যেন আমি একটা কাদার ড্যালা। কিন্তু সত্যি কাদার ড্যালায়, ওভাবে হাত দিয়ে, শিউরে তোলা যায় না। এমনও হয়েছে, আমার হাতে পায়ে শক্তি থাকত না।

প্রথম পিকক করাবার সময়, নাভির কাছে দুই কনুই রেখে, মাটির দিকে উপুড় হয়ে, সমস্ত শরীরটাকে যখন বাঁকিয়ে তুলতে যেতাম, পারতাম না। বিমলদা, আমার বুকে আর তলপেটের নিচে, প্যান্টির (ছোট্ট জাঙি পরেই খেলা শিখতে হতো, আর গায়ে হাতাওয়ালা গেঞ্জির মত টাইট জামা।) তলায় হাত দিয়ে তুলে ধরে রাখার চেষ্টা করত। আমি বুঝতে পারতাম, প্রথম দু তিন বারের পরে, বিমলদার হাত কী রকম যেন করত।

এটা শুধু আমার ব্যাপারে না, আরো অন্যান্য মেয়েদের বেলায়ও তাই। পরে আমরা এই নিয়ে, নিজেদের মধ্যে গল্প করতাম। তবে, শরীরের এসব বিষয়, আমি আরো ছেলেবেলা থেকেই জানি। এক ঘরে, আমরা এতগুলো ভাই বোন থাকতাম যে, যাকে বলে পশুবৃত্তি, সব থেকে সহজে যে সব সুখগুলো আয়ত্ত করা যায়, অথবা আপনা থেকেই এসে পড়ে, সেসব অনেক আগেই জানা হয়ে গিয়েছিল। লজ্জার মাথা খেয়ে, স্বীকার করতেই হয়, আমাদের মাসী-মেসো খেলা, আমরা

নিজেরাই খেলতাম। আমাদের চোখে, সব ছেলেমেয়েদের চোখেই, মাসী-মেসোর কোন ব্যাপারই তো গোপন ছিল না। পাকামি ইতরতা বলতে যা বোঝায়, তা সবই জানা হয়ে গিয়েছিল। তবু কোথায় যেন একটা ভয়ও ছিল, একটা অন্যায়ের ভাব, খারাপ। একটু বড় হবার পরে, যখন আর একটা নতুন ব্যাপার শরীরে ঘটল, মা হবার যোগ্যতা—যোগ্যতা না ছাই, একটা নতুন বিপদ আর ভয় এসে শরীরে দেখা দিয়েছিল, তখন মনের দিক থেকে, কেমন একটা ঘাড় বাঁকানো ভাবও এসেছিল, 'কোন ছেলে আর আমার গায়ের কাছে এস না। এখন আমি বড় হয়েছি।' এমনি একটা ভাব। আমি নিজেকে রক্ষা করব, আর সেটা একটা পবিত্র ব্যাপার, এইরকম চিন্তা মনের মধ্যে এসেছিল। বারো বছর বয়সে, এই ঘটনা যখন ঘটেছিল, তারপরে আর মাত্র ছ' মাস আমি বিমলদার ক্লাবে গিয়েছিলাম। ভাল লাগত না, বিমলদার ওসব খেলা। একটা অন্ধ আর মেকি সুখের পরিবর্তে, নোংরামিটাই বেশি করে বাজত। এমন কি, আমার ভাইদেরও দূরে সরিয়ে রাখতাম। মাসীমার একটাই সুমতি দেখেছিলাম। আমি আর দিদি যতই বড় হয়ে উঠছিলাম, তার ছেলেরাও যখন ক্রমে বড় হয়ে উঠছিল, আর মেসোমশাইকেও মাসীমা আর বোধহয় সহ্য করতে পারছিল না, আমাকে দিদিকে আর একেবারে ছোটদের নিয়ে একটা আলাদা ঘরে রাত্রে শুত। মেসোমশাই বাকীদের নিয়ে আর একটা ঘরে। যদিও তারপরেও অবিশ্যি মাসীমার ছেলেমেয়ে হয়েছে।

লেখা-পড়া বন্ধ হয়ে যাবার পরে, দিদি ক্রমাগত নাটকের দিকে চলে গিয়েছিল। প্রায়ই, এদিকে ওদিকে নাটক করতে যেত। রাত্রে বাড়ি ফিরত। মাসীমাকে দু-চার টাকা দিতেও দেখতাম। দিদির কাছে অনেক লোক আসত, নানান গোষ্ঠী আর ক্লাবের লোকেরা। নতুন নাটক, রিহার্সাল, সব কিছুই তো ছিল। ক্রমে তাদের চোখও আমার ওপর পড়ছিল। আস্তে আস্তে আমিও ছোটখাটো রোলে অভিনয় শুরু করেছিলাম। অবিশ্যি, দিদি যেখানে যেখানে করতে

বলত। বোঝা যাচ্ছিল, অভিনয় করবার ক্ষমতা আমার মধ্যেও কিছু আছে।

এরকম অবস্থাতেই একদিন শান্তনুদাকে দেখেছিলাম আমাদের বাড়িতে। শান্তনুদাকে, তার আগেই অবিশ্যি আমি দেখেছি। দিদির মুখে তখন, সব সময়েই শান্তনুদার নাম। শান্তনুদাকে দিদি ভয় পেত, ভক্তি করত, ভালও বাসত, ভাবটা সেই রকমেরই। দিদির একটা ব্যাপার আমি আগেই টের পেয়েছিলাম। ও মাঝে-মধ্যে ড্রিংক করত। কাদের সঙ্গে করত, জানি না। শান্তনুদা এ ব্যাপারে আপত্তি করেছিল। ক্রমে দিদি, পুরোপুরি শান্তনুদার তৈরি গোষ্ঠীর, অভিনেত্রী হয়ে গিয়েছিল। শান্তনুদা ওকে আর কোথাও যেতে দিত না। কারোর সঙ্গে, দিদির মেলামেশা পছন্দ করত না। যেখানে যাবার, নিজে নিয়ে যেত। আর কেউ না জানলেও, আমি জানতাম, শান্তনুদার সঙ্গে ড্রিংকও করে, সিগারেট খায়। কেন না, আমার সামনেই এসব হতো। ওরা নিজেদের 'তুমি' করে বলত, কিন্তু ওদের সংস্থার সকলের সামনে না, আড়ালে, আর আমার সামনে। আমার প্রথম হাতেখড়ি, দিদি আর শান্তনুদার সঙ্গেই। প্রথম একদিন, দিদির গেলাস থেকে, দু চুমুক লাইম জিন খেয়েছিলাম। শান্তনুদা বলেছিল, 'একটু চেখে দেখতে পার।' হায় রে চেখে দেখা! যদিও আমি একেবারে নেশাখোর হয়ে যাইনি, তবে ব্যাপারটা এখন বেশ সহজ, আর সড়গড় হয়ে গিয়েছে।

সেই শান্তনুদা-ই দিদিকে ছেড়ে দিল। ছেড়ে দিল বললে, অনেক ভদ্র শোনায়। তখন শান্তনুদাকে আমার ল্যাজ-গুটানো কুকুরের মত মনে হয়েছিল। যাকে বলে, ফাঁসিয়ে দিয়ে সরে পড়া। দিদির কনসেপশন হয়েছে শুনেই, শান্তনুদার মাথা খারাপ। দিদি কিছুতেই নষ্ট করবে না, শান্তনুদাও তখনই, কিছুতেই বিয়ে রেজিস্ট্রি করবে না। আমার দিদির মধ্যেও একটা প্রকাণ্ড জেদ ছিল, ও যাই হোক, একটা জায়গায় কখনো মচকায় না। ক্যুরেট করল, কিন্তু শান্তনুদার সাহায্য ছাড়াই, আর দীনেশকে বিয়ে করে, চলে গেল বম্বে।

দীনেশ। এই একটা নাম, যা আমার কাছে, এমন একটা কুৎসিত ক্ষতের মত, যে-ক্ষত কখনো সারবার না। এ ক্ষত সারবে না। এ ক্ষত আমার রক্তকে বিষাক্ত করেছে, আমার সমস্ত জীবনটাকেই বোধহয় বিষাক্ত করে দিয়েছে। সারাবার চেষ্টা আমি যদিও করি, এই সমাজ আমাকে তা সারাতে দেবে না। আমার পরিচিতরাই, ঘা-টাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে কাঁচা করে রাখবে।

তখন আমার চৌদ্দ বছর বয়স চলেছে। শান্তনুদা নিজেই আমাকে দীনেশের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। দীনেশ তখন 'অমরাবতী' স্টেজের বেশ নাম-করা পরিচালক। ফ্রক পরে অভিনয় করবে, এরকম একটি কিশোরী চরিত্র ওদের দরকার ছিল। আমাকে সব দিক দিয়েই মানিয়েছিল। অভিনয়ের পরীক্ষাটাও ভাল দিয়েছিলাম। দীনেশের আমাকে পছন্দ হয়েছিল, স্টেজের মালিকেরও।

ভালভাবেই সব চলছিল। কাগজে আমার ছবি আর প্রশংসা, কিশোরী অভিনেত্রী হিসাবে, বেরিয়েছিল। দীনেশ দেখতে খারাপ না, বয়স তখন ওর প্রায় তিরিশ। আমি দীনেশদা বলতাম। দীনেশের ভাব-ভঙ্গি, সবই বুঝতাম। এদিক-ওদিক বেড়াতেও নিয়ে গিয়েছে, তবে আমি সব সময়েই সাবধান থাকতাম। এমনিতে গাল টিপে দেওয়া, গায়ে হাত দেওয়া, সে সব ছিলই, আমি গায়ে না মাখবারই চেষ্টা করতাম। যেন ওসব আমি কিছুই বুঝি না।

তারপরেই সে দিনটা এসেছিল। নাটক শুরু হবে, সেই সময়েই জানা গেল, কে একজন মস্ত বড় ব্যক্তি মারা গিয়েছেন, সিনেমা-থিয়েটার সব বন্ধ। প্রথম দুটো সিনে আমি নেই, তাই তখন আমি জয়াদির (অমরাবতী'র নায়িকা, সে আমাকে তার নিজস্ব মেক-আপ রুমে, মেক-আপ করতে দিত, আর আমি নিজেই আমার মেক-আপ নিতাম।) ঘরে মেক-আপ করছিলাম।

হঠাৎ সব বন্ধ হয়ে যাওয়াতে, জয়াদি, মেক-আপ করা অবস্থাতেই, তার গাড়ি নিয়ে বাড়ি চলে গিয়েছিল। আমাকে স্টেজের গাড়িতে পৌঁছে দেওয়া হতো। সব শুনে, আমি আবার মেক-আপ পরিষ্কার

করতে লেগেছিলাম। স্টেজ জুড়ে যেন একটা ছুটির আবহাওয়া। দর্শকরা তার পরের দিন নাটক দেখবে, এই জেনে চলে গিয়েছিল। আমিও তাড়াহুড়োয় দরজাটা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিলাম, সেটাই আমার কাল হয়েছিল।

আমি সবে ওপরের জামাটা খুলেছি, ব্রেসিয়ার তখনো গায়ে, কোমরে স্কার্ট। দীনেশ এসে ঢুকেছিল। ঢুকেই দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে একেবারে আমাকে জড়িয়ে ধরেছিল। আমি বলে উঠেছিলাম, 'কী করছেন দীনেশদা, দরজাটা খুলে দিন। সবাই কী ভাববে।'

আর ভাববে! দীনেশ অসুরের মত ব্যবহার করেছিল। স্কার্টটা একটানে খুলে দিয়েছিল, আমি চিৎকার করব ভেবেও, পারিনি, ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিলাম, বলেছিলাম, 'পায়ে পড়ি দীনেশদা, ছেড়ে দিন।'

তখন দীনেশ আমার প্যান্টিটা টানাটানি করছে। না পেরে শেষটায় এত জোরে টেনেছিল, ওটা ছিঁড়েই গিয়েছিল। ব্রেসিয়ারটা পর্যন্ত গায়ে রাখতে দেয় নি। দেখেছিলাম একটা নোংরা পশু, কী রকম নির্লজ্জের মত আমাকে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল, আর পশুর মতই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। তখন আমার আর চিৎকার করবার ক্ষমতাও ছিল না। আমার ঠোঁট নাড়াবার উপায় ছিল না।...

আমি উঠতে পারছিলাম না, আমার শরীরে মনে কোন জোর ছিল না, কেবল চোখ দিয়ে জল আসছিল, আর দীনেশ নিজেই, তাড়াতাড়ি আমাকে, কোনরকমে জামা-টামা পরিয়ে দিয়ে, দরজা খুলে চলে গিয়েছিল, বলেছিল, 'তোমাকে আমিই বাড়িতে পৌঁছে দেব, তৈরি হয়ে নাও।'

তৈরি হতে আমার অনেক সময় লেগেছিল। ইতিমধ্যে, ঘরের দরজায়, অনেকেই উঁকি দিয়ে গিয়েছিল। তাদের চোখের নজর আর টেপা হাসি দেখেই বুঝেছিলাম, সব ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে

গিয়েছে। অথচ, স্টেজের মালিক আমাকে ডেকে একটা কথা জিজ্ঞেস করে নি, কেবল একমাসের বাড়তি মাইনে দিয়ে, জানিয়ে দিয়েছিল, আর আমাকে যেতে হবে না।

আশ্চর্য বিধান! কারণ আমি স্টেজে থাকলে, স্টেজের ক্ষতি হবে, এটাই নাকি মালিকের বিশ্বাস। জানি না, হয়তো হতে পারত। কিন্তু দীনেশ আমার কী করল। সবদিক থেকেই আমার ক্ষতি করেছিল। শান্তনুদা যখন ব্যাপারটা সব শুনেছিল, রেগে ক্ষেপে গিয়ে, দীনেশকে নাকি মারতে গিয়েছিল। দিদির মুখে তাই শুনেছিলাম। সেই দীনেশের সঙ্গেই, দিদি বম্বে চলে গিয়েছে। অভিনয় করতে না, সিনেমা করতে না, দীনেশের সংসার করতে। আর দীনেশ গিয়েছে, হিন্দি ছবি করতে।

কী করে এটা সম্ভব হয়েছিল জানি না। তবে দীনেশ, বরাবরই দিদির সঙ্গে মিশতে চাইত। হয়তো দিদির সঙ্গে, কখনো কখনো কিছু কথাবার্তা হয়ে থাকবে। দীনেশ আমার যেমন ক্ষতি করেছিল, তেমনি দিদির কাছে একেবারে ভেঙে পড়েছিল। আর শান্তনুদাকে বেশি করে ধাক্কা দেবার জন্যই হয়তো, দীনেশকেই ও বেছে নিয়েছিল। আর আজ শান্তনুদার হঠাৎ আমাকে দেখে, দিদির কথা মনে পড়ে গেল। হাসি পায়। পুরুষ, পুরুষ, এর নাম পুরুষ। এত রাত্রে, রূপনারায়ণের ধারে, প্রচুর ড্রিংক করে, খাবার খেয়ে, ময়নাকে দেখে এখন সোনার কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। তার মানে কি, ময়নাকে এখন সোনা হতে হবে। বুঝি সবই।

ব্যাপারগুলো কী রকম অদ্ভুত। যে-দীনেশ আমার বিশ্বাস ভালবাসা ইত্যাদি সব ব্যাপারগুলো একেবারে ভেঙে দিয়েছিল, সেই দীনেশকে নিয়ে চলে গেল দিদি, আর দিদিকে যে-শান্তনু সরিয়ে দিয়েছিল, চালাকি করে তাড়িয়েছিল, সে এখন একটা শস্তা টোটকা ছাড়ছে আমাকে, যদি এইভাবে আমাকে ভোলানো যায়।

ভোলানো! আমাকে ভোলানোর আর কী আছে। আমি সে-সব

শেষ করে দিয়েছি। দীনেশের সেই ঘটনার পরে, অনেকদিন বাড়ি থেকে বেরোই নি। দিদির ভয় ছিল, আমার পেটে বাচ্চা এসেছে কী না। সেটাই যা রক্ষে, আমার কনসেপশন হয় নি। দিদি রাত্রে শুয়ে, আমার গায়ে হাত দিয়ে কাঁদত। অনেক কথা বলত, সান্ত্বনা দিত, যাতে আমার মনটা ভাল থাকে। যাতে আমি মন থেকে সমস্ত ব্যাপারটা কাটিয়ে ফেলতে পারি। কাটিয়েছিলাম বৈকি। কাটিয়েছিলাম, হেসেছিলাম, কিন্তু দাঁতে দাঁত চেপে। সেই ঘটনার পরে, প্রথম যখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম, বুঝতে পেরেছিলাম, আমার চেনাশোনা সব জায়গায় সবাই ঘটনাটা জানে। আমার দিকে সকলের তাকাবার দৃষ্টি বদলে গিয়েছিল।

তখন শান্তনুদা বলেছিল, আমি আর অন্য কোথাও যাব না, কেবল ওদের গোষ্ঠীতেই থাকব, নাটক্ করব। তা-ই করতাম, কিন্তু প্রতিমাসে একটা করে প্রেম করতাম। লে লে বাবু ছে আনা, ঠিক এমন ভাবে প্রেম বিলিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। প্রেম প্রেম। কিন্তু সব সময়ে দাঁত আর আর হাতের নখ শানিয়ে থাকত। গায়ে হাত দিবি, কামড়ে খামচে ছিঁড়ে দেব। প্রেমের কথা বল, টাকা খরচ কর, খাওয়া, বেড়াতে নিয়ে যা, কিন্তু আমার ইচ্ছা না হলে, গায়ে হাত দিবি না। কেন না, জানি তো, প্রেম মানে তো, একটা উদ্দেশ্য। এত সহজে তাই-কি কখনো দেওয়া যায় নাকি। মনের দিক থেকে, কোনরকম সতীত্বে আমার বিশ্বাস নেই। একটা জ্বালা, আমার ইচ্ছাই ইচ্ছা, আমার খুশিই খুশি, তোমার না। আমি খেলাব, তুমি খেলবে। তোমার কুকুরের মত লোভ দেখে, আমি গলায় সুর ভেঁজে পা দোলাব। আমি আর 'অমরাবতী'র মেক-আপ রুমের সেই ফ্রক-পরা ময়নাটি নেই।

তবে হ্যাঁ, কখনো, কখনো যে, দুচারবার, শরীর, মনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে নি, তা বলব না। করেছে, তার কারণ, দু-একজনকে ভাল লেগে গিয়েছে। সেই জন্যই বলছিলাম, সতীত্বে আমার বিশ্বাস নেই। কিন্তু তার মানে এই না, তাদের সঙ্গে

আমি প্রেমে জড়িয়ে গিয়েছি। ভাল লেগেছিল, তা-ই মিশেছি, আর এস না, সরে যাও। ওভাবে মিশেছি বলে যে ভাববে আমি মরেছি, তা মোটেই না। আমি আর জীবনে কোনদিন মরব না।

এই যে অলক, ও আমাকে 'কিন্নরী'র নতুন নাটকে হিরোইন করলেও, কোনদিন ওকে আমি কোন সুযোগই দেব না। কারণ ওকে আমার ভাল লাগে না। ওর মত লোকের কাছে, মেয়েরা ধরা দেবে কেন। টাকা? প্রতিপত্তি? ক্ষমতা? এ সবের কাছে হয়তো একটা ব্যবসায়িক কারণ থাকতে পারে, কিন্তু আমি ব্যবসার সুযোগ দেব না। অলকের কাছে, সমস্ত ব্যাপারটাই ব্যবসা। ও একটা হাত সব সময়ে বাড়িয়ে আছে আমার শরীরের দিকে, আর একটা হাত টাকার আর অন্য সব আশায় ভরা। এটা হয়তো ব্যবসায়িক মনোভাব যাদের, তাদের চেহারা, কিন্তু পুরুষমাত্রেই কি তা-ই না? ছল আর কৌশল যাকে বলে, তার হয়তো দরকার হতে পারে। সেটা তো নিজেই বুঝি, কিন্তু কিসের প্রয়োজনে? প্রয়োজনটা যা, সেটা কি একবারও ভেবে দেখবার দরকার নেই, লোকটাকে ভাল লাগুক বা না লাগুক, সেই প্রয়োজন তবু মিটিয়ে নিতেই হবে? এটাকে কী বলে? দীনেশ? সবাই কি মনে মনে দীনেশ?

আমি জানি, অলক আমাকে ভাল মেয়ে বলে বিশ্বাস করে না। ভাল মেয়ে সেই অর্থে নই তো বটেই, তা বলে অলকের কাছে হার মানব কেন। যার হাত ধরা ভাল লাগে না, সে চুমো খেতে এলে, তার মুখে আমি বমি করে দেব। ওর কি অন্য বেশ নেই, ভাষা নেই? মেয়েরা ওর কাছে কাঠ। আর ও ছুতোর মিস্তিরি হয়ে বসে আছে, কেবল পেরেক ঠুকবে বলে। ওকে আমার এমনিতে খারাপ লোক বলে মনে হয় না। ওর প্রত্যেকটা মুভমেণ্টই প্রায় আমাকে হাসায়। কিন্তু ওই সেই একটা ছিঁচকেমি আর লোভ, যার চেহারাটা বিশ্রী। ওর মধ্যে দীনেশ আছে। সুযোগ পেলে, ও হয়তো কোনদিন জোরও করতে পারে। মনে হয়, আমি ওর কাছে একটা মাথাব্যথা। আমার মত মেয়ের এত অহঙ্কার অলকের

সহ্য হচ্ছে না। যেমন দীনেশের সহ্য হয় নি, একটা একরত্তি গরীব মেয়ের, শক্ত হয়ে থাকা। কে জানে, এই যাত্রা কিসের, আমাকে নিয়ে এল কেন। হয়তো মতলব থাকতে পারে কিছু।

আমি হয়তো আসতাম না। তারপরে ভাবলাম, দু-দিনের ব্যাপার, হিরোইনের চিন্তাটাও মাথার মধ্যে আছে, তাছাড়া উশীনর যাচ্ছে, এটা একটা বাড়তি ইণ্টারেস্ট। তা ছাড়া শান্তনুদা রয়েছে। প্রথমে অবিশ্যি বিশ্বাস করেছিলাম, আরো দু-একজন যাবে। এখন বুঝতে পারছি, সে সবই অলকের মিথ্যা চাল। আমার নায়িকা হবার কথাও উশীনরের সঙ্গে কিছুই হয় নি। উশীনরের ইচ্ছা হয়তো কাজ করবে, শান্তনুদার কথাতেও যেন সেটা টের পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু তার জন্য উশীনরকে কি আমাকে খুশি করতে হবে? উশীনর কি তা চায়? আমি করব কি না করব, সেটা পরের কথা, উশীনর চায় কী না সেটাও বোঝা দরকার। আর আমি, আমিই চাই কী না, সেটা আমাকে ভেবে দেখতে হবে।

তবে অলককে আমার ভয় নেই, এই কারণে, আরো দুজন লোক রয়েছে। ড্রাইভার বৈজুও আছে। আমি একলা না থাকবারই চেষ্টা করব। আমার কাউকেই বিশ্বাস করবার দরকার নেই, আমি সব সময় সকলের সঙ্গে সঙ্গে থাকব। অন্তত: এইটা আমার বিশ্বাস, সকলে এক সঙ্গে, আমাকে কিছু করবে না। অলকের মাথায় আমি পরিষ্কারই ঘুরছি। শান্তনুদার মাথায়, আমার মধ্যে সোনা ঘুরছে। পুরনো স্বাদ, তাই একটু বেশি গাঢ়। সাবধান থাকাই উচিত। বাকী উশীনর, এখনো বুঝতে পারছি না। মিষ্টি ব্যবহার, ম্যানারস্ জানা থাকলেই যে, সে লোক ভাল হবে, তা আমি মনে করি না। আরো খারাপ হতে পারে। তবে এরকম একটা রেপুটেড লোক, হঠাৎ কিছু করবে বলে মনে হয় না। উশীনর নিজের সম্পর্কে সচেতন, সেটা বুঝেছি, ওর আত্মসম্মান বোধও, বোধহয় একটু চড়া। সিগারেটটা খেল না কেন। ওভাবে হাতেই বা ধরে রাখল কেন।···

নাঃ, আর বাতাসের ধাক্কা সহ্য করতে পারছি না। চুলগুলো কিছুতেই ঠিক রাখা যাচ্ছে না। তা ছাড়া, আমার যেন এখন কেমন শীত শীত করছে। আমার পিঠে একটা অদ্ভুত ব্যথা আছে, সেটা একটানা অনেকক্ষণ বসে থাকলে হয়। এখন আমি আর বসেও থাকতে পারছি না। হাতে পায়ে যেন তেমন শক্তিও পাচ্ছি না। ঘড়ির ডায়ালটা দেখতে পাচ্ছি না, কত রাত হল কে জানে।

হঠাৎ কানে একটা শব্দ যেতে চমকে উঠলাম। কে রে বাবা, নাক ডাকাচ্ছে? যা ভেবেছি তা-ই, শান্তনুদার নাক ডাকছে, তারই শব্দ। আমি পাশে ফিরে দেখলাম, উশীনর প্রায় একই ভাবে পা দুটি ছড়িয়ে বসে আছে। মাথাটা এখন হেলানো সিটের পিছনে। ওর চোখ বন্ধ কী না বুঝতে পারলাম না।

আমি কাঁচটা নামাবার জন্য, চেষ্টা করলাম, হল না। কাত হয়ে না ফিরলে হবে না। তাই ফেরবার উদ্যোগ করতেই, উশীনর বলে উঠল, 'আপনি ছেড়ে দিন, আমি তুলে দিচ্ছি।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'ও, আপনি জেগে আছেন?'

উশীনর বলল, 'এখনো।'

কাঁচটা তুলে দিল উশীনর। আমি বড় বেডকভারটা টেনে তুলতে চেষ্টা করলাম, পারলাম না, আর হাতের জোর দিতে গিয়ে পিঠের ব্যথাটা বেশি লাগল, আমি শব্দ করলাম, 'উহু!'

উশীনর জিজ্ঞেস করল, 'কী হল? দাঁড়ান, আমি বেডকভারটা তুলে দিচ্ছি।'

আমি বললাম, 'আমার পিঠে একটা ব্যথা করছে, শীতও করছে বেশ।'

উশীনর বেডকভারটা তুলে আমার পিছনে কোণের দিকে খানিকটা ভাঁজ করে রেখে, বাকীটা আমার গায়ের ওপর ফেলে বলল, 'এটা গায়ে দিন। খুব শীত করছে?'

'খুব না, তা হলেও মন্দ না।'

উশীনরকে সত্যি বুঝতে পারছি না। রীতিমত সহৃদয় ভদ্রলোকের মত ব্যবহার করছে। অথচ, কিছুক্ষণ আগে মনে হয়েছিল, আমার সঙ্গে বোধহয় আর কথাই বলবে না, রীতিমত ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু বেডকভারটা গায়ে দেবার জন্যে কিছুতেই সুবিধা করতে পারছি না। উশীনর বলে উঠল, 'ওভাবে টানলে হবে না, আমি দিয়ে দেব?'

বললাম, 'দিন তো।'

আমি উশীনরের কাছে সরে এলাম, ওর গায়ের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি করে। উশীনরের ব্যবহারে আমি অবাকই হয়েছিলাম। ও বেডকভারের খানিকটা অংশ টেনে, আমার কাঁধ গলা থেকে শরীরের ওপর দিয়ে ফেলে দিল। আমার কোমরের পাশ দিয়ে এমন সহজভাবে জড়িয়ে দিল, আমার কিছুই মনে হল না, বরং নিজেকে কী রকম নিশ্চিন্ত আর নিরাপদ মনে হল। মনে হল, আমি উশীনরের বুকের ওপর শুয়ে থাকলেও কোন ভয় নেই। উশীনরকে আমার ভীষণ ভাল লাগল। আমি যে ভাবছিলাম, উশীনর মিনমিনে, চাপা, এখন তা মোটেই মনে হচ্ছে না। আমার ওপর সে খুবই সদয়। এসবও উশীনরের জানা আছে, সেবাকর্ম করেছে নাকি কখনো। আমি ওর মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম। ও বলল, 'কোণের দিকে পিঠটা চেপে রাখুন, ব্যথাটা কম লাগবে।'

কিন্তু উশীনর তো সেভাবে আমার চোখের দিকে তাকাচ্ছে না। কী অপরাধ আমি করেছি। গাড়িটা নিঝুম, শুধু এঞ্জিনের শব্দ। শান্তনুদার নাক ডাকানো হঠাৎ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আমাদের কথাবার্তা শুনে নাকি? বাইরে দু পাশে বড় বড় জঙ্গল রয়েছে মনে হচ্ছে। আমি কোণের দিকে সরে গেলাম না, তা হলে উশীনরের কাছ থেকে অনেকখানি সরে যেতে হয়। বললাম, 'পা ছড়িয়ে দিলে, আপনার পায়ে লাগবে।'

উশীনর বলল, 'তা আর কী করা যাবে। এটুকু জায়গার মধ্যে, সেটা খুবই স্বাভাবিক। আর যদি মনে করেন, ব্যথা আর শীত

বেশী লাগছে, আর আপনার যদি সহ্য হয়, তবে একটু ব্র্যাণ্ডি খেয়ে নিতে পারেন। অলক একটা ব্র্যাণ্ডি এনেছে শুনেছি।'

আমি বললাম, 'না, এখন আর থাক।'

কিন্তু মনে মনে আমি একটু ব্যস্ত হয়ে পড়ছি। উশীনর তখন কেন অমন চুপ করে গিয়েছিল, সে কথা আমার এখনই যেন না জানলে নয়। সেটা মেয়ে বলেই কী না জানি না। আমি বললাম, 'উশীনরবাবু, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'কী?'

'আপনি কি রাগ করেছেন কোন কারণে?'

'না তো।'

'কিছু মনে করেছেন?'

'কী বিষয়ে?'

'সিগারেটের ব্যাপারটায়?'

'হ্যাঁ।'

আমার বুকটা ধ্বক্ করে উঠল। এ যেন সোজাসুজি তীর ছুঁড়ে মারার মত। আমি কোন কথা বলতে পারলাম না। উশীনরের মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। উশীনরও একেবারে চুপচাপ সামনের দিকে চেয়ে আছে। ওর মুখটা এত মিষ্টি, এখন কীরকম শক্ত দেখাচ্ছে। ভাগ্যিস, অলক শান্তনুদা ঘুমোচ্ছে। ওরা শুনলে, ভীষণ লজ্জা করত আমার। খানিকক্ষণ পরে বললাম, 'আমি বুঝতে পারি নি উশীনরবাবু।'

উশীনর হাসল, বেশ সহজ ভাবেই বলল, 'তা তো নিশ্চয়ই, বুঝলে কেউ ও-রকম করে নাকি। ওটা আপনি হয়তো অভ্যাস অনুযায়ী করেছেন।'

'কোন্‌টা?'

'আপনার মুখের সিগারেটটা আমাকে অফার করা। আমি বুঝেছি, আপনি ওটা খুব সহজভাবেই করেছেন, কিন্তু আমার ভাল লাগে নি আর কি। যাকগে, ও কিছু না, ভুলে যান, আমি আর মনে রাখি নি।'

আমি যেন একেবারে থ হয়ে গেলাম, আমার অহঙ্কারেও বড়

লাগল, নিজেকে ভারি ছোট মনে হল, আমি মাথা নীচু করে রইলাম। এখন সব কিছু আমার কাছে আরো নিঝুম মনে হচ্ছে। শান্তনুদার নাক-ডাকাও শোনা যাচ্ছে না। উশীনর কীরকম স্পষ্ট সহজভাবে, হেসে কথাগুলো বলল। কিন্তু আমি কি সবটাই ভুল দেখেছিলাম। উশীনর কি পুরুষের চোখে একবারও আমার দিকে তাকায় নি। তার চোখের দৃষ্টি কি সবটাই ভুল দেখেছি। আমাকে কি তার একটুও ভাল লাগে নি। আরো অবাক লাগছে, এসব তার মনে ছিল, তবু সে আমাকে বেডকভার গায়ে দিতে সাহায্য করল, কাঁচ তুলে দিল। কিন্তু আমার কি এতটাই ভুল, আমি উশীনরের চোখে একটুও ভাল লাগা দেখি নি?

আস্তে আস্তে কোণের দিকে এলিয়ে পড়তে পড়তে বললাম, 'সত্যি বুঝতে পারি নি, মাপ করে দেবেন।'

উশীনর অমায়িক হেসে বলল, 'তার দরকার নেই। বললাম তো, মনে রাখবেন না।'

উশীনরের এই হাসিটা এখন আর আমার ভাল লাগল না। হয়তো তার মর্যাদা আমি রাখতে পারি নি, তার পাওয়ানা সম্মান দিতে আমি ভুলে গিয়েছি, কিন্তু এ কথাও ঠিক, তার কথাবার্তা ভাবভঙ্গি থেকে আমি বুঝতে পারি নি। তবে, এতে আমার এমন কিছু যাবে আসবে না। অসম্মানের ভয় আমার নেই, একটা জায়গায় একটু লাগল বৈ কি। উশীনর বলল, 'অভ্যাস অনুযায়ী' আমি সিগারেটটা ওকে খেতে দিয়েছিলাম। ওটা মিথ্যা কথা। আমার মুখের সিগারেট কাউকে খেতে দেওয়া, আমার অভ্যাস নয়। অনেকে খুশি হয়ে টেনে নিয়ে যায়, নিজে কাউকে দিই না। উশীনরকে দিয়েছিলাম। সেখানটাতেই আমার বাজছে। এ আমার পক্ষে চট করে ভুলে যাওয়া সম্ভব না। ভুলবও না। আমার সমস্ত কিছুর মধ্যেই যেন, এটা একটা যন্ত্রনার মত খচ্ খচ্ করছে, একটা সুঁচলো কাঁটার মত। কাঁটাটা তুলতে না পারলে শান্তি নেই। কাঁটা খচখচানো আমি ভালবাসি না, কাঁটা আমি চাই না।

শান্ত নয়
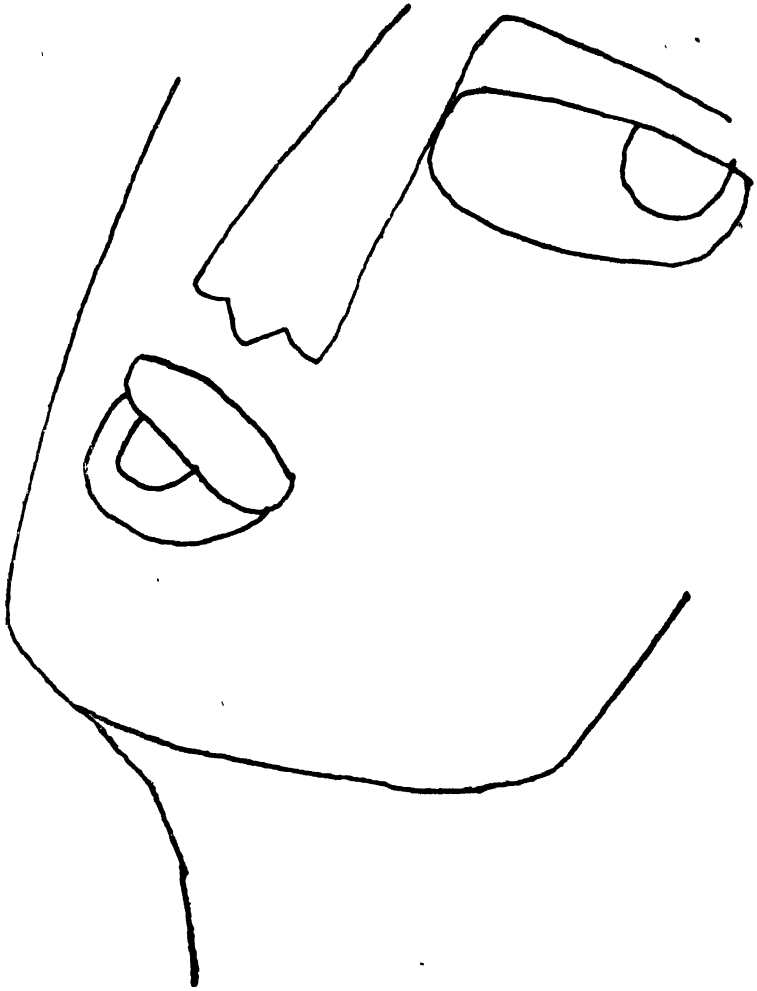
চমকে উঠলাম গাড়ির ঝাঁকানিতে। ঘুমটা ভেঙে গেল, সোজা হয়ে বসলাম। বৈজু সামনের দিকে চোখ রেখে বলল, 'একঠো শেয়াল, চাপা পড় গয়া।'

যাক, শিয়াল মরেছে একটা। শিয়ালরা তো খুব ধূর্ত হয়। ব্যাটা এই ফাঁকা রাস্তায় গাড়ি-চাপা পড়ল কী করে। বোধহয় অতি চালাকির জন্য। আলো দেখে ও ভেবেছিল, ঠিক রাস্তা পার হয়ে যাবে। যাও বাবা, একেবারে শেষ রাস্তা পার হয়ে গেছ। আর কোন ঝুট ঝামেলা পোয়াতে হবে না।

দেখি তো, নায়ক-নায়িকা কী করছে। মাঝখানে ঘুম ভেঙে তো, ছু-জনের কথাবার্তা শুনতে পাচ্ছিলাম। উশীনরটা হয় ভীষণ ধড়িবাজ, না হয় যাকে বলে বাঘা ভদ্রলোক, তা-ই। পয়েন্ট ব্ল্যাংক ওই কথাটা ময়নাকে বলে দিল যে, সিগারেটের ব্যাপারটায় ও সত্যি মনে করেছে, ওর ভাল লাগে নি। কিন্তু কথাটা কতখানি সত্যি। আমার তো বিশ্বাস হয় না মেয়েদের ব্যাপারে, উশীনর এতটা তপস্বী মানুষ। আমি তো তার সম্পর্কে কিছু কিছু খবর রাখি। কোন মেয়েকেই যে আজ অবধি জপায় নি তা না। বেশ ঘোড়েল লোক। একদিক থেকে বলতে গেলে উশীনরের ওপর আমার রাগ থাকা উচিত। তবে, লোকটার ওপর রাগ করতে পারি না। কলমের জোরটা জবর, নাটকের জুড়ি নেই। কিন্তু রঞ্জাবতীর কাছে, উশীনর সম্পর্কে আমি অনেক কথা শুনেছি। উশীনর রঞ্জাবতীর বন্ধু ছিল। এখনো মাঝে-মধ্যে, ছুজনের দেখা-সাক্ষাৎ হয়। রঞ্জাবতীর কথা থেকেই বুঝতে পারি, ছুজনের মধ্যে, এক সময়ে বেশ ভালই ভাব ছিল। এখনো রঞ্জাবতী, উশীনরের কথা বলতে গেলে, কেমন যেন হয়ে যায়। রঞ্জাবতী বলবে না বলবে না করেও, অনেক কথাই বলে দিয়েছে। রঞ্জাবতীর সঙ্গে, বেশ কিছু দিন আলাপের পরে, উশীনর নাকি হঠাৎ একদিন, বেশ রাত্রি করে, ওর বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত। তার আগে, রঞ্জাবতী উশীনরকে অনেকবার ওর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করেছে, উশীনর নিমন্ত্রণ রাখতে পারে নি। তারপরে হঠাৎ এক রাত্রে যখন উশীনর গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, রঞ্জাবতী অবাক হয়েছিল। রঞ্জাবতীর ভাষায়, 'উশীনরকে আমার কিছুটা ড্রাংক মনে হয়েছিল, কিন্তু তাকে যেন কেমন রহস্যময় একটা লোক বলে মনে হয়েছিল।'

রহস্যময়। বোঝ ঠ্যালা, মাঝরাত্রে একটা লোক মাতাল হয়ে এল, তাকে দেখে রহস্যময় লোক বলে মনে হয়েছিল। উশীনর কী কী বলেছিল, সব কথা রঞ্জাবতী বলে নি, তবে রঞ্জাবতী তাকে বাইরের থেকেই বিদায় করে নি, ঘরে নিয়ে গিয়েছিল। রঞ্জাবতীর মত মেয়ে। উশীনর নাকি বলেছিল, 'কেন এলাম, এটা ব্যাখ্যা করতে পারব না, কিন্তু না এসে পারলাম না, যদি বিরক্ত হন, তাহলে এখনই বিদায় হই।'

রঞ্জাবতী তা পারে নি। এমন কি, অত রাত্রে, উশীনরকে ড্রিংকস্‌ও অফার করেছিল। কে জানে, গোটা রাত্রিটাই উশীনর ওর বাড়িতে ছিল কী না। রঞ্জাবতী তো না বলবেই, কিন্তু সেই রাত্রের পর থেকে, রঞ্জাবতী-উশীনরকে প্রায়ই এদিক-ওদিক ঘোরাফেরা করতে দেখা যেত। রঞ্জাবতীর বাড়িতে, উশীনরের প্রায় নিয়মিত যাতায়াত ছিল। অনেকে এমন কথাও বলত, উশীনর বিবাহিত না হলে, রঞ্জাবতীকে বোধহয় বিয়েই করে ফেলত।

রঞ্জাবতীর কথা থেকে বুঝতে পারি, উশীনর নিজে থেকেই আস্তে আস্তে, একটু দূরে সরে গিয়েছে। কিন্তু আমি সেটা ভাবি না। আমি ভাবি, উশীনর হঠাৎ একদিন বেশি রাত্র করে, রঞ্জাবতীর বাড়িতে উঠেছিল কেন। নিশ্চয় কিছু একটা ভেবে-চিন্তেই গিয়েছিল। ঝোঁকের মাথায় কেন চলে গিয়েছিল, তা নাকি উশীনর জানে না, এ কথা আমি মরে গেলেও বিশ্বাস করি না। নিশ্চয়ই একটা কিছু বুঝেছিল, আর ওসব বোধহয় উশীনর বেশ ভালই বোঝে। বাঘের মত ব্যাপার। ঠিক কখন কী ভাবে কোনখান দিয়ে গেলে, শিকারকে নির্ঘাৎ ধরা যাবে, এ পলিসি নিশ্চয়ই জানা আছে। কই বাবা, আমি তো জীবনে কোনদিন ওরকম কিছু করতে পারি নি। এ যেন ভিনি ভিডি ভিসি, এলাম দেখলাম জয় করলাম। সেজন্যই ভাবছিলাম, উশীনর ধড়িবাজ না হয়ে যায় না। তুক-তাক জানা আছে।

এই যে ময়নাকে এভাবে চুপসে দিল, আমার মনে হয়, এর মধ্যেও উশীনরের কোন মতলব আছে। আমার ঘুমটা তো মাঝখানে ভেঙে

গিয়েছিল, ওদের কথাতেই। এদিকে তো, খুব ভাল করে, গায়ে চাদর টাদর মুড়ি দিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, তারপরেই যেই কথা উঠল, একেবারে সোজা আঘাত। মারাত্মক লোক, শাহেন শা বলতে হবে। ও হয় ময়নাকে গাঁথবে, না হয় কোন ব্যাপারই নেই। কিন্তু তা-ই কী? যত দূর জানি, উশীনর তো ছেড়ে দেবার লোক না। শুধু রঞ্জাবতী বলে কথা না, প্রায়ই তো অনেক কথা তার নামে শোনা যায়। হোটেল ক্যাবারে বারে, প্রায়ই তো উশীনরকে নাকি কারোর না কারোর সঙ্গে দেখা যায়। অচেনা নতুন নতুন মেয়ে নাকি তারা। লোকটার কি কলগার্ল নিয়ে চলাফেরার অভ্যাস আছে নাকি। আমি নিজে অবিশ্যি কোনদিনই কিছু চোখে দেখি নি, শুনেছি।

যাকগে, আমার তাতে কী এল গেল। প্রথমে দেখেছিলাম, ময়না আর উশীনর, দুজনেই সমান চলাচ্ছে। আমার তো মনে হয়েছিল, ওরা পার্টি হয়ে গিয়েছে। ময়নার যে, উশীনরকে বেশ ভাল লেগেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমি ময়নাকে জিজ্ঞেস করে, সে কথা জানতেও চেয়েছিলাম। এমন কি, এরকম একটা আঁচও দিয়েছি, উশীনরকে যদি ও খুশি করতে পারে, তাহলে হিরোইনের চান্সটা হয়তো পেয়ে যেতে পারে। কিন্তু কাঁচকলা। উশীনর যদি বলেও, আমি বাগড়া দেব, যাতে অলক রাজী না হয়। অবিশ্যি, উশীনরকে নিয়ে এখন অলক ক্ষেপে আছে। উশীনর কিছু বললে, অলকের মাথায় গেঁথে যেতে পারে। শালা, একেবারে মাথামোটা আমার মনিবটি।

লোকটা ভাল, তবে নিজের তালেই আছে। যদিও, স্টেজ আর নাটকের ব্যাপারে, আমাকে খুবই মানে। সেদিক থেকে, আমার বলার কিছু নেই। আমি যেমন দিয়েছি, আমাকেও সে দিয়েছে। মনে হয়, অলক আমাকে মনে মনে একটু ভালবাসে, পছন্দ করে, বিশ্বাসও করে। অথচ আমার নামে লোকে ওকে কত কী বলেছে। এ ব্যাপারে, পুরো একরোখা। কারোর কথাই শোনে না। ওর নিজের মনে ব্যাপারটা লেগে গেলেই হল। নিজের বোঝাটাকে,

কতগুলো দিক দিয়ে, ও যথেষ্ট দাম দেয়। আমাকে শুধু যে ছাড়ে নি, তা না, বলতে গেলে, অলক এখন আমার বন্ধুই হয়ে গিয়েছে। আমার কাছে ওর কোন গোপনীয়তা নেই। সেটাই আরো অনেকের কাছে চক্ষুশূল। সেইজন্যই এত লাগানি-ভাঙানি। কিন্তু কিছুই করতে পারবে না।

আমরা নেহাত 'আপনি' 'আপনি' বলে কথা বলি, কোনদিন হয়তো 'তুমি' হয়ে যাব। খুব বেশী ড্রিংক করলে, প্রায়ই তো অলক আমাকে 'তুমি' করে বলতে আরম্ভ করে। তবে, আমার পেছনে লাগতে ছাড়ে না। সেটাও আসলে, আমাকে বন্ধুর মত মনে করে বলেই। উশীনরের নাটকের কথা, অলককে আমিই বলেছি। তখন অবিশ্যি জানতাম না, উশীনর তার বন্ধু। জানলেও আমার কোন আপত্তি ছিল না, কারণ উশীনরের প্রতিভাকে আমি কিছুতেই অস্বীকার করতে পারি না। উশীনর অন্যদিকে যা-ই করুক, এ ব্যাপারে উশীনরকে বলবার কিছু নেই। হেইল উশীনর, হি ইজ গ্রেট। হয়তো, মেয়ে পটানোতেও, কিন্তু ময়নাকে সে হিরোইন করতে চাইলে আমি বাধা দেব।

কিন্তু এ কথাটাই বা আমি ভাবছি কেন। ময়না হিরোইন হলে, আমার আপত্তি কোথায়। কেনই বা থাকবে। ময়নার মধ্যে হিরোইন হবার গুণ নেই, তা নয়। দেখতেও খারাপ না, সুপর্ণার থেকে রূপ কম নয়। 'কিন্নরী' যদি আজ নতুন কাউকে, প্রথম হিরোইন হিসাবে পরিচিত করায়, তার পক্ষে দাঁড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা খুবই আছে। অবিশ্যি, নিজের এলেম দরকার, কেবল মাত্র 'কিন্নরী'র গুড উইল ভাঙিয়ে, জনসাধারণের মন পাওয়া যাবে না।

না, ময়নাকে আমার হিরোইন করতে আপত্তি নেই। কিন্তু সেটা 'আমি' করতে চাই, আর কেউ না। উশীনরের রেকমেণ্ডেশনে না। অলকের আপত্তি থাকলে, তর্কাতর্কি ঝগড়াঝাঁটি করেও, ময়নাকে আমি নামাব। কিন্তু আমিই নামাব। তবে হ্যাঁ, তাতে উশীনরের সম্মতি থাকলে, ভাল হয়। সেই কথাটাই আমি

ময়নাকে তখন বোঝাতে চেয়েছিলাম।

আসলে তখন ময়নার কাছে, গাড়ির জানালায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম কেন? উশীনরের সঙ্গে, ওর কতখানি জমেছে, সেই কথা জানবার জন্য? সেটা কি ময়নার বলার অপেক্ষা ছিল? আমি তো সবই দেখছিলাম, ওদের কথাবার্তা সবই শুনছিলাম। তাতেই বোঝা যাচ্ছিল, দুজনের মধ্যে কতখানি জমেছে। তবু আমার একটু চানকে দেখতে ইচ্ছা করছিল ময়নাকে। তার থেকেও সত্যি কথা নিজের কাছে কবুল কর না বাপু, উশীনরের সঙ্গে, এতটা ভাব জমাতে দেখে, তোমার মেজাজটা ভেতরে ভেতরে একটু বিগড়ে গিয়েছিল। জেলাসি যাকে বলে। হ্যাঁ, অত কিসের। আমি এতদিনের পুরনো চেনাশোনা লোক। অলক এতদিন ধরে, ময়নাকে কায়দা করার জন্য, এত কাঠ-খড় পোড়াচ্ছে, আর কোথা থেকে উশীনর এল, আর উশীনরের কোলে যেন মেয়েটা একেবারে ঢলে পড়ল। সেই জন্যই তো তখন আমি ময়নাকে ধমকে উঠেছিলাম বীয়র খাওয়ার ব্যাপারে। এদিকে ঘোমটার মধ্যে খ্যামটা নাচে, ওদিকে সতীপনা দেখানো হচ্ছে। আমার ভীষণ রাগ হয়ে গিয়েছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম, আসলে উশীনরের কাছে সতী সাজা হচ্ছিল। তা-ই আমি কখনো হতে দিই! উশীনর যাতে বুঝতে পারে, ময়না কেমন মেয়ে, বুঝে যাতে সরে যায়, বেশি আশকারা না দেয়। তাতে অবিশ্যি খুব সুবিধা হয় নি জানি। তাছাড়া, একটা মেয়ে ড্রিংক করে, এ কথা জানলেই যে উশীনর কেটে পড়বে, এমন কোন কথা নেই। উশীনর রঞ্জাবতীর বন্ধু, মেয়েদের ড্রিংক স্মোকে ওর কিছু যায় আসে না, বরং ভালই বাসে বোধহয়।

তবে হ্যাঁ, আমি তো বলেইছি, উশীনর শাহেন শা লোক। ওর শুধু মেয়ে-পটানো চেহারা না, মেয়ে পটাতেও পারে। আমার কথা বাদ, আমি মেয়েদের নিয়ে বেশিক্ষণ র‍্যালা করতে পারি না। প্রেম করতে যে ইচ্ছা করে না, তা না, কিন্তু ব্যাপারটাতে বড় ধৈর্যের দরকার। আমার এত ধৈর্য নেই। নাটকের ব্যাপারে আমাকে

সারা দিন-রাত্রি থাকতে বল, আমি পারি। ওটা আমার পেশার থেকে, নেশাটাও কম না। সেই হিসাবে, আমি নাটকের প্রেমে পড়েছি বলা যায়। কিন্তু প্রেমে আমার এত ধৈর্য নেই, যেরকম একটা নাটক মনোমত না হওয়া পর্যন্ত আমি শান্তি পাই না, প্রেম নিয়ে আমার এত মাথাব্যথা নেই। তবে হ্যাঁ, প্রেম করতে ইচ্ছা করে। অথচ ইচ্ছা করলেই প্রেম করা যায় না। এই যে করা যায় না, আর তার জন্য লেগে থাকা, ওইটেই পারি না। আমার থেকে অখাদ্য আবার অলক। এমনই ওর উল্লুকের মত চরিত্র আর ব্যবহার, কোন মেয়েই ওর কাছে ঘেঁষতে চায় না। ওর থেকে আমার ধৈর্য বেশি। তা ছাড়া, আমি মেয়েদের তেমন বুঝতে দিতে চাই না, তাকে আমার ভাল লেগেছে না মন্দ লেগেছে। এমন একটা ভাব করে থাকি, যেন তাকে নিয়ে আমার কোন মাথাব্যথাই নেই। এসব একটু আধটু না করলে চলবে কেন। সব জিনিসেরই তো একটা রকম আছে, সব খেলারই কিছু নিয়ম আছে। আমার কাছে, এ খেলার নিময়টা, এই রকম। কিন্তু অলকটা একেবারে বুদ্ধু। সব ব্যাপারটাই টাকা দিয়ে মেটাতে চায়। টাকার খুবই দরকার আছে, ওটা না থাকলে মেয়েরা আবার কাছেই ঘেঁষতে চায় না। তবে টাকাটা থাকবে, মঞ্চে যেমন নেপথ্য বলে একটা কথা আছে, সেই রকম। থাকতে অবিশ্যিই হবে।

এই যে উশীনর, ওর কি অলকের থেকে বেশি টাকা আছে? নিশ্চয়ই না। একজন ব্যবসায়ীর টাকার কাছে, একজন জনপ্রিয় সার্থক নাট্যকারের টাকা কিছু না। অথচ দেখ, মেয়েটা সেইদিকেই ঝুঁকে পড়েছে। উশীনর কী তুক-তাক করল, ময়না আর সকলের কথা ভুলেই গেল। অথচ উশীনর যে বিশেষ কোন কায়দা-কানুন করল, তাও না। ওটা আসলে কপাল, এক একটা লোকের মেয়ে-কপাল থাকে এরকম। থাকুক, কিন্তু আমার মেজাজটা কেমন বিগড়ে যাচ্ছিল। আমি যে তখনই ময়নার সঙ্গে প্রেম করার জন্য ক্ষেপে উঠেছিলাম, তা না। আমার সঙ্গে ময়না কোনদিন প্রেম করে নি,

কোনদিন করবে, তাও ভাবি নি। তবু, মেজাজটা খারাপ হয়ে উঠেছিল। ময়না যদি অলকের সঙ্গে খুব ভাব জমিয়ে ওরকম করত, তাহলে আমার মেজাজ খারাপ হতো না মনে হয়। উশীনরের সঙ্গে ভাব জমেছিল বলেই, আমার মেজাজ খারাপ হয়েছিল।

কিন্তু, শুধু এই কারণেই কি আমি তখন ময়নার কাছে জানালার ওপর ঝুঁকে পড়েছিলাম? অন্য একটা ঝোঁক কি আমার মধ্যে তখন আসে নি? এসেছিল, শান্তনু গাঙ্গুলী, সেটাই কবুল কর, তখন হঠাৎ তোমার একটা ঝোঁক এসেছিল, ময়নাকে জড়িয়ে ধরে, তুমি একটা চুমো খাবে। সেটা মদের ঝোঁকে না। মদের ঝোঁকে ময়নাকে আমি অনেকদিন দেখেছি। এরকম মনে হয় নি। ময়নাকে দেখে যে কখনো কিছু মনে হয়নি, তা না। সেটা মিথ্যা কথা বলা হবে। তু-একবার এরকম হয়েছে, ময়নাকে দেখতে দেখতে, আমার ভেতরে কেমন গোলমাল হয়ে গিয়েছে। গোলমাল হওয়াটা কিছু আশ্চর্য না। ওর যা চেহারা, স্বাস্থ্য, চোখ-মুখের গড়ন আর ভঙ্গি, তাতে ওকে দেখে গোলমাল হওয়াটা কিছুই আশ্চর্যের না। তবে ওকে আমি খুবই ছেলেমানুষ বয়স থেকে দেখে আসছি, তাই, ওকে নিয়ে, সেরকম কিছু ভাবি নি। কিন্তু তু-একবার, ময়নাকে একলা পেয়ে, কেমন যেন হয়ে গিয়েছে, একটা গোলমাল যাকে বলা যায়। ময়না কি সে-সব কখনো বুঝতে পেরেছে? মনে হয় না। আমাকে ও সেরকম ভাবে না।

সেটাই তো মজার কথা। লোকে যাকে যা ভাবে, আর ভাবে না, তার মধ্যে আসলে কোন মিল নেই। ময়না আমাকে কোনদিনই বুঝতে পারে নি। আজও না। আজকের ঝোঁকটা, কলকাতায় থাকলে আসত না। কলকাতায়, অনেকবারই আমার টিপ্‌সি অবস্থায় ময়নাকে কাছে দেখেছি, আজকের মত এরকম ঝোঁক আসে নি। সেটা কি কলকাতার বাইরে, রাস্তার ধারে, ওরকম অবস্থার জন্য, নাকি উশীনরের সঙ্গে ময়নার বেশি ভাব জমে যাওয়ায় ঝোঁকটা এসেছিল, জানি না। ময়নাকে আমার ভালবাসতে ইচ্ছা করছিল।

ভালবাসা, ওই আর কি, ময়নাকে পেতে ইচ্ছা করছিল, ওকেই তো ভালবাসা বলে। আমি তো তা-ই বুঝি।

অবিশ্যি, এ ঝোঁকটা সে ঝোঁক না, রঞ্জাবতীকে দেখে যেমন আমার হয়েছিল। সেটা আমার জীবনের একটা ব্যাপার বটে। সোনার সঙ্গে তখন আমার সবে ছাড়াছাড়ি হয়েছে। সোনা, সেটাও একটা ঘটনা। সোনা আমার জীবনে প্রথম মেয়ে, তা বলব না। কিন্তু আমার জীবনে মেয়ে বলতে, চিরকাল আমি সোনাকেই বুঝব। এই ময়নার দিদি সোনা। আমাকে কোন মেয়ে কোনদিন ভালবাসে নি, বাসবেও না, সোনা ছাড়া। তাই মাঝে মাঝে আমার মনে হয়, সোনার অভিশাপে, আমার গায়ে বোধহয় কুষ্ঠও বেরোতে পারে। আমার জীবনে যে-কোন রকম ক্ষতি হতে পারে।

আমার তখন উঠতির সময়। চারদিকে আমার নাম ছড়াতে আরম্ভ করেছে, আমার তৈরি গোষ্ঠী তখন বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। তখন আমিও অভিনয় করতাম। আমার চেহারাটা বরাবরই আমার শত্রুতা করেছে, যে কারণে আমাকে অভিনয়টা ছেড়ে দিতে হল। আমার অভিনয়ের গুণটা সকলেই মেনে নিয়েছিল, আমার চেহারাটাকে মেনে নেয় নি। পহলে দর্শনধারী, ইসকে বাদ গুণ বিচারি। আমার বেলায় কথাটা খেটে গিয়েছে। অবিশ্যি, ভাল চেহারা নিয়েও, অনেক মাকাল ফল আছে। চেহারার জন্য, আমি নিজেই অভিনয়টা ছেড়ে দিয়েছি। একেবারেই যে করি না, তা না। আমাকে মানায়, সেরকম ভূমিকাতেই করি। তবে সেটা আমার নিজস্ব গোষ্ঠীর মধ্যে। পাবলিক বোর্ডে না, অর্থাৎ 'কিন্নরী'তে আমি কখনোই অভিনয়ের কথা ভাবি না। না করাটাই ভাল, তাতে অভিনেতাদের প্রতি আমার নির্দেশ বেশি খাটে।

যাই হোক, তখন আমি উঠছি, আমার গোষ্ঠী উঠছে, আমি সারা বাংলাদেশ তো বটেই, দিল্লী-বোম্বাইও করে বেড়াচ্ছি। সে সময়েই সোনা এসেছিল আমাদের দলে। তখন সোনার ওপর আমার কণামাত্র নজর ছিল না। একটা মেয়ে এল, চেহারাটা ভাল, গলাটা

মিষ্টি, অভিনয়ও মোটামুটি করতে পারে, বুঝেছিলাম, ইচ্ছা আছে মেয়েটার মনে। প্রথমে একটা ছোট রোলে ওকে নেওয়া হয়েছিল। কাজ দেখিয়েছিল ভালই। পরের নাটকে ওকে আরো বড় রোল দেওয়া হয়েছিল। আমার গোষ্ঠীতে যাই হয়, সবই আমাদের কমিটি সিদ্ধান্ত করে। আমার একার ইচ্ছাতেই সব কিছু হয় না। তবে, সবাই আমার মতামতের দামটা বেশি দেয়। তার কারণ, আমার এখানে যেমন কোন ফাঁকি নেই, তেমনি আমি পক্ষপাতিত্ব একেবারেই করি না। সকলের ইচ্ছাতেই, সোনাকে একটা বড় রোল দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু একটা জিনিস আমি বুঝতে পারছিলাম, স্বাস্থ্যবতী চটকদার মেয়েটাকে নিয়ে, নানাভাবে গোলমাল করার চেষ্টা চলছে। অনেকেরই টাঁক তখন সোনার ওপরে। সকলেই খাওয়াতে নিয়ে যেতে চায়, কেউ বেড়াতে নিয়ে যেতে চায়। বাইরে সোনার পরিচিত লোকের সংখ্যা অনেক। ওকে অনেকের সঙ্গে দেখা যেত নানান জায়গায়, হোটেলে বারে, যাতায়াত করত। নষ্ট হওয়া বলতে যা বোঝায়, সেই পথেই ও চলছিল। অভাব তার একটা মস্ত বড় কারণ, আমি বুঝতে পারছিলাম। ওরকম ব্যাপার যে অন্য মেয়ের মধ্যে আমি দেখিনি, তা না। কিন্তু সোনার দিকে আমার লক্ষটা একটু বেশিই পড়েছিল।

আমার লক্ষই বা বলি কেন, সোনা নিজেই আমার লক্ষ টেনে নিয়েছিল। একটা ব্যাপার পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম, সুযোগ পেলেই ও আমার কাছে কাছে থাকবার চেষ্টা করত। আমার যখন যেটা দরকার, হাতের কাছে এগিয়ে দিত। আমি কিছু নিতে ভুলে গেলে, হাতে তুলে দিত। যখন ট্রুপ নিয়ে বাইরে যেতাম, ও আমাকে সব সময় দেখাশোনা করত। আমি কখন কী খাব, কখন খাওয়া উচিত, নাওয়া উচিত, অন্য কারোরই তা নিয়ে মাথাব্যথা ছিল না। কিন্তু সোনার ছিল। সবাই খেয়ে শুয়ে পড়লেও, সোনা আমাকে না খাইয়ে শুতে যেত না। সোনা এমন ভাবে আমার কাছে কাছে

থাকত, আমার সব কিছু দেখাশোনা করত, সত্যি বলতে কি, আমি বেশ খানিকটা ওর ওপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলাম। এমনভাবে নির্ভরশীল হয়ে পড়েছিলাম যে, প্রয়োজনের সময় ওকে কাছে না পেলে, রীতিমত চেঁচামেচি করতাম। সোনার যে আর একটি জগৎ আছে, আরো অনেক লোক আছে, বাইরে ঘোরাফেরার ব্যাপার আছে, সে সব আমার মনে থাকত না। তা ছাড়া সোনা বাইরে, ইনডিভিজুয়ালি নাটকও করতে যেত। আমার চেঁচামেচি করলে চলবে কেন।

তখন মনে হয়েছিল, সোনাকে না হলে আমার চলবে না। আমাদের ইউনিটও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিল। সেই সময় থেকেই আমি মাঝে মাঝে সোনাদের বাড়ি যেতে আরম্ভ করেছিলাম। সোনার সম্পর্কে আমি সচেতন হয়ে উঠেছিলাম। সোনাও সচেতন হয়ে উঠেছিল। সোনা সচেতন আগে থেকেই ছিল। সেইজন্যই বলছিলাম, সোনাই একমাত্র মেয়ে, যে আমার জীবনে নিজে থেকে এসেছিল, আমাকে বুঝতে চেয়েছিল, আমার প্রয়োজনে লাগতে চেয়েছিল, আমাকে সেবাযত্ন করত। আমি এমন কিছু একটা অসাধারণ মানুষ না। আমার ভাল লাগত। সোনার বিষয়ে তাই আমি সচেতন হয়েছিলাম। আমি নিজেই তখন সোনাকে নিয়ে এদিকে ওদিকে যেতাম, আর কারোকে বিশেষ কাছে ঘেঁষতে দিতাম না। সোনার বাইরের কাজ বন্ধ করে দিয়ে, শুধুমাত্র আমাদের গোষ্ঠীভুক্ত করে নিয়েছিলাম।

তবে, সোনার অযোগ্যতা ছিল না, যোগ্যতা ছিল, সেটা অভিনয় করে, আর গোষ্ঠীর ওপর ওর আস্থা থেকেই প্রমাণ করেছিল। সবাই মিলে ওকে নায়িকা করেছিল। আমাদের দুজনের মনের কথা জানাজানি হতে দেরি হয় নি। সোনা এমন ভাবে, এত বিশ্বাসে আমার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছিল, ওকে আমি বিয়ে করব বলেছিলাম। আমি যে ওকে মিথ্যা কথা বলেছিলাম, তা না। আমার তখন সত্যি মনে হয়েছিল, ওকে আমি বিয়ে করব। ওর সম্পর্কে তখন

আমার প্রচণ্ড আবেগ। অবিশ্যি সেরকম বাড়াবাড়ি আমি কখনোই করি নি। ওর ব্যবহার, আমার ওপর ওর টান, আমার ওপর অগাধ বিশ্বাস, এসব ছাড়াও, ওর রূপ স্বাস্থ্য, সবই আমাকে ওর দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। সোনা এতটা বিশ্বস্ত হয়ে উঠেছিল, সত্যি সত্যি আমাকে ছাড়া ও আর কোথাও যেত না। কারোর সঙ্গে মিশতে ওর ভাল লাগত না। বিয়ের আগেই ও 'যেন একটি নিষ্ঠাবতী বউ হয়ে গিয়েছিল।

এরকম যখন অবস্থা, তখন ওর পেটে বাচ্চা আসে। প্রথম যখন খবরটা সোনা আমাকে দিল, আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম। আমার মধ্যে যে এরকম একটা মন আছে, এটা আমার নিজেরই জানা ছিল না। আমি যেন অবাক হয়ে বলেছিলাম, 'তাই নাকি?'

ও বলেছিল, 'হ্যাঁ। তুমি খুশি হও নি?'

কী জবাব দেব, বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু সোনা বোকা না, ও আমার মুখ দেখেই বুঝতে পেরেছিল, আমি খুশি হতে পারি নি। তবে, ভান করাটা আমারও জানা ছিল তো। ওর কাঁধে হাত রেখে বলেছিলাম, 'খুশি হব না কেন সোনা। আমি ভাবতে পারি নি কী না, তাই অবাক হয়ে গেছি।'

ও বলেছিল, 'ভাবতে পার নি কেন শান্তনু? আমরা যেভাবে মেলামেশা করছি, তাতে এটাই তো স্বাভাবিক। আমরা তো কোন ব্যবস্থাই মানি না আর।'

আমি বলেছিলাম, 'তা ঠিক। আমি একেবারে খেয়ালই করি নি।'

'খেয়াল করতে তোমার ইচ্ছা হয়েছিল?'

আমি আবার এত কথা বলতে পারি না। কেন না, আমি জানি সোনার বুদ্ধি আর কথার সঙ্গে আমি এঁটে উঠতে পারব না। বলেছিলাম, 'যাক গে, খেয়াল যখন করি নি, তখন ঠিক আছে সব।'

সোনা কিন্তু অন্য কথা বলেছিল। বলেছিল, 'তা হলে শান্তনু, আমাদের বিয়েটা রেজিস্ট্রি করে ফেলা উচিত এই বেলা। না হলে যত দিন যাবে, লোকে জানবে, সেটা বড় বিচ্ছিরি।'

আমি তখনকার মত, সোনার কাছ থেকে সরে যাবার জন্য বলেছিলাম, 'ঠিক আছে।'

সরে গেলেও, আমার মনের মধ্যে গোলমাল শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমি যেন ঠিক এর জন্য তৈরি ছিলাম না। সেই প্রথম আমার মনে হয়েছিল, আমি যেন কী রকম জড়িয়ে পড়ছি। অথচ আমি ঠিক তা চাই নি। বিয়ে সংসার সন্তান, এর একটা বাস্তব দিক আছে, সেই দিকটাকে আমার কখনো ভাল লাগে নি। যে কারণে, আমি সংসারে দাদাদের সঙ্গে থাকা একেবারেই পছন্দ করি না। আমি একলা লোক, একলা থাকি। কখনো কখনো দাদাদের বাড়িতে যাই, মায়ের সঙ্গে দেখা হয়। বাবা মারা না গেলে কী হতো, বলতে পারি না। মা আমাকে বলে কয়ে, বা দাদারা বৌদিরা, কেউ-ই আমাকে বিয়ে দিয়ে সংসারী করতে পারে নি।

সংসার বলে যে একটা জিনিস আছে, সেটাকে ভালবাসি না, কারণ আমি যেন কী রকম ভয় পাই ব্যাপারটাকে। মনে হয়, সংসার বলে যন্ত্রটা, মানুষের বোধ বুদ্ধি সব নষ্ট করে দেয়। একটা বিরক্তিকর ব্যাপার। বেশ তো, দলবল লোকজন নিয়ে থাকি, নাটক নিয়ে থাকি, একটা চিন্তা, একটা উত্তেজনা, সব সময় ঘিরে আছে। তার মধ্যে আবার এসব কেন। নিজেকে আমার সংসারে কোনদিনই বাঁধতে ইচ্ছা করে না। জানি না, এরকম মনকে যাযাবর বলে কী না, কিন্তু আমি তো আর পালিয়ে বেড়ানো লোক না, ফাঁকির কারবারও করে বেড়াই না। আমি কাজ করে খাই, আমার কাজকে আমি ভালবাসি, দশজনকে নিয়েই আমাকে চলতে হয়। তার মধ্যে, ছেলেপিলে নিয়ে সংসার আমার ভাল লাগে না। আমি বিবাগীও না, সাধুও না, সেটাও সবাই জানে। কিন্তু আমার মনে হয়, বিয়ে করে সংসার পাতলেই, নিজেকে কেমন যেন ভেজা ভ্যাপসা রদ্দি লাগে।

দিন দুয়েক আমি পালিয়েই ছিলাম সোনার কাছ থেকে। তারপরে বলেছিলাম, 'বিয়েটা রেজিস্ট্রি করব, কিন্তু ছেলেপিলে এখন করতে চাই না।'

কথাটা সোনার লেগেছিল, ও চুপ করে ছিল। কয়েকদিন কাটবার পরেও, আমরা এ বিষয়ে কোন কথা বলি নি। কিন্তু চুপ করে থাকাটা ঠিক হচ্ছিল না, বুঝতে পারছিলাম, তাই বলেছিলাম, 'তা হলে চল একদিন ম্যারেজ রেজিস্ট্রি অফিসে, কাজটা সেরে ফেলা যাক।

সোনা বলেছিল, 'বাচ্চাটা যখন রাখাই হবে না, তখন বিয়ের জন্য তাড়াতাড়ি করে কী লাভ। আগে এটাকেই সরানো যাক।'

আমার পরিষ্কার মনে আছে, সোনার চোখে জল এসে পড়েছিল। ঠোঁটে ঠোঁট টিপে, ও আমার কাছ থেকে সরে গিয়েছিল। আমার মনটা একটু টনটন করে উঠেছিল, একটু থমকে গিয়েছিলাম, কিন্তু মেজাজটাও বিগড়ে গিয়েছিল। ধুত্তেরি তোর নিকুচি করেছে, এখন চোখের জল কান্নাকাটি, এই জন্যে মেয়েদের সঙ্গে মিশতে নেই। একটা না একটা ফ্যাসাদ বাধাবেই। ওসব কান্নাকাটি দেখা আর সামলানো, আমার ভাল লাগে না। বরং, কত তাড়াতাড়ি সোনার ক্যুরেশনটা হয়ে যায়, সেটাই ভাবছিলাম। পরের দিনই আমি ওকে বলেছিলাম, 'তা হলে কোন একটা নার্সিং-হোমের খোঁজ করতে হয়। কত টাকা লাগবে আবার কে জানে।'

কথাগুলো মোটেই মিষ্টি করে বলি নি। তখন জানতাম না, সোনাকে কথাগুলো কতখানি বাজছে। অথচ ওই ব্যাপারই যদি নাটকের বিষয় হতো, আমি এমনভাবে সেটাকে পরিচালিত করতাম, দর্শকদের কাঁদিয়ে ছেড়ে দিতাম। সত্যি, আমরা শিল্পসৃষ্টি করি, অথচ তার সঙ্গে আমরা নিজেদের কখনো আইডেন্টিফাই করতে পারি না। আমাদের সৃষ্টির সঙ্গে, আমাদের নিজেদের জীবনের কোন মিল নেই। সৃষ্টিটাকে আমরা জীবন-ছাড়া করে রেখে দিয়েছি। উশীনর একজন নাট্যকার, ওর নাটক পড়লে বা দেখলে কি, ওকেও আইডেন্টিফাই করা যায়? যায় না। শিল্পসৃষ্টিটাকে আমরা অন্য দিকে সরিয়ে রেখে দিয়েছি, কেবল মাত্র লোকজনকে, তাদের মনের মত করে খুশি করবার জন্য, জীবনের সঙ্গে তার কোন মিল থাকে

না। ব্যাপারটা ভাবতে গেলে জঘন্য। আমার তো মনে হয়, এমন কি আমাদের রূপকথা ছড়া, এ সবেরও জীবনের সঙ্গে বেশ যোগ আছে, ওসবের মধ্যে স্রষ্টাকে আইডেন্টিফাই করা যায়, তার মনকে, তার দুঃখ কষ্ট ইচ্ছা আর পরিত্রাণের ব্যাপারগুলো বোঝা যায়। আর এই যে সব সাহিত্য নাটক সিনেমা, এসবই হচ্ছে এক ধরনের ইচ্ছা পূরণের ব্যবসা।

আমি নার্সিং-হোমের কথা বলেছিলাম বটে, সেরকম উৎসাহী হয়ে ছুটোছুটি করি নি। কারণ আমার মনে হচ্ছিল, সোনার নিজেরই যেন তেমন উৎসাহ নেই, ও বিষয়ে নিজের থেকে কোন কথা বলত না। আমি ভাবতাম, আমাকে ডোবাতে চাইলেও, সোনা তা পারবে না। যা খুশি করুক গে। আসলে আমি একটি পয়লা নম্বরের গাড়ল আর অপদার্থ। আমি যখন ওর সম্পর্কে ওরকম ভাবছিলাম, ও তখন মনে মনে কষ্ট পাচ্ছিল, আমার নির্বিকার ভাব দেখে।

তা না, আসলে ব্যাপারটা তার থেকেও খারাপ। মুখে আমি যাই বলি, তখন সোনার কাছ থেকে আমার সরে যেতে ইচ্ছা করছিল। ও যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল, গম্ভীর, শুকনো, হাসতে জানে না, বুড়ি বুড়ি ভাব, ভাল করে কথা বলে না। তার কারণ, তখন ওর মনের বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গিয়েছে, আমার ওপর সন্দেহ জেগেছে। আর আমি মনে মনে বিরক্ত হয়ে বলতাম, 'আমি কী করব, আমার এখন ছেলেপিলে ভাল লাগছে না! তাতে যা ভাবতে হয়, ভাব গে, আমি জানি না।'...

তারপরে প্রায় পাঁচদিন ওর দেখা পাই নি। আমি মনে মনে একটা ভয় পাচ্ছিলাম! মেয়েটা কী মতলবে আছে, কে জানে। তার বছর খানেক আগেই, এই ময়নার একটা ব্যাপার ঘটেছিল, 'অমরাবতী' বোর্ডের ডিরেক্টরের সঙ্গে। ওটা একটা পাঁঠা। চৌদ্দ বছরের ময়নাকে, মেক-আপ-রুমে রেপ্ করেছিল। সে জন্য আমি নিজে দীনেশের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, পেলে ওকে আমি

সকলের সামনেই জুতো-পেটা করতাম। কিন্তু পাই নি। পরে অবিশ্যি ব্যাপারটা আমি ভুলতেই চেষ্টা করেছিলাম। তা ছাড়া উপায়ই বা কী ছিল! মামলা-মোকদ্দমা করে, জল ঘুলিয়ে লাভ ছিল না। দীনেশই যে কিছু করেছে, এ ব্যাপারে 'অমরাবতী'র কেউ-ই সাক্ষী দিত না।

সোনার সঙ্গে যখন আমার এ ব্যাপার চলছে, তখন আমাদের ইউনিটে ময়না প্রায়ই আসত। পাঁচদিন দেখা না পেয়ে, ময়নাকে জিজ্ঞেস করতাম। ময়না যে ওর দিদির সঙ্গে পরামর্শ করে মিথ্যা বলত, তা বুঝতাম না। ও বলত, 'দিদি ভালই আছে। দু-একদিন বাদে আসবে। আপনাকে কিছু ভাবতে বারণ করেছে।'

পাঁচ দিন বাদে সোনা এসেছিল, আমি বিরক্ত হয়েই বলেছিলাম, 'কী ব্যাপার তোমার, ওটাকে খালাস করতে হবে তো, নাকি বয়ে বেড়াবে দশমাস দশ দিন?'

সোনা আমার চোখের দিকে চেয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে ছিল। তারপর বলেছিল, 'আমার ভাবনাটা আমাকেই ভাবতে দাও শান্তনু।'

'তার মানে?'

'তার মানে, তা-ই। আমার ভাবনা তোমাকে ভাবতে বারণ করছি।'

বলেই ও আমার কাছ থেকে সরে গিয়েছিল, আর আসে নি। বুঝতে পারি নি, নার্সিং-হোমের ব্যাপারটা ও চুকিয়েই, পাঁচদিন পরে, আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল, এবং শেষ দেখা করতে এসেছিল। আসলে ও আমাকে জানাতে এসেছিল, নিজের দায়িত্ব নিজেই নিতে পারে, আর সেই আসাটা ছিল ওর ইউনিটের সকলের কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্যও। সাতদিন পরেই জানতে পেরেছিলাম, সোনা দীনেশের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দীনেশ! যে দীনেশ ওর বোনকে ওই সব করেছে, সেই দীনেশের সঙ্গে ঘুরে বেড়াচ্ছে! আমি ময়নাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ময়না বলেছিল, 'যার যা ইচ্ছা হবে, সে তাই করবে, আমি কী বলব শান্তনুদা।'

তা ঠিক। তারপর দেড় মাস বাদে, সোনা দীনেশের সঙ্গে বম্বে চলে গিয়েছিল। আমি যেন বিশ্বাস করতে পারি নি, মনে হয়েছিল, আমার মাথায় সাপের ছোবল পড়েছে। দীনেশের সঙ্গে! কেন, এ কলকাতায় কি সোনা আর লোক খুঁজে পায় নি! যে-কোন লোকের সঙ্গে গেলেও, আমার এতখানি লাগত না। মনে মনে বলেছিলাম, তার চেয়ে, ক্যুরেট করতে গিয়ে, সোনা মরে গেলেও ভাল হতো। ইচ্ছা হয়েছিল, সোনাকে চুলের মুঠি ধরে নিয়ে আসি। ময়নাকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেছিলাম। ও নির্বিকার ভাবে বলেছিল, 'দিদি যা ভাল বুঝেছে, করেছে।'

যেন ময়নার কিচ্ছু যায় আসে নি, অবাকও হয়নি। না, মেয়েদের মন বোঝা আমার কর্ম না। দিদি চলে গেল ওরকম একটা লোকের সঙ্গে, বোনের তাতে কিছুই বলবার নেই। কী ব্যাপার রে বাবা! আমি বেশ কিছুকাল মনযোগ দিয়ে কাজ করতে পারি নি, সব সময়ে সোনা আমার মাথায় বিঁধে থাকত।

এখন অবিশ্যি অনেকটা কাটিয়ে ফেলেছি, কিন্তু এটা বুঝতে পারি, আমার জীবনে একটি মেয়েই এসেছিল, যে আমাকে, আমার সব কিছুকেই, ভালবেসেছিল। সোনার মত কেউ আমার জীবনে আসবে না। এখন অনুশোচনা হয়, বুঝতে পারছি, এই মুহূর্তে, বুকের কাছটা কেমন টনটন করছে, গলার কাছে কিছু একটা ঠেলে আসতে চাইছে। সংসার ছেলেপিলে, আজও ভাল লাগে না ঠিকই, তবু সোনাকে তো খারাপ লাগে না। প্রেম ভালবাসা যা কিছু, মনে হলে, সোনার কথাই মনে পড়ে। যে-মেয়ে মদ খেত, সিগারেট টানত, সেই মেয়ে, খাবার শেষে পান দিয়ে, টেবিল পরিষ্কার করে, গায়ে চাদর ঢাকা দিতে ভুলত না। এমন কি আর কোনদিন আমার জীবনে আসবে। আসবে না।

রঙ্গাবতী অবিশ্যি অন্য জিনিস, রঙ্গাবতী একটি পরিপূর্ণ সেকস্। আজ ময়নাকে দেখে আমার যে-ঝোঁকটা এসেছিল—এসেছিল বলব না, নতুন করে একটা ঝোঁক যেন এসেছে, রঙ্গাবতীকে দেখে

ব্যাপারটা হয়েছিল আরো অন্যরকম। রঞ্জাবতীর বর্ণনাটা আলাদা করে কিছু দেওয়া যায় না, পায়ের নখ থেকে চুল পর্যন্ত, একটা জ্বলন্ত সেকস্‌, এ ছাড়া আর কিছু বলা যায় না। ও বোধ হয়, মরা মানুষও জাগাতে পারে। মানুষের একটা প্রবৃত্তিকে ধরেই ও নাড়া দিতে পারে, সেটাও সেকস্‌। অবিশ্যি, কথাটা পুরোপুরি সত্যি হল না, কারণ রঞ্জাবতী ভাল অভিনয়ও করতে পারে, এবং রঞ্জাবতী বুদ্ধিমতী। ওর সেকস্‌টা এমন না যে, একটা জিনিসের পরে, আর কিছু থাকে না, ওর সঙ্গে বসে অনেক কথাও বলা যায়। কিন্তু ওর সবকিছুর মধ্যে, প্রধান হল সেকস্‌, এই ব্যাপারে ওকে ডিঙিয়ে যাওয়া যায় না।

রঞ্জাবতী তখন বাংলার বাইরে, বিহারের একটা প্রান্তে, নাটকের জন্য ইউনিটের সঙ্গে। সেবার আমিও ওদের সঙ্গে। ব্যাপারটা ঘটেছিল বেলা তিনটেয়। দুপুরের খাওয়ার আগে, আমি একটু বেশিই জিন খেয়েছিলাম। রঞ্জাবতীর সঙ্গে, তার আগেই আমার আলাপ, ভাব জমাবার চেষ্টা করেছি, তেমন পাত্তা পাই নি। যদিও হাসি ঠাট্টা ইয়ারকি একটু হতো, তেমন কাছে ঘেঁষতে দিত না।

অতিরিক্ত গরমেই, ঘুমোতে পারছিলাম না, অথচ নেশাটা দপদপ করছিল। আমি ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, তারপরে কী মনে হয়েছিল, একটু গাছপালা-ঘেরা, রঞ্জাবতীর জন্য নিরালা আলাদা ঘরের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। প্রথমে দরজায় ঠকঠক করেছিলাম, ভিতর থেকে শব্দ এসেছিল, 'কে?'

আমি কথা না বলে, দরজাটা ঠেলেছিলাম, দরজাটা খোলা ছিল, ঢুকে পড়েছিলাম। দেখেছিলাম, রঞ্জা কাত হয়ে শুয়ে আছে। একটা পায়ের ওপর থেকে শাড়ি অনেকখানি উঠে গিয়েছে, বুকে আঁচল নেই, বড় করে কাটা জামা উপছে যেন ওর বুকের অনেকখানি দেখা যাচ্ছিল। ও জিজ্ঞেস করেছিল, 'এমন অসময়ে কী মনে করে?'

'তোমার সঙ্গে একটু গল্প করতে এলাম।'

ও হেসেছিল, চিত হয়ে শুয়ে পড়েছিল। আর আমার রক্তে

আগুন লেগে গিয়েছিল। আমি সোজা ওর খাটে গিয়ে বসেছিলাম। ও বলেছিল, 'চেয়ারে বসুন।'

বলেছিলাম, 'না থাক, তোমার কাছেই বসি।'

বলেই কাত হয়ে ওর হাত ধরেছিলাম, একটুও সময় না দিয়ে, চুমো খেয়েছিলাম। তখন আমি আমাতে ছিলাম না। ও বাধা দেবার চেষ্টা করতেই, আমি পাশে শুয়ে ওকে একেবারে বুকের কাছে টেনে এনেছিলাম। ও একবার চিৎকার করে উঠেছিল, কিন্তু আমি ততক্ষণে ওকে অনেকখানি আমার শরীরের মধ্যে আটকে ফেলেছিলাম, পাগলের মত বলেছিলাম, 'রঞ্জা প্লিজ, পায়ে পড়ি, আমাকে সরিয়ে দিও না।'

তবুও ও ছটফট করেছিল, আমি ছাড়ি নি। খানিকক্ষণ পরে রঞ্জা আর আমি দুজনেই খাটের নীচে পড়ে গিয়েছিলাম, ছোট টিপয়ে ধাক্কা লেগে, গেলাস জলের বোতল পড়ে গিয়েছিল। রঞ্জা আর আমি, দুজনেই তখন প্রায় নেকেড অবস্থা। কিন্তু দরজার কাছে লোকজনের সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। আমি তাড়াতাড়ি উঠে পড়েছিলাম। রঞ্জাও নিজেকে তাড়াতাড়ি ঠিকঠাক করেছিল। আমি দরজার দিকে এগিয়ে গিয়েছিলাম। রঞ্জা বলে উঠেছিল, 'যাবেন, না, এখানে বসুন।'

গলা তুলে বলেছিল, 'আপনারা ভেতরে আসুন।'

বাইরের সবাই ভেতরে এসেছিল। যেন একদল ক্ষ্যাপা নেকড়ে, আমাকে ছিঁড়ে খেতে চাইছিল। রঞ্জা উত্তেজনার মধ্যে হেসে বলেছিল, 'উনি আমাকে এত ভালবাসেন, মাথার ঠিক রাখতে পারেন নি।'

তখনো যেন ওর কথা ও ভঙ্গিতে সেকস্ ঢেউ দিয়ে উঠেছিল। জিজ্ঞেস করেছিল, 'এখানে পুলিস স্টেশন কত দূর?'

কে যেন বলেছিল, 'কাছেই, বেশি দূরে না।'

রঞ্জা একটু চুপ করে থেকে বলেছিল, 'আচ্ছা, আপনারা যান, আমি দেখছি।'

সবাই চলে গিয়েছিল। রঞ্জা আমার দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসেছিল। আমি মাথা নীচু করে বসেছিলাম। রঞ্জা বলেছিল, 'কি বলেন শান্তনুবাবু, পুলিসের হাতে দিয়ে দেব নাকি?'

বলেছিলাম, 'দাও, কী করতে পারি।'

'আপনার অনুতাপ হচ্ছে না?'

'যদি সত্যি বলতে বল, তাহলে, না।'

'না?'

'হ্যাঁ, কেন না ব্যাপারটা জেনুইন।'

'কী জেনুইন, আপনার ভালবাসা?'

'আমার চাওয়াটা। কারণ এ অপমানের পরে, এটা আর চেপে রেখে লাভ নেই।'

'অপমান কোথায় হল। এতো মাত্র কয়েকজন লোক জানল। এখনো জেলে যান নি, খবরের কাগজে ওঠে নি।'

আমার বুকের মধ্যে যেন একটু কেঁপে উঠেছিল। আমি ওর দিকে তাকিয়েছিলাম। আমি বলেছিলাম, 'তবু আসল কথাটা তো সত্যি।'

'আপনি আমাকে চেয়েছিলেন, না?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু এটা বোধহয় জানেন না, যার যত সেকস্, এনজয়মেণ্ট তত কম। এনজয়মেণ্ট অপরের, আপনার, আমার না। আমার ভাল লাগে না। আমার এই সেকস্ আমাকে কোথাও ইনভলভ্ড হতে দেয় নি। সুখের মাত্রাবোধ আমি এমনই হারিয়ে ফেলেছি, পুরুষের লিমিটেশনকে এখন আমার ঘৃণা হয়, হাসি পায়। যান, আপনাকে আমি পুলিসে দেব না, খবরের কাগজেও রিপোর্ট হবে না, বরং রোজ আমার বাড়িতে আসবেন, চেষ্টা করে দেখবেন, আমাকে কখনো ভাল লাগানো যায় কী না।'

কথাগুলো আমার খুব আশ্চর্য লেগেছিল। পরে বুঝেছি, সমস্তটাই পারভারশন, আমার থেকেও দুরারোগ্য। তবু আমি ওর বাড়ি যেতাম। বসে থাকতাম, কথা বলতাম। লোকেরা কত গল্প

তৈরি করেছে, যেন আমি ভয়ে রঙ্গাবতীর তুষ্টিবিধান করতে যাই। এখন আমরা এক রকমের বন্ধু। প্রায়ই যাই। অনেকে যায়। আর আমার ধারণা, সকলেই আমার মত, রঙ্গার পারভারশনের শিকার।

রঙ্গার কথাগুলো আমি প্রথমে বুঝতে পারিনি। ভেবেছিলাম একটা নিষ্ঠুর বিদ্রূপ এবং ঠাট্টা। তারপরে ব্যাপারটা যত ভেবেছি, বুঝতে পেরেছি, ততই মনে মনে শিউরে উঠেছি। পুরুষের লিমিটেশন বলতে ও কী বুঝিয়েছিল, সেটা আমি এখন বুঝতে পারি। নাটকের ব্যাখ্যা দিয়ে, ব্যাপারটা বোঝানো যায়। ধরা যাক, একটা নাটকের প্রথম দৃশ্যের শুরুই যদি হয় অত্যন্ত নাটকীয় উচ্চগ্রামে, তা হলে পরবর্তী দৃশ্যগুলোকে ক্রমে ক্রমে আরো উচ্চতর ধাপেই উঠতে হবে, অন্যথায় নাটক ঝুলে পড়বে। রঙ্গাবতী হল সেইরকম। ওর শরীর আর মন, অর্থাৎ ওর সেকস্, সবকিছুই এমন একটা উচ্চগ্রামে উঠে আছে, যেটাকে ওঠানো হয়েছে হয় তো ওর ছেলেবেলা থেকেই, এখন কারোর পক্ষেই সেখানে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না। অন্ততঃ রঙ্গার চারপাশে যারা ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেই সব কুশীলবদের পক্ষে, ভূমিকা গ্রহণ করা সম্ভব না। এখন রঙ্গা একটা আশ্চর্য ঝলক, একটা বিস্ময়কর উন্মাদনার ছবি মাত্র, যেটাকে সবাই ধরতে এবং ছুঁতে চায়। অথচ ধরে ছুঁয়েও লাভ নেই। কারণ ওর হাইটের কাছে, সকলের জাতুকাঠি-ই ধরা। এটাকে আমার ভয়াবহ পারভারশন ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। রঙ্গা জ্বলছে, জ্বলবে, অনেকে তাতে পুড়ে মরবে, কিন্তু রঙ্গাকে ঘুম পাড়াতে পারবে না। এ বিষয়ে টশীনরের কাছ থেকে আমার কিছু জানতে ইচ্ছা করে। তার নিশ্চয়ই বিশেষ কোন অভিজ্ঞতা আছে। সে নিশ্চয়ই আমার থেকে, রঙ্গাকে বেশি বুঝেছে, তার বোঝবার ক্ষমতাও বেশি। একটা সুযোগ নিয়ে, ওকে জিজ্ঞেস করব।

কিন্তু আজকের এ ঝোঁকটা সেরকম না। অর্থাৎ রঙ্গার ওপর য রকম ঝোঁক এসেছিল। কোনরকম ক্ষ্যাপামি বা পাগলামি নেই,

তবু ময়নাকে বুকের কাছে জড়িয়ে ধরে একটু আদর করতে ইচ্ছা করছে। ময়নার এখনকার জীবনটা আমি সবই জানি। এখন ও বড় হয়েছে, অনেক পোড় খেয়েছে। ও সতী না, শরীরকে ও সাজিয়ে কেবল বসে নেই, ইচ্ছা মত চলে, শক্ত আঁটি মেয়ে। কলকাতায় থাকলে আমার এরকম মনে হতো না। বাইরে, এরকম একটা জার্নির জন্যই, ঝোঁকটা যেন বেড়ে উঠেছে। ময়নাকে পেতে ইচ্ছা করছে, ভাল লাগছে। তা ছাড়া, উশীনরকে আমার হিংসা হচ্ছিল, সেইজন্য আরো ইচ্ছা করছে।

আমি জানি না, ময়না বিশ্বাস করেছে কী না, ওর দিদির কথাও আমার বড় মনে পড়ছিল। তবে ওর দিদির কথা মনে পড়ে, ওর কথা মনে হয় নি। ওকে ওর মতই দেখেছি, নিজের দেখা যেমন হয়, তারপরে ওর দিদির কথা মনে পড়েছে। ময়নাকে কি এ কথা বলব, 'সোনাকে হারিয়েছি, তোমাকে হারাতে চাই না।' বোধহয় বিশ্বাস করবে না। কিন্তু ওকে পাবার জন্য, মনটা যেন কেমন ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। জানি না, কপালে কী আছে। এখনো তো, বেশ কয়েক দিন আছে, দেখা যাক, ময়না আমাকে নিতে পারে কী না। তবে ওর দিদির কথা কি ও ভুলে গিয়েছে? নিশ্চয়ই ভোলে নি। নাহ্, কলকাতায় থাকলে, এ সব কথা আমার মাথায় আসত না। আর এখন যেন, ক্রমেই ব্যাপারটা আমার মাথায় গেঁথে যাচ্ছে। জানি না, কী হবে। আহ্, কী সুন্দর ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে, আবার আমার ঘুম আসছে। পা-টা সামনের দিকে ছড়িয়ে শুই, চোখ বুজে আসছে।

বৈজু

দোহাই রামজী, আমার যেন ঘুম না আসে। ঘুম এলে, নিজে মরব, একটা লোককেও বাঁচাতে পারব না। গাড়ি নিয়ে কোন গাড্ডায় গিয়ে পড়ব, কে জানে! কিন্তু এসব লোককে তো বোঝানো যায় না, সবাই ঘুমোলে, আর একজনেরও ঘুম পায়। যেমন একজনের

হাই উঠলে, আর একজনের হাই ওঠে, নিদ্ জিনিসটা সেইরকম। যে লোকটার নিদ্ যাবার কথা না, তার পাশে সবাই ঘুমোতে থাকলে, তারও ঘুম পায়, এটাই নিয়ম।

এতক্ষণ আমার পাশের এই লোকটা, শান্তনুবাবু যার নাম, জেগে যেন কী খোয়াব দেখছিল। ঘুমিয়েই পড়েছিল, কিন্তু আবার জেগে উঠেছিল, জেগে জেগে, বাইরের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিল। কী ভাবছিল, কে জানে। ড্রামার কথাই ভাবছিল বোধহয়। উনি তো ডিরেক্টর লোক। আমার সাহেবের তো কথাই নেই, ভোর না হলে আর ঘুম ভাঙবে না। ঘুম ভেঙে, ওসব ভাবাভাবির মধ্যে নেই। বহুদিনই তো দেখেছি, কী গাড়িতে, কী বাড়িতে, দারু পিয়ে আর খানা খেয়ে, একবার নিদ গেল তো, আর কথা নেই। তবে খুব সকাল সকাল বাবুর ঘুম ভেঙে যায়।

নতুন বাবু, উশীনরবাবু, ওঁকে আমি এর আগে দুদিন দেখেছি। আমার সাহেবের সঙ্গে ওঁর বাড়িতে এসেছি, তা-ই দেখেছি। বলতে পারি না, বাংলা কথা বুঝতে পারি। তাতে বুঝেছি, উশীনরবাবু ড্রামা লেখেন। আমার তো মনে হয়, ওইটাই আসল জিনিস। নিশ্চয়ই খুব লেখাপড়া জানা লোক। বাতচিত শুনে, ব্যবহার দেখে মনে হয়, আমার সাহেব আর ডাইরেক্টরবাবুর মত না। দুজনে তো সব সময়েই হল্লাহল্লি করছে, কথাবার্তার কোন ছিরি নেই। অবিশ্যি, আমার সাহেব এখানে এরকম। শান্তনুবাবুর সঙ্গেই ওরকম করেন। অফিসে একেবারে আলাদা লোক। তবে হ্যাঁ, সাহেব চেঁচামেচি না করে পারেন না, যখন যাকে যা মুখে আসে বলে দেন। কিন্তু দিলটা ভাল আছে।

এ দুজনের তুলনায়, উশীনরবাবু ঠাণ্ডা, কথাবার্তা ধীর, চালচলন শরিফ। উনিও নিশ্চয় ঘুমোচ্ছেন। ওঁর শরীরের খানিকটা অংশ আমার ভিউ ফাইণ্ডার দিয়ে দেখতে পাচ্ছি, মুখটা দেখতে পাচ্ছি না। পিছনে অন্ধকার আছে বটে, তবে লেড়কীটাকে ঠিক দেখতে পাচ্ছি। সুদীপ্তা ওর নাম। ছুকরি দেখতে ভাল, বয়সও খুব বেশি না। এখন

তো সাহেবের 'কিন্নরী'তে ড্রামা করে। সুপর্ণা, ড্রামার যে হিরোইন, তার থেকে দেখতে খুব খারাপ না, তবে বয়সটা আরো কম এই সুদীপ্তার। এদের কি কোন ভয় নেই? এই দলের সঙ্গে, বেফিকির চলে এল। অবিশ্যি আমার আর এসব ভেবে কী হবে। যাদের যা আদত। ওকে আমি সাহেবের সঙ্গে আগেও দেখেছি, সাহেবের সঙ্গে বড় বড় হোটেলে সরাব খায়, তাও জানি আর সাহেব যে ওকে কেন নিয়ে এসেছে, সেটাও আমি বুঝি। সাহেব তো এক সময়ে বলছিলই, লম্বা জার্নি, একটা মেয়ে না থাকলে ভাল লাগে না। সাহেবের আমার এই একটি ব্যাপার, অওরত, অওরত চাই। আমার তো এক এক সময় তাজ্জব লাগে। এবকম লোকদের কত অওরত চাই। এত অওরতের সঙ্গ করে কী হয়, লাভ কী? ভাল লাগে? কী জানি বাবা, আমি তো ভাবতে পারি না।

আমি তো সাহেবের সঙ্গে সঙ্গেই থাকি। সাহেবের কোন কিছুই আমার অজানা নেই। উনি নিজে গাড়ি চালান না, আর চালান না, সেটাই রক্ষা, তাহলে এতদিনে একটা অ্যাকসিডেণ্ট হয়ে সব খতম হয়ে যেত। এমনিতে যদিও বা একটু আধটু চলতে পারে, সরাব খেলে তো একেবারেই না। আর সারাদিন অফিসের পরে, সাহেবের যখন ছুটি, যখন গাড়ি চালাবার সময়, তখন তো সরাব নিয়েই বসে যান, অওরত কোথাও না কোথাও থেকে ঠিক এসে যায়। সাহেব যেখানে, আমিও সেখানে। তবে, আমি কারোর কাছে, কোন কথা বলি না। সাহেব লোক সোজা, ঘোর-প্যাঁচ নেই। প্রথম নোকরিব সময়ে, আগেই বলে নিয়েছিল, 'তোমার যখন যা দরকার হবে, আমার কাছ থেকে চেয়ে নেবে, কিন্তু খবরদার, কোথাও মুখ খুলবে না। মেমসাহেবের কাছেও না।'

মুখ আমি কোনদিন খুলি নি। খুলবও না। মেমসাহেব আমাকে মাঝে মধ্যে দু এক কথা জিজ্ঞেস করেন, তবে তেমন কিছু না। মেমসাহেবের ইজ্জতের হুঁশ আছে, ড্রাইভারকে সেরকম কিছু জিজ্ঞেস করেন না। হয়তো কোনদিন সাহেব একেবারে বেহুঁশ হয়ে ফিরলেন,

মেমসাহেব আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আজ কোথায় গিয়েছিল সাহেব?'

কোনদিন বলি হোটেলে, কোনদিন বলি, কারোর বাড়িতে। তার বেশি আমার কিছু জানবার নেই, বলবারও নেই। আমার চোখের সামনে তো আর কিছু ঘটেনি, আমি কী জানব। মেমসাহেব তার থেকে বেশি, আমার কাছ থেকে জানতে চান না। বোধহয়, সাহেবের কিছু বলা আছে, যেন, ড্রাইভারের কাছে মেমসাহেব সাহেবের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞাসাবাদ না করে। হুঁশ থাকলে, সাহেব নিজেই অনেক কথা বলে। তবে হ্যাঁ, মেমসাহেব খুব ভালমানুষ। ছেলে-মেয়েরাও বেশ ভাল, আমাকে বৈজুদা বলে ডাকে। তাই আমার মনে একটু কষ্ট হয়। মেমসাহেব যদি কোনদিন জানতে পারে, সাহেবের এই একটা ব্যাপার, তাহলে কী কেলেংকারি কাণ্ডটাই হবে? মনের কষ্টে, মেমসাহেব মরেই যাবে হয়ত।

আমি এত দূর দেশে থাকি, আর কোথায় আমার ঘর। পানপাতিয়ার মা যদি কোনদিন জানত যে, আমি অওরত নিয়ে পড়ে থাকছি, তাহলে তার কী হতো। মনের দুঃখে মরে যেত। গলায় দড়ি-টড়িই দিত বা আর কিছু করত হয়তো। পানপাতিয়ার মা-ও দেখতে বেশ ভাল, আমার এক লেড়কীর মা, কিন্তু এখনো এই সুদীপ্তার থেকেও যেন কাঁচা দেখায়। আমার খুব ভাগ্য, পানপাতিয়ার মা, শ্যামা, একটু লেখাপড়া জানে, আমাকে চিঠি লিখতে পারে। আমার চিঠি পড়তে পারে। সপ্তাহে একটা চিঠি আমাদের বাঁধা। কত কথা যে লেখে শ্যামা, তার মধ্যে একটা চিঠিতে পঞ্চাশবার লিখবে, ঘরের মানুষ ঘরে কবে আসবে। পানপাতিয়া বাবা বাবা বলে ডাকে, পানপাতিয়ার মায়ের দিল চৌপাট হয়ে হয়ে যায়। ঘরের মানুষ দুদিনের জন্য ঘুরে যেতে পারে না?

পাগলি, কী করে ওকে বোঝাব। এমন নোকরি করি, ছুটি পাওয়া মুশকিল। আমার সাহেব হিসাবে গোলমাল করেন না, আট ঘন্টা কাজ হয়ে গেলে, ওভার-টাইম দেন। টাকা আমি বেশি

রোজগার করি, কিন্তু শ্যামার চিঠি পড়লে মনে হয়, একবার গিয়ে ছুটে দেখে আসি, একবার আমার পানপাতিয়াকে বুকে নিয়ে, চুমিয়ে চুমিয়ে পিয়াস মেটাই ; শ্যামাকে আদর করে ভরিয়ে দিই। তা, মরদ মানুষদের এত নরম হলে চলে না। তাকে বাইরের থেকে রোজগার করতে হয়। এমন না যে জমি-জিরেত আছে, থাকলে কে আর কলকাতা শহরে গাড়ি চালাতে আসত। চাষ-আবাদ নিয়ে থাকতাম, শ্যামা পানপাতিয়া সব সময়ে কাছে কাছেই থাকত।

শ্যামা চিঠিতে মাঝে মাঝে বেশ মজার কথা লেখে। অওরতদের মাথায় অনেক কথা খেলে। লেখে, ঘরের মানুষকে (ঘরবালা) একটা শ্লোক দিই, সে যেন আমাকে মানে জানিয়ে দেয়। 'শাওনের বর্ষা ভারী, বীজ ধান বেড়ে যায়, চাষী কোথায় গেলে।' এমনি শুনলে কিছু মনে হয় না। পুরোটা বুঝে আমার রক্তে আগুন লেগে যায়। শ্রাবণমাসে সব সময়েই বৃষ্টি পড়ছে, ওদিকে এক পাশের টুকরো জমিতে বীজ ধান কেবল বেড়েই চলেছে, তুলে এনে চাষী রোপণ করছে না, চাষী গেল কোথায়? হ্যাঁ, জানি, চাষী এখানে সাহেবের গাড়ি চালাচ্ছে, আর চাষের জমির মত, বীজ ধানের রোপণ হবে, তার মুখ চেয়ে বসে আছে শ্যামা। আবার আমাকে একটু ভয় দেখিয়ে লেখে. 'দরিয়াতে খুব টান, নৌকা ছুটে চলেছে, তার মাঝি নেই। নৌকার কী গতি হবে, কোথায় ভেসে যাবে।'

পাগলি, একেবারে পাগলি। ওর কথা আমি সবই বুঝি। যখন দেশে যাই, ও যেন একেবারে পাগল হয়ে যায়। আমিও পাগল হয়ে যাই। ওর তো তবু কোলে এখন একটা মেয়ে আছে, কলকাতায় তো আমার তাও নেই। তবে হ্যাঁ, আমি আবার নিজেকে যতটা ভাল বলছি, তত ভাল না। নিজের কাছে ঝুট টেঁকে না, শ্যামার মত দেশের মেয়ে দেখলে, আমি হাঁ করে চেয়ে দেখি। আমার কিছুই মনে থাকে না তখন।

আমাদের দেশেরই বনোয়ারি খিদিরপুরের দিকে থাকে। ওর বউ এখানে থাকে, শ্যামার বয়সীই হবে। আমি ভউজী বলে ডাকি।

দেশের বাইরে বলেই, ভউজী আমার সঙ্গে কথা বলে, হাসি-মস্‌করা করতে পারে। দেশে থাকলে তা হতো না। বনোয়ারিও কিছু মনে করে না। আমি সুযোগ পেলেই বনোয়ারির বাড়ি যাই, ভউজীর সঙ্গে বসে কথাবার্তা বলি। আমার ওপর ভউজীর একটু নেকনজরও আছে। আমি আবার শ্যামার চিঠির কথা তাকে বলি। সে সব কথা বলতে বলতে, আমাদের দুজনেরই একটু মন তরতরিয়ে ওঠে, চোখে রং লেগে যায়। আমার চোখের দিকে চেয়ে ভউজী বলে, 'দেখ বাপু, আমাকেই শ্যামা করে নিও না যেন।'

আমার থেকে ভউজীর মুখের রাশ বেশি খোলা। এমন সব কথা বলবে, মনে হয়, আমার শরীরটা আগুন ভরতি চুলা। আমি বোকার মত হাসতে থাকি, ভউজী আমার গায়ে ঠেলা দিয়ে, কাছ থেকে সরে যায়। তখন নিজেরই হাত দুটো কেমন করতে থাকে, মনে হয় ভউজীকে হাত ধরে টেনে নিই।

হায়রে বেহায়া, তাও কি তুমি টান নি! সাহেবের মত অওরতের নেশা তোমার না থাকতে পারে, শ্যামার কাছে তোমার কী সত্য আছে? সাহেবের একবার অসুখ করল। সাতদিন বাড়ি থেকে বেরোন নি। আমি একদিন ছুটি করিয়ে নিয়ে বনোয়ারির বাড়িতে রাত্রে ছিলাম। আমিই বাজার দোকান করেছিলাম। মাংস কিনেছিলাম। মাংস আর পরোটা। দারু আমিও মাঝে মধ্যে খেয়ে থাকি। কলকাতার তাড়ি আমার ভাল লাগে না। কোন স্বাদ নেই যেন। এক নম্বর দেশী মদটাই মাঝে মধ্যে ইচ্ছা হলে খাই। না, ইচ্ছার ওপর না, সুযোগ পেলে খাই। সাহেব হয়তো আন্দাজ করেছেন, কিন্তু কোন দিন দেখতে পান নি, কিছু জিজ্ঞাসা করেন নি। বনোয়ারির বাড়িতে এক বোতল এক নম্বর দেশীও এনেছিলাম। আমি আর বনোয়ারি খেয়েছিলাম। বনোয়ারিটা এত ক্ষেপে গিয়েছিল, বস্তির উঠোনে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করেছিল। ভউজী মারতে মারতে ঘরে নিয়ে গিয়েছিল। তবু বনোয়ারি হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়েছিল। আমার থেকে বেশি খেয়েছিল ও। হজম করার তেমন

তাগদ নেই. বেহুঁশ হয়ে পড়েছিল।

ভউজী আমাকে বকেছিল। কিন্তু আমারও মাথাটার ঠিক ছিল না। কেন জানি না, আমার তো চোখ ফেটে জল, বুক ঠেলে কান্না পাচ্ছিল। একটা বেহুঁশ, আর একটা মাতাল, ভউজীর রান্না-বান্না মাথায় উঠেছিল। আমার কান্না দেখে, ভউজী অবাক হয়ে গিয়েছিল, আমাকে ঠাণ্ডা করতে চেয়েছিল। কেন যে তখন ওরকম মন গুমরে উঠছিল, মনে হচ্ছিল আমার কেউ নেই, আমাকে কেউ চায় না, আর ওই সব কথাই আমি বলছিলাম, ফুঁপিয়ে কাঁদতে কাঁদতে। ভউজী তখন আমাকে হাত ধরে ঠাণ্ডা করতে চাইছিল, আর আমি ভউজীকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। ব্যাপারটা যে এমন ঘটতে পারে, আমি একবারও ভাবি নি। আমি ভউজীকে ভোলাবার জন্য ঝুটমুট কাঁদি নি, কান্না তো আমার সত্যি পেয়েছিল, কিন্তু ভউজীকে যখন জড়িয়ে ধরেছিলাম তখন আমি বলেছিলাম, 'ভউজী, তুমি ছাড়া আমার কেউ নেই।'

ভউজী প্রথমটা বোধহয় বুঝতে পারে নি, কী ঘটতে যাচ্ছে। তার অস্বস্তি হচ্ছিল, তারপরে শরীরটা শক্ত হয়ে উঠেছিল, আমার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে চেয়েছিল। আমি আরো জোরে তাকে আঁকড়ে ধরেছিলাম, এলোপাথাড়ি আদর করেছিলাম, ভউজী যেন কেমন হয়ে গিয়েছিল। আমাকে খালি বকেনি, কিন্তু সে-ও কাঁদতে আরম্ভ করেছিল, আর তার কান্না শুনে তাকে ছেড়ে দিয়ে, আমিও বনোয়ারির পাশে শুয়ে পড়েছিলাম।...

যাক গে সে সব ঘটনা। মাঝরাত্রে উঠে আমরা খেয়েছিলাম। পরে ভউজীর সঙ্গে আমার অনেকবার দেখাও হয়েছে, ভউজী আমাকে ঠাট্টা করে অনেক কথা শুনিয়েছে। তাই বলছিলাম, আমিই বা ভাল কিসে। পানপাতিয়ার মা যদি কোনদিন জানতে পারে, তা হলে তার দিল চৌপাট হয়ে যাবে। ভউজী ছাড়াও অনেক যোয়ানী খুবসুরত মেয়ে দেখলে আমার যে নজর আটকে যায় না, বা মনটা কিছু চায় না, তা না। সেটা কি কেবল পানপাতিয়ার মাকে ছেড়ে থাকতে হয়

বলে? কী জানি, তবে আমার তা মনে হয় না। নিজেকে আমার খারাপ মনে হয়, তবু মনকে সামাল দিতে পারি না। সব আদমিরই এরকম হয় কী না, আমি জানি না, দেখে শুনে মনে হয়, অওরত নিয়ে বিলকুল আদমিরই একটু গোলমাল আছে।

তবে হ্যাঁ, আমার সাহেবের মত আমি ভাবতে পারি না। প্রায় রোজই, নতুন নতুন মেয়ে চাই, কারোর না কারোর সঙ্গে, কিছুক্ষণ সময় কাটানো চাই। তাই ভাবি, মেমসাহেব যদি সব কথা জানতে পারতেন, তা হলে কী হতো। মনের দুঃখে বোধহয় মরেই যেত। এই যে ছুকরিকে নিয়ে চলেছেন, (ছুকরি বলছি বটে মনে মনে, মুখ ফুটে বলবার সাহস নেই। নেহাত মনের কথা শোনা যায় না, তাই রক্ষা।) জানি না, কোনদিন সাহেবের সঙ্গে, ওর সেরকম মহব্বত হয়েছে কী না, তবে এবার জরুর একটা কাণ্ড করে ছাড়বেন। তা না হলে নিয়ে আসবেন কেন। এমন কিছু নাম করা অ্যাকট্রেস তো না এ লেড়কি। আমি তো আগে জানতেই পারি নি, এ আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে। সাহেবের সঙ্গে আরো কয়েকবার এ লেড়কি খানা-পিনা করতে গিয়েছে, কিন্তু সাহেবের বোধহয় আশা পূরণ হয় নি। দেখে তো বুঝতে পারি, সাহেবের কাছ থেকে খালি সরে সরে থাকবার চেষ্টা করে। যেন সাহেব ওকে খেয়ে ফেলবে। কেন বাবা, তুমি ড্রামা করতে পার, সিগারেট ফুঁকতে পার, পুরুষের সঙ্গে বাইরে বেড়াতে পার, আর সাহেবের সঙ্গ করতে পার না? মেয়ে যে তুমি ভাল না, সে তো বোঝাই যাচ্ছে। তবে আর এত ছিনালি কিসের। আমার সাহেব কি গোমাংস?

'কিন্নরী'তে সুদীপ্তাকে নিয়ে অনেক কথা হয়, আমি শুনতে পাই। তাতেই বুঝতে পারি, লেড়কির চরিত্র ভাল না। সুপর্ণা, যে হিরোইন আছে, তার ড্রাইভার আমাকে বলেছে, এই লেড়কি, হাফ রেণ্ডি। অতশত আমি জানি না, আর আমার সাহেব যাকে চায়, তাকে নিয়ে আমার কিছু ভাবাও উচিত না। তা বলে, সুপর্ণা হিরোইন-ই বা এমন কী মহাসতী সুলোচনা। ওসব আমার জানা আছে, এ লাইনে

সবই হয়। সুপর্ণাকেই কি থিয়েটারের লোকেরা ভাল বলে, নাকি এ সব লাইনে কেউ ভাল থাকে? সবই তো দেখতে পাই।

এ মেয়েটাকে, সামনা-সামনি এই প্রথম আমি দারু আর সিগারেট খেতে দেখলাম। সিগারেটটা এমন কী খারাপ। আমার বউও একটু-আধটু তামাক খায়, আমার সঙ্গে সিগারেটও খায়, ওটা আমাদের ঘর-গিরস্থিতে চালু আছে। তা বলে দারু চলে না। কিন্তু বাঙালী ভদ্দরলোক অওরতেরা সিগারেট ফোঁকে না। এই সুদীপ্তার মত মেয়েদেরই খেতে দেখি। কী জানি, ড্রামাতে অ্যাকটিং করলে বোধহয় এসব খেতে হয়। মেয়েটার চেহারা খারাপ না, দেখতেও ভাল, আর আমাদের মেহরারুদের মত নাভির তলায় কাপড় পরেছে। তবে আমার আর ওর কথা ভেবে কী হবে। সাহেবের সঙ্গে চলেছে, সাহেবের মেয়েমানুষ। আমি তো ড্রাইভার।

কিন্তু আমার বন্ধুবান্ধব ড্রাইভারদের মধ্যে অনেক কথা হয়। তাতে জানি, অনেক বাড়ির ঝি বহু, ড্রাইভারের সঙ্গে মহব্বত করে। ড্রাইভারের সঙ্গে কাজের অছিলা করে বেড়াতে যায়, মহব্বত সেরে চলে আসে। আমি বুঝি না, সেটা আবার কী রকম সম্পর্ক। অবিশ্যি, হতে পারে এরকম ঘটনা, ড্রাইভার বলে কি সে মরদ না। তবে মন বলে একটা কথা আছে তো। কী করে পারে, কে জানে। আমার মেমসাহেবকে নিয়ে আমি ভাবতেই পারি না। কিন্তু তা বলে কি আর এই লেড়কিকে নিয়ে ভাবতে পারি না? তা পারি। ওর শরীরের দিকে দেখলে, আমার একটু মেজাজ তরর্ হয়ে ওঠে, তাছাড়া ও তো অনেকটা বেওয়ারিশ ভাবের মেয়ে। লেখাপড়া শিখে, টাকা কামাতে তো অনেক মেয়েই বাইরে বেরোয়। এরা যেন একটু অন্যরকম।

কিন্তু আমি ভাবছি, সাহেবকে না হয় বুঝলাম। শান্তনুবাবুর ব্যাপারটা কী? এ লোককে তো আমি বরাবর হাঁকডাক করে কথা বলতেই শুনেছি। নিজের কাজকর্ম নিয়ে থাকে। মহব্বত করার লোক না। অথচ এই সুদীপ্তার সঙ্গে, তখন যে রকম করছিল, ব্যাপার

খুব সুবিধার বলে মনে হল না। কেমন যেন একটু গোলমেলে। আমি শিখ ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলতে বলতে, সবই তো দেখেছিলাম। কতক্ষণ ধরে গাড়ির জানালায়, ছুকরির সঙ্গে কথা বললেন। আবার বাইরে, দুহাত দিয়ে জড়িয়ে ধরছিলেন, গায়ের সঙ্গে সেঁটে দাঁড়াচ্ছিলেন। এদিকে সাহেব ঘুমাচ্ছে। উশীনরবাবু ব্রিজের দিকে চলে গিয়েছিলেন।

কী ব্যাপার, শান্তনুবাবুও সুদীপ্তাকে চান নাঁকি? কলকাতায় থাকতে তো কোনদিন সেরকম দেখি নি। বাইরে বেরিয়ে কি সব গণ্ডগোল হয়ে গেল নাকি? কে জানে, সব ব্যবস্থা হয়তো ঠিক-ঠাক করেই আসা হয়েছে। সাহেব আর শান্তনুবাবু, পালা করে ছুকরিকে নিয়ে ফুর্তি করবে। কিন্তু সব দেখে শুনে, ব্যাপারটা সেরকম মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, মেয়েটা, সাহেব আর শান্তনুবাবু, দুজনকেই দূরে রাখতে চাইছে। তা-ই যদি হবে বাপু, তুই আসতে গেলি কেন? শান্তনুবাবুর কথা জানি না, আমার সাহেব তো তোমাকে ছেড়ে কথা কইবে না, কেউ তোমাকে রক্ষা করতেও পারবে না। ব্যাপারটা জোর-জবরদস্তি হলে, আর তার ওপরে আবার শান্তনুবাবুও যদি জোর দখল করতে চান, মেয়েটার গতি কী হবে।

ধূ-র, যত বাজে চিন্তা। আমি গাড়ি চালাচ্ছি, কোথায় কী কলকব্জা বিগড়াচ্ছে, তাই দেখব। আমার ওসব ভেবে কী হবে। ওদের ব্যাপার, ওরাই ভাববে। তবে হ্যাঁ, আমি এই উশীনরবাবুকে ঠিক বুঝতে পারছি না। ঠাণ্ডা মিঠা আদমি। সুদীপ্তারও দেখছি, বাবুকে খুব পছন্দ। না করার কোন কারণ নেই, উশীনরবাবুর চাল-চলন খুব ভাল। একবারও গোলমাল করতে দেখিনি। ভিউ ফাইণ্ডারে, আমি বরং সুদীপ্তাকেই দেখেছি, উশীনরবাবুকে একটু তাতাতে চাইছে। এখনো দেখতে পাচ্ছি, সুদীপ্তা কোণের দিকে হেলান দিয়ে শুয়ে আছে বটে, কোমরের দিকটা ছড়িয়ে দিয়েছে উশীনর-বাবুর দিকে, একটা হাত এমনভাবে ছড়িয়ে দিয়েছে, বোধহয়, উশীনরবাবুর কোলে গিয়েই পড়েছে। সুদীপ্তা যেভাবে চোখ ঘুরিয়ে

ঘুরিয়ে উশীনরবাবুকে দেখছিল, তাতে মনে হচ্ছিল আমার সাহেব আর শান্তনুবাবুর থেকে তাকেই বেশি পছন্দ।

উশীনরবাবুকে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। প্রথম দিকে, বেশ ভাল করেই, সুদীপ্তার সঙ্গে ভাব জমিয়েছিলেন। তারপরে যেন একটু উদাস ভাব এসেছিল। আবার তো বেশ ভাব দেখা গিয়েছিল। উশীনরবাবুকে আমি যদি ঠিক বুঝে থাকি, তবে এটা ঠিক কথা, সুদীপ্তাকেও ওঁর ভাল লেগেছে। তবে, আমার সাহেব আর শান্তনুবাবুর মত উনি নন। নতুন আলাপ বলে, এরকম হতে পারে। কিন্তু সুদীপ্তা তো, উশীনরবাবুর ওপরেই খুশি, এই চাল-চলনটাই তো কিস্তি মাত বলে মনে হচ্ছে।

হঠাৎ চমকে উঠলাম, কী ব্যাপার! উশীনরবাবু যেন একটু ডাইনে হেলে পড়লেন। ওঁর মুখটা এখন আমি দেখতে পাচ্ছি। চোখ বোজা, ঘুমোচ্ছেন। বোধহয় সেইজন্যেই কাত হয়ে পড়েছেন, আর সোজা হয়ে বসে থাকতে পারছেন না। ঘুমোলে মানুষের কিছু ঠিক থাকে না। শান্তনুবাবুর তো আবার নাক ডাকছে। কিন্তু এ কি, উশীনরবাবুর মাথা যে একেবারে সুদীপ্তার কাঁধের কাছে ঢলে পড়ল। হে রাম, কী দেখতে হবে আবার কে জানে। আমি ঘন ঘন ভিউ ফাইণ্ডারের দিকে দেখতে লাগলাম। অবিশ্যি ভিউ ফাইণ্ডারটাকে, ইচ্ছা করেই আমি এমনভাবে রেখেছি, যাতে আর কিছু না হোক, সুদীপ্তাকে সব সময়েই দেখা যায়। বাহ্! শেষ পর্যন্ত উশীনরের মাথাটা একেবারে সুদীপ্তার কাঁধেই এসে ঠেকল। তৎক্ষণাৎ দেখলাম, সুদীপ্তার চোখ খুলে গেল। পাশ ফিরে ব্যাপারটা দেখল। ঘুমোচ্ছিল ঠিকই, তবু আমার মনে হল, ওর ঠোঁটে যেন কেমন একটু মুচকি হাসি দেখা গেল। তারপরেই ঠোঁট দুটো বেঁকিয়ে, সামনের দিকে একবার তাকাল। ওর মুখটা যেন কী রকম শক্ত দেখাল। চোখ বুজল, আর হঠাৎ উশীনরবাবুকে একটা ঠেলা দিয়ে, বিরক্ত ভাবে বলে উঠল, 'আহ্!

উশীনরবাবু চমকে উঠলেন, তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে বসলেন, আমি

আর তার মুখ দেখতে পেলাম না। কী যেন বললেন বিড়বিড় করে। তারপরে সামনের সীটে মাথা এলিয়ে দিয়ে, দুহাতে সীট জড়িয়ে ধরে উপুড় হয়ে পড়লেন। আমি দেখলাম, সুদীপ্তা আবার আস্তে আস্তে চোখ খুলল, উশীনরবাবুকে দেখল, আবার চোখ বন্ধ করল। আবার যেন ওর ঠোঁটে হাসি দেখা গেল।

এ আবার কী খেলা বাবা! উশীনরবাবুও তাল দিচ্ছেন নাকি? সুদীপ্তা সেইরকম কিছু বুঝেছে বোধ হয়। কিন্তু কী হবে আমার এসব ভেবে। তিনজনেই যদি সুদীপ্তাকে চায়, চাক, আমার কী যায় আসে? একটা কিছু কেলেঙ্কারি না হলেই হল। মেয়েটাই মরল, কিংবা তিনজনে মারামারি করে জখম হল, এরকম কিছু না হলেই হয়। কে জানে, কী ঘটবে শেষ পর্যন্ত। কিন্তু সুদীপ্তা ছুকরিটাকে আমার খুব খারাপ লাগল। যে উশীনরবাবু ওকে এত যত্ন করে চাদর ঢাকা দিয়ে দিল, ভাল করে বসবার ব্যবস্থা করে দিল, তাকেই এমন ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল কেমন করে? উশীনরবাবু ইচ্ছা করে ও-রকম করেছেন কী না, জানি না। মনে হয় না। তা ছাড়া, সুদীপ্তা ওরকম চুরি করে দেখে, ধাক্কা দিয়ে আবার ঠোঁট টিপে হাসছিল কেন। নিশ্চয়ই এর মধ্যে একটা মতলবের খেলা আছে।

যাক, এসব ভেবে আর আমার কী হবে। শিয়াল চাপা পড়াটাই থেকে থেকে, আমার মনের মধ্যে, কী রকম খচখচিয়ে উঠছে। জানোয়ারটা দেখছি, জানোয়ারই। কী করে ভাবল, আমার গাড়ির আগে রাস্তা পার হয়ে যাবে। আমি ওকে ছুটে আসতে দেখেই, ব্রেক মারবার চেষ্টা করেছিলাম। মেরেওছিলাম। যে-কোন ড্রাইভারই তা করে। কোন ড্রাইভার কখনোই কাউকে চাপা দিতে চায় না। এমন কি একটা ইঁদুরকেও না। অথচ কেউ চাপা পড়লে, রাস্তার লোকেরা যে-ভাবে ড্রাইভারকে মারে পেটায়, ওতে আমার মনে হয়, সেই লোকগুলো খুনী ছাড়া কিছু না। হয় তো কোন ড্রাইভারের কিছু ভুলচুক হতে পারে। তার জন্য তাকে খুন হতে

হবে কেন। ভুলচুক কার না হয়। ইচ্ছা করে কেউ ভুল করে না। শিয়ালটা বেশ কেঁদো ছিল। এত ভারী গাড়িও, একটু দুলে উঠেছিল। আর আমি। মরবার আগের মুহূর্তেই, জানোয়ারটার চোখের চাউনি দেখেছি। মনে হয়েছিল, তার সঙ্গে যেন আমার চোখাচোখি হয়েছিল। জানোয়ারটার সেই নজর, এখনো যেন আমার মনের মধ্যে বিঁধে আছে। আর আমি যেন একটা কেমন শব্দ পেয়েছিলাম। ঠিক মরবার আগেই, বা প্রথম রামপারের ধাক্কাটা লাগাবার সঙ্গে সঙ্গেই, ক্যাঁক্ করে একটা শব্দ আমার কানে এসেছিল। জয় রামজী, কৃপা কর! আমার মনের মধ্যে কেমন একটা অশুভ ভাব আসছে! জানোয়ারটার নজর আর গলার আওয়াজ কোনটাই আমার ভাল লাগছে না। আমার মনে হয়েছিল, জানোয়ারটা যেন আমার সঙ্গে এক কিসিমের দিল্লেগি করে গেল। যেন ওর মরাটা কিছু না। ও মরে গিয়ে, আমাকে কিছু ইশারা করতে চাইল। খারাপ কোন ইশারা। হে ভগবান। কী ইশারা ও করতে পারে। আমার পানপাতিয়া, পানপাতিয়ার মায়ের কিছু হয় নি তো। ওরা ভাল আছে তো। সাহেবের মন ঠিক আছে তো। আমার নোকরি চলে যাবে না তো। শিয়ালের এই মরাটা, আমি একটা সাধারণ ব্যাপার বলে মনে করতে পারছি না। গরীব মানুষদেরই বিপদ বেশি। যত খারাপ রাহু, সব তারই জন্য। দোহাই ভগবান, আমাকে কোন বিপদে ফেল না।

আর একটা ব্যাপার। গাড়িটা তখন এত ঝাঁকুনি খেল, শান্তনুবাবু ছাড়া, কেউ জেগে উঠল না। কেন? শান্তনুবাবু অবিশ্যি আমাকে কিছু বলে নি। যেন ওটা কোন ব্যাপারই না। জানোয়ারটা আমার দিমাক খারাপ করে দিয়েছে।

যাকগে, ওসব ভেবেই বা কী হবে। রামজীকে মনে মনে ডাকি।

আকাশ পরিষ্কার হয়ে আসছে। পাহাড়গুলো এবার স্পষ্ট হয়ে উঠছে। রাস্তায় এ দেশের দু একজন লোকও দেখা যাচ্ছে। ভোর

হয়ে আসছে। আবার আমার দেশের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। আমাদের দেশেও, দূরে দূরে পাহাড় দেখা যায়। এখন পানপাতিয়া আর ওর মা কী করছে, কে জানে।—রামজী, ওদের ভাল রেখ।
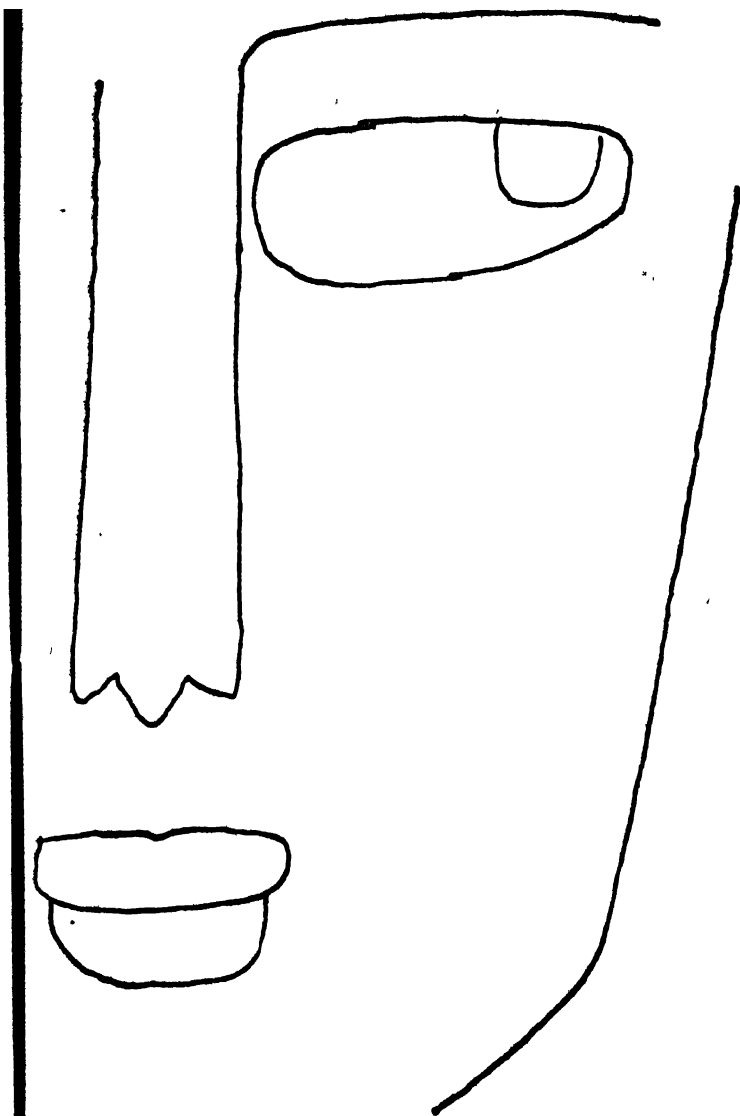
উ শী ন র

একে একে সকলেরই ঘুম ভেঙে গেল। প্রথমে অলকের গলার স্বরই শোনা গেল, 'কী শান্তনুবাবু, খুব তো ঘুমোলেন।'

শান্তনুর ঘুম-জড়ানো মোটা স্বর শোনা গেল, 'বাজে কথা বলবেন না মশাই। সারাটা পথ ঘুমিয়ে এসে এখন আমাকে বলছেন।'

অলক সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'আপনার নাক ডাকার চোটে আমি ঘুমোতেই পারি নি।'

শান্তনুও সিগারেট ধরাল, আমার দিকে ফিরে বলল, 'কী স্যার, কেমন ঘুমোলেন?'

আমি এখন সোজা হয়ে হেলান দিয়ে বসে আছি। বললাম, 'বিশেষ না।'

সুদীপ্তা এখনো চোখ বুজে আছে। ভোরের দৃশ্যটা মন্দ লাগছে না। আদিবাসী মেয়ে-পুরুষকেই এই ভোরে, বেশি চলা-ফেরা করতে দেখা যাচ্ছে। সবাই কাজে যাচ্ছে নিশ্চয়। আমার নতুন দেখা না এসব জায়গা। তবে এ অঞ্চলটাকে ভোরবেলা আমি দেখি নি।

কিন্তু আমার মনটা ভিতরে অশান্ত হয়ে আছে। খানিকটা লজ্জা এবং ধিক্কারের ভাব। রাত্রে কখন এক সময়ে ঘুমের ঘোরে টলে একেবারে সুদীপ্তার গায়ে গিয়ে পড়েছিলাম। এত জোরে সুদীপ্তা আমাকে ধাক্কা দিয়ে, বিরক্তির শব্দ করে উঠেছিল, রীতিমত বেকুফ বনে গিয়েছিলাম, ছি ছি, বড় লজ্জা করছিল। তারপর থেকে আর ঘুমোতেই পারি নি। একটুখানি সময়, তার আগেই যা ঘুমিয়ে নিয়েছিলাম। তারপরে চোখ বুজে এলেই ভয় লাগছিল, আবার হয়তো কোনদিকে টলে পড়ে যাব। আমার মাঝখানে বসাই ভুল হয়েছে। কোনদিকেই, ঘুমন্ত টাল সামলানো যায় না। তার ওপরে বীয়র খেয়েছিলাম, একটা ঝিমুনি ছিলই।

সুদীপ্তা হয়তো ঘুমন্তই ওরকম করেছে, এবং পরে বোধহয় আর ওর মনেই নেই। তথাপি আমার খুবই লজ্জা করছে, আর মনের মধ্যে বিক্ষোভ জমছে। এত জোরে ধাক্কা দেবারই বা কী হয়েছিল। বোঝা উচিত ছিল, সকলেরই তো এক অবস্থা। সুদীপ্তা নিশ্চয়ই জেগে ছিল না, এবং ভাবে নি, ওর গায়ে আমি ইচ্ছা করে ঢলে পড়ব।

কোন মেয়ের গায়ে যদি আমি ইচ্ছা করে ঢলে পড়ি, তবে এরকম একটা সস্তা বোকার মত চালাকি করতাম না। ওরকম ভান বোকারাই করে।

তাছাড়া, সুদীপ্তার গায়ে ঢলে পড়ার মত, আমার মনের অবস্থা আসে নি। রাত্রের প্রথম দিকে, ওকে আমার বেশ ভালই লাগছিল। সব মিলিয়ে ওকে খারাপ লাগার কথা নয়। মাঝে মাঝে ওর কথার জন্য, খারাপ লাগছিল। সুদীপ্তার কথার মধ্যে অনেক অসঙ্গতি, তাতে মনে হয়েছিল, একটু আধটু মিথ্যে কথা বলা বোধহয় অভ্যাস আছে। নিজেকে ও যেভাবে আঁকতে চেয়েছিল, মেয়ে হিসাবে ঠিক তা না। সেটাকে আমি খুব অস্বাভাবিক মনে করি না। ওকে দেখে ওর চোখের গভীরে, একটা দুর্ভাগ্যের ছায়া আমি দেখতে পেয়েছি। এ ধবনের দুর্ভাগ্য যাদের, অথচ প্রতি পদে পদে, নিজের বিষয়ে, অপরকে সচেতন রাখতে চায়, তাদের কিছু মিথ্যার আশ্রয় নিতেই হয়।

সে সব বুঝেও ওগুলো আমি খুব বড় অপরাধ মনে করি নি। ওরকম আমার কিছু দেখা আছে। তাতে, সুদীপ্তার রূপ যৌবন এবং আমাকে ওর ভাল লাগাটা, আমাকে খুশিই করেছিল, কিংবা তার অধিক কিছু, ওর সান্নিধ্য আমার ভাল লাগছিল। মনে মনে একথাও ভেবেছিলাম, সুদীপ্তা এই জার্নিতে এসে ভালই হয়েছে। ওর কিছু আচরণ, গায়ের স্পর্শে আসা, সহজভাবে, এমন কি একটু টলটলানো হয়ে গায়ে পড়া, সবই ভাল লাগছিল, ওর হাত ধরতেও ইচ্ছা করেছিল আমার।

কিন্তু ওর মুখের সিগারেটটা কেন আমাকে খেতে বলেছিল ও? এতটা আমার ভাল লাগে নি, তাছাড়া, সেই মুহূর্তেই মেয়েটাকে কেমন যেন সস্তা আর একটা বিশেষ ধরনের চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। অভিনয় নয় কেবল, অন্য ধরনের পেশা নেই তো? নাকি, বীয়রের নেশাতেই, এতটা ভারসাম্যহীন যে, আমাকে ওর মুখের সিগারেট অফার করেছিল? তারপর থেকে ভাল করে কথা বলতে ইচ্ছা করছিল না। ও যে এত সুন্দর গাইতে পারে, সেটাও তারিফ করবার অবকাশ

পেলাম না, সেই কারণে। তারপরে আবার, যেভাবে আমার হাত থেকে সিগারেট নিয়ে নিভিয়ে দিল, সেটাও আমার ভাল লাগে নি। আমাদের পরিচয়, ভদ্রতার সীমা ছাড়িয়ে, মাত্র বন্ধুত্বের পথে যাত্রা শুরু করেছিল। তার কারণও আর কিছু না, সম্ভবতঃ, এরকম একটা যাত্রায় পাশাপাশি বসে, কথা বলা, বীয়র বা সিগারেট খাওয়া, এবং অবিশ্যিই, উভয় পক্ষের কোথাও একটু ভাল লেগে যাওয়ার জন্যই, যত তাড়াতাড়ি একটু বন্ধুত্বের সূত্র তৈরী হচ্ছিল। কিন্তু সুদীপ্তার আচরণে, মনে হচ্ছিল, আমি ইতিমধ্যেই ওর এঁটো সিগারেট টানার পর্যায়ে এসে পড়েছি। অবিশ্যি সেকথা আমি ওকে পরিষ্কারই জানিয়ে দিয়েছি, এবং ওর আরাম করে বসতে যতটুকু সাহায্য করা উচিত, সবই করে দিয়েছি। কেন না, ওকে আমার এমনিতে খারাপ লাগে নি। আমি ওর সুখ-সুবিধা, যতখানি আমার পক্ষে দেখা সম্ভব, দেখতে রাজী আছি। সেটা, সুদীপ্তা না হয়ে, যে কোন মেয়ে বা পরিচিত পুরুষ হলেও, আমি তা করতাম।

এর সম্পর্কে অলকের কী মনোভাব, তা আমি বুঝেছি। শান্তনু ওর আগেরই পরিচিত, পুরনো চেনা। সম্পর্কটা কী রকম, সঠিক কিছুই জানি না। তবে, ওরা দুজনে, খাবার সময়ে বেশ ঘনিষ্ঠ ছিল, সেটা দেখেছি। দূর থেকে একবার যেন আমার মনে হয়েছিল, ওরা দুজনকে জড়িয়ে ধরেছে। ভুলও দেখতে পারি। কিন্তু তাতে আমার কিছু যায় আসে না। তাতেও ওকে আমার খারাপ লাগার কথা নয়। ও যা, ও তা-ই, ও সুদীপ্তা, রূপসী যুবতী, হাসির ঝিলিকে রঙ ফোটে, চোখে দ্যুতি জ্বলে, এসবই আমার ভাল লাগে। শান্তনুর সঙ্গে প্রেম করলে, অলকের আকাঙ্খা মেটালেও, ওকে আমার যে কারণে ভাল লেগেছে, সেটা ঠিকই থাকছে। কারণ আমার ভাল লাগাটা, ও ধরনের শর্তসাপেক্ষ ছিল না। কিন্তু আমার সঙ্গে আচরণের শর্ত নিশ্চয়ই থাকবে।

এই যে এখন ওকে দেখছি, পা দুটো পর্যন্ত সীটের ওপরে তুলে, কোণের মধ্যে একেবারে ছোট হয়ে, চোখ বুজে শুয়ে আছে, ভীষণ

করুণ দেখাচ্ছে ওকে। এরকম ভাবে একটা মানুষকে দেখলে, তাকে যেন অনেকখানি দেখা হয়ে যায়। এখন ও নিজের সম্পর্কে সচেতন না, রূপ পোষাক, কোন কিছুরই না, অপরকেও ওর বিষয়ে সচেতন করার কোন ব্যাপারই নেই এখন। ক্লান্তি আর ঘুমের কাছে যেমন করে পেয়েছে, তেমনি করে সঁপে দিয়ে বসে আছে। তথাপি, আমার নিজের লজ্জার সঙ্গে, বিক্ষোভের মাত্রাটা একটুও কমছে না। ওর সঙ্গে আমার আর কথা বলতে ইচ্ছা করছে না। ওকে কী রকম অভদ্র আর স্বার্থপর মনে হচ্ছে। হয়তো ওটাই ওর চরিত্র, অথবা সত্যি ঘুমন্ত ওরকম আচরণ করেছে, তবু আমার মন মানতে রাজী না।

এ সময়ে অলক, আমাকে পেরিয়ে, ঝুঁকে, হাত বাড়িয়ে, সুদীপ্তার গালটা একটু টিপে দিয়ে বলল, 'ভোর হয়েছে ময়না পাখি, শিস্ দেবে কখন?'

সুদীপ্তা হাতের ঝটকায় অলকের হাতটা সরিয়ে দিয়ে বলল, 'আহ্, কী অসভ্যতা হচ্ছে, হাত সরান।'

অলক গুনগুনিয়ে উঠল, 'বোল্ ময়না বোল্।'

আমার হাসি পেল। শান্তনু বলে উঠল, 'বেশ তো ময়নার বোল্ শুনছি।'

তাতে অলক থামল না। আমরা জামসেদপুরের একটা হোটেলের সামনে এসে দাঁড়ালাম। অলক বলে উঠল, 'রেষ্ট, লাঞ্চ, দেন স্টার্ট।'

গাড়ি থেকে জামাকাপড়ের ব্যাগই শুধু নামল। অলক একটা ব্যাগের মধ্যে, হুইস্কি আর রাম নিতে ভুলল না। বেয়ারারা আমাদের মালপত্র নিয়ে তুলল। আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। আগেই একটু শুয়ে পড়তে চাই। দুটো ডাবল-বেডেড রুম পাশাপাশি বুক করা হল। আমি বেয়ারার সঙ্গে আগে আগে গিয়ে, একটা রুমে ঢুকে খাটের ওপর পাতা বিছানায় এলিয়ে পড়লাম। অলক শান্তনু, আর একটা খাটে থাকতে পারবে।

একটু পরেই, শব্দ পেয়ে, ফিরে তাকিয়ে দেখি, সুদীপ্তা ঢুকল।

আমি ওর সঙ্গে আর একটা কথাও বলি নি। তাড়াতাড়ি উঠে বললাম, 'ও, আপনি এ ঘরে থাকবেন? আমি যাচ্ছি।'

সুদীপ্তা যেন অবাক হয়ে বলল, 'কেন, আপনি থাকুন না, আমি তো ইচ্ছে করেই এ ঘরে এলাম। আমার কোন অসুবিধে হবে না।'

ওর হাতের ব্যাগটা ড্রেসিং টেবিলের ওপরে রাখল। কী করব, বুঝতে পারছি না। দু এক মিনিট চুপ করে রইলাম, বললাম, 'কিন্তু আপনার অসুবিধেই হবে।'

'কিছুমাত্র না, আপনি ঘুমোন।'

আমি আর কিছু না বলে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু আধঘণ্টার মধ্যেও ঘুম এল না। সুদীপ্তা ব্যাগ খুলে কিছু বের করছে বা চুল আঁচড়াচ্ছে, এরকম কিছু হবে। শান্তনু এসে একবার ঘুরে গেল। জিজ্ঞেস করল, 'সব ঠিক আছে ময়না?'

'ঠিক আছে।'

'উশীনরবাবু কি ঘুমিয়ে পড়লেন?'

আমি কোন জবাব দিলাম না। সুদীপ্তা বলল, 'হ্যাঁ, ঘুমোচ্ছেন।'

শান্তনু চলে গেল। অলক একবার দরজার কাছ থেকে বলল, 'ও কে. ডিয়ার?'

'ও. কে.।'

'উশীনরটা দেখছি শুয়ে পড়ল।'

তারপরে চলে গেল। চা এসে গেল। অতএব উঠতে হল। সুদীপ্তা চা করে কাপ এগিয়ে দিল। আমি চা খেয়ে, বাথরুমে চলে গেলাম। বেরিয়ে এলাম একেবারে দাড়ি কামিয়ে, স্নান সেরে। তারপরে সুদীপ্তা গেল। আমি বাইরের ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়ালাম, শহরের একেবারে কেন্দ্রস্থল। আস্তে আস্তে লোকজনের চলাফেরা বাড়ছে। দোকানপাট খুলছে। বৈজুকে দেখলাম গাড়ি ধুচ্ছে একজনের সাহায্য নিয়ে। একটু পরে, অলকদের ঘরে গেলাম। ওদের, ইতিমধ্যে চান হয়ে গিয়েছে।

বেয়ারা এল ব্রেকফাস্ট নিয়ে। আমি আমার ব্রেকফাস্ট এ ঘরে

দিতে বললাম। খেতে খেতে নাটক নিয়ে খানিকক্ষণ আলোচনা হল। অলক হুইস্কি নিয়ে বসল। শান্তনু হঠাৎ রঙ্গাবতীর কথা কেন তুলল, বুঝতে পারলাম না। আমার কথা নাকি, রঙ্গার মুখে শুনেছে। কিন্তু কী শুনেছে, সেটা শোনবার জন্যই একটু কৌতুহলিত হলাম। শান্তনু সে পথে গেল না, কেবল বলল, 'শী ইজ্ এ জেম্।'

আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'হঠাৎ?'

'জেম নয় বলছেন?'

'শী ইজ এ বিউটি, অ্যাণ্ড নাউ গ্রোয়িং ওল্ড।'

শান্তনু চোখ বড় করে, অবাক হয়ে বলল, 'এ্যাণ্ড নাউ গ্রোয়িং ওল্ড? কিন্তু ফ্যানরা তা মনে করে না।'

আমি হেসে বললাম, 'ফ্যান হচ্ছে ফ্যান, অনেক দূরের মানুষ তারা। আর ফ্যানেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্ধ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন, তাদের ভাল লাগাটা একটা ফিক্সেশন।'

শান্তনু হঠাৎ হাতজোড় করে বলল, 'ওসব কথা যাক, স্যার, সাহস দেন তো একটা কথা জিজ্ঞেস করি।'

'নিশ্চয়ই।'

'সেইজন্যেই কি আর রঙ্গাবতীর ওখানে যান না?'

'যাই তো।'

'খুব কম।'

'সময় পাই না।'

'আচ্ছা উশীনরবাবু, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?'

'স্বচ্ছন্দে।'

'রঙ্গাবতীকে আপনার কী রকম মেয়ে মনে হয়? মানে, সত্যি সত্যি কী রকম? আমার কথাটা বুঝতে পেরেছেন আশা করি?'

আমি একটু ভেবে বললাম, 'প্রচণ্ড যৌবনের ভারে একটি অসুস্থ মেয়ে।'

শান্তনু আমার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। অলক ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বলল, 'শালা গোলি মার রঙ্গাবতী।'

শান্তনু বলে উঠল, 'হ্যাটস্ অফ্ টু য়ু উশীনর বাবু।' রঞ্জা আমাকে একদিন বলেছিল, "দেখ, যার সেক্স বেশী, তার এনজয়মেন্ট কম।" আপনার কথা থেকে সেটা আমি আরো ভাল বুঝতে পারলাম।'

আমি বললাম, 'তার কারণ, কমপ্লেক্স, অশেষ আকাঙ্খা, তাই অতৃপ্তি। কিন্তু এ সবই কেটে যেত, যদি রঞ্জা মনের মত কাউকে বিয়ে করত। আজকাল রঞ্জা কী করছে? হঠাৎ এক একদিন ভীষণ ড্রিংক করে যা তা কাণ্ড করছে, অথবা ঘুমের ওষুধের মাত্রা বাড়িয়ে দিচ্ছে। ও যদি হঠাৎ একদিন সুইসাইড করে বসে, তা হলে আমি অবাক হব না। পাগলও হয়ে যেতে পারে।

আমার কথা শুনে, অবাক শান্তনুর চোখে একটা ভয়ের ছায়া জ্বলে উঠল।

এসব কথা বলতে বলতে, আমার ভেতরে ছায়া ঘনিয়ে এল। দীর্ঘশ্বাসটা দমন করলাম। রঞ্জাবতীর অনেক কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। সে আমার বন্ধু, তার বেশি কিছু হতে চেয়েছিল। যা হলে, রঞ্জাবতী হয়তো কিছু পেত, আমি অনেক কিছু হারাতাম।

যা হারাবার উপায় বা অধিকার কোনটাই আমার ছিল না। আমার পরিবার সংসার স্ত্রী। কথাটা আপাততঃ একটু অন্যরকম শোনালেও, সংসার পরিবার স্ত্রী পুত্র, সব কিছুর কনসেশনটা আমার খুব স্বাভাবিক না। নিজেকে আমার সংসার থেকে অনেক দূরের মানুষ মনে হয়। কেমন করে যেন, বছরের পর বছর, আস্তে আস্তে, সংসারের কাছে আমি একজন বিদেশীর মত হয়ে উঠেছি। প্রতিদিনের চলাফেরা, মামুলি কথাবার্তা বাদ দিলে, বাকী কোন কিছুর মধ্যেই, যোগসূত্র খুঁজে পাই না, বা ওরা পায় না। এটা হয় তো অনেকের ক্ষেত্রেই সত্যি, কিন্তু ওরা নিজেরা সেটা বিশেষ ভেবে দেখে না। এতে কোন পক্ষের দুঃখের ভার বেশি, তা ভেবে দেখবার বিষয় সংসারের না, পুরুষের। সংসারের সকলে সবাইকে যতখানি বোঝে, মনে মনে তাদের পরস্পরের যতখানি জানাজানি, আমার সঙ্গে তা নেই। তারা পরস্পরের ভাবনা চিন্তার অংশ নেয়, কারণ

তারা নিজেদের বোঝে। আমার ভাবনার অংশীদার তারা নয়। এর জন্য কাকে দায়ী করা যায়, বুঝি না। সম্ভবতঃ আমাদের জীবনই এর জন্য দায়ী। আমার জীবন, ভাবনা চিন্তা, কোন কিছুর সঙ্গেই, সংসারের যোগাযোগটা অবিশ্যি প্রয়োজন নয়। সংসারের মানুষ, সংসারের দায়িত্ব, কর্তব্য, এসব ব্যাপারে, পরিবার থেকে আমি বিচ্ছিন্ন নই। কিন্তু সেটাই, আমাকে পরিবারের 'একজন' করে তোলে না। স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা, সন্তানের প্রতি স্নেহ, সেগুলোও কর্তব্যের মধ্যেই পড়ে কী না, জানি না। ভাবতে ভয় হয়, স্নেহ ভালবাসাকে আমি সত্যি কর্তব্য বলে ভাবতে আরম্ভ করেছি কী না। সব মিলিয়ে যখন চিন্তা করি, তখন বুঝতে পারি, ঘরে আমি বাইরের, দূরের, অনেকটাই অচেনা মানুষ। আমি একজন পেশাজীবি নাট্যকার। এটা আমার নেশাও বটে। আমার চিন্তার জগতের সঙ্গে পরিবারের কোন যোগাযোগ থাকতে পারে না। থাকতে পারে না, বলাটা ঠিক নয়। থাকলে হয় তো ভাল হতো। কিন্তু তা হয় নি। হয় কী না, তা জানি না। পারিবারিক বা সামাজিক সমস্যার ক্ষেত্রে সঙ্গী মেলে। তা ছাড়া, আমার সমস্যাগুলো, নিতান্ত আমার। সেখানেই আমি বিচ্ছিন্ন, একাকী, অথচ নিজের সত্তাটাকে এখানেই পরিপূর্ণ করে তুলতে চেয়েছি। সেই পরিপূর্ণতার আকাঙ্খাই, আমাকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে।

কিন্তু এই দূরত্বের বা বিচ্ছিন্নতার জন্য, রঞ্জাবতীকে আমি বন্ধুত্বের থেকে বেশি কিছু দিতে পারি না। স্নেহ ভালবাসা কর্তব্য ব্যাপারগুলো যদি অর্থহীনও হয়, তথাপি, সে সব ছেড়ে, রঞ্জাবতীর জীবনকে পূর্ণ করতে যেতে পারি না।

শান্তনু আমার চোখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'মনের মত সে কি কাউকে পায় নি কখনো ?'

আমি নির্বিকার মুখে বললাম, 'জানি না।'

তবু শান্তনু আমার চোখ থেকে চোখ সরাল না। আমি চোখ ফিরিয়ে নিলাম। ও বলল, 'হয়তো পেয়েছিল, কিন্তু তাকে সে পায়

নি। দুনিয়াটাই এরকম, চাওয়া-পাওয়াটা একটা বিশ্রী ব্যাপার।'

বলেই সে রামের বোতল তুলে গলায় ঢালল। আমি জানি, শান্তনু রঞ্জাকে চায়, রঞ্জার কাছে প্রায় দিনই যায়। সত্যি, চাওয়া-পাওয়ার কোন হিসাব হয় না। কথাটা আমার আরও বিশেষ করে মনে হচ্ছে, এই শান্তনুর জন্যই। শান্তনুর ব্যাপারটা আমি জানি। রঞ্জা যে শান্তনুকে নিয়মিত ওর বাড়ি যেতে বলেছিল, তার আসল কারণটা শান্তনু কোনদিন বুঝতে পারে নি। শান্তনু ভেবেছিল, সত্যি তাকে শাস্তি দেবার জন্যই বুঝি, রঞ্জা রোজ গিয়ে দেখা করতে বলেছিল। আসলে রঞ্জা চেয়েছিল, যে-শান্তনু এমন একটা কাণ্ড করতে পারে, সে অন্ততঃ রঞ্জার যন্ত্রনাটা অনুভব করুক। রঞ্জা শান্তনুকে বন্ধুই করতে চেয়েছিল। কিন্তু শান্তনু চিরদিন, রঞ্জার দিকে চেয়ে, নিজের রক্তের ঢেউ-ই গুনে চলেছে।

অলক এসে ঘরে ঢুকল। আমি বললাম, 'যাই একটু ঘুমোই গিয়ে।'

অলক বলল, 'হ্যাঁ যাও, নিয়ে শুয়ে পড় গিয়ে।'

আমি হেসে বললাম, 'কী যে বল।'

ঘরে এসে দেখি, সুদীপ্তা খাটে বসে পা দোলাচ্ছে। ওর চোখ-মুখ লাল, রাগ-রাগ ভাব। আমাকে দেখে যেন ফেটে পড়ল, 'এ সবের কী মানে উশীনরবাবু?'

অবাক হয়ে বললাম, 'কী হয়েছে?'

'অলকবাবু পিছন থেকে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরে, একেবারে খাটে নিয়ে গিয়ে ফেলেছেন।'

আমি বললাম, 'তাই নাকি? কিন্তু আপনার সঙ্গে তো অলকের অনেক আগেই পরিচয়।'

সুদীপ্তা বলল, 'ওকে আমি ভালই চিনি, তা বলে এরকম করার কী মানে? আমি এখানে আর এক সেকেণ্ডও থাকতে চাই না। থাকতে পারবও না, কারণ কী বলছে জানেন? এখন বলছে, সাত-আট দিনের জন্য নাকি এসেছে। অথচ আমাকে বলেছিল, দু-রাত্রির

ব্যাপার, কাল বিকালেই আমাদের ফেরবার কথা।'

আমি একটু বিব্রত বোধ করলেও, বললাম, 'এ ব্যাপারটা নিতান্তই আপনাদের, আমি তো কিছুই জানি না, কী বলব বলুন?'

সুদীপ্তার উত্তেজনা বাড়তেই লাগল। বলল, 'কলকাতায় আমার প্রাইভেট শো রয়েছে, আমি অ্যাডভান্স টাকা নিয়ে ফেলেছি, কী কেলেঙ্কারি বলুন তো! এখন শুনছি অলকবাবু নাকি, 'কিন্নরী' থেকে আগেই আমার ছুটি করিয়ে রেখেছেন।'

শোনা ছাড়া আমার কিছু করার ছিল না, যদিও অলকের এরকম আচরণ আমার মোটেই ভাল লাগছে না। মিথ্যা বলে আর জোর করে, একটা মেয়েকে কখনো পাওয়া যায় নাকি। ক্ষেত্র বিশেষে এ দুটো ব্যাপারই হয়তো অনেক সময় কাজে লাগে, কিন্তু সেটা পাত্রী বুঝে। অলক বোধহয় সে বোঝাবুঝির ধার বারে না। আমি বললাম, 'এখান থেকে তো আপনার কলকাতায় ফিরে যাবার সুবিধা। আপনি চলে যেতে চাইলে, চলে যান।'

সুদীপ্তা দৃঢ় স্বরে বলল, 'তাই যেতে হবে আমাকে। বৈজু আমাকে টিকেট কেটে তুলে দিয়ে আসুক।'

বলতে বলতেই ও ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি শুয়ে পড়লাম। কিন্তু নিরুপায়। সঙ্গে সঙ্গে আবার সুদীপ্তা ঘরে এসে ঢুকল। পিছনে পিছনে শান্তনু আর অলক। শান্তনু বলতে বলতে ঢুকল, 'যাবে যাও ময়না, ঝগড়া-বিবাদ করে যাচ্ছ কেন? ঠিক আছে, বৈজু গিয়ে তোমাকে তুলে দিয়ে আসবে।'

অলকের কাছে ব্যাপারটা কোন সমস্যা বলে মনে হল না। বলল, 'আরে বাবা, এত ইয়ে করার কী আছে। 'কিন্নরী'তে তো আমি ছুটি করিয়েই দিয়েছি, যে টাকাটা বাইরের থেকে অ্যাডভান্স নিয়েছ, সেটা আমি দিয়ে দেব, আর তোমার টোটাল যা পাওয়ার কথা ছিল, তাও আমি দিয়ে দেব।'

সুদীপ্তা ধমকে কিছু বলতে গিয়েও, হঠাৎ যেন থমকে গেল। ওর গলার স্বরেও, রাগের ঝাঁজটা কম শোনাল। ঘাড় নেড়ে বলল,

'আর বাড়ির লোকেরা যখন ভাববে ?'

অলক অনায়াসে বলল, 'একটা টেলিগ্রাম করে দিচ্ছি, ফিরতে কয়েক দিন দেরী হবে, চিন্তা করো না।'

সুদীপ্তা ধপ করে খাটে বসে বলল, 'আপনি আমাকে আর জ্বালাবেন না অলকবাবু, আমার সহ্য হচ্ছে না।'

সুদীপ্তার বাঁকানো ভুরুর কোপের সঙ্গে, ঠোঁটের কোণে হাসিটা স্পষ্ট। ও একবার চকিতে আমাকে দেখে নিল। মনে মনে আমি একটু অবাক হলাম। সুদীপ্তার ভাবটা যেন কেমন পোষমানা গোছের। টাকার কথা শুনে নাকি ? তা হলে বলতে হবে, অলকও কিছু কিছু সাপের মন্ত্র জানে !

অলক সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'এই ছাখ, আমি তো ভাল কথাই বলেছি। তা ছাড়া তুমি বাড়ি না গেলে, ভাববেই বা কে। তোমার বাবা-মা ? মোটেই ভাববে না, জানবে তুমি কাজে বেরিয়েছ।'

'বাজে কথা বলবেন না, চুপ করুন।'

অলক বলল, 'তবে যা খুশি তাই করোগে। তুমি থাকলে, উশীনরও একটু ইম্‌পেটাস পেত···।'

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'আবার এ ব্যাপারে আমাকে কেন, আমার কোন ইম্‌পেটাস্ দরকার নেই ভাই।'

অলক একটু হেসে বলল, 'তা বললে কি চলে। তুমি আছ বলে, সুদীপ্তারও ভাল লাগছে। তারপরে হিরোইনের একটা কনসেপশন—'

অলক আমাকে চোখ টিপল। নাঃ, সত্যি অলকটা আমাকে জ্বালাল। এই মিথ্যার মধ্যে, আমাকে কেন টানাটানি করছে ও।

শান্তনু অলককে খেঁকিয়ে উঠে বলল, 'আপনি ওর অ্যাডভান্সের টাকাটা আর বাকী টাকাটা দিয়ে দেবেন।'

অলক বলল, 'এখুনি দিয়ে দিচ্ছি।'

সে ঘরের বাইরে চলে গেল। শান্তনু সুদীপ্তার কাঁধে হাত দিয়ে, চাপ দিল, বলল, 'এখন একটু ঘুমিয়ে নাও ময়না, খেয়ে আবার বেরোতে হবে।'

বলে, সে-ও চলে গেল। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে, পাশ ফিরে শুলাম। সুদীপ্তার আর একটা নাম তা হলে ময়না। কিন্তু শান্তনুর সামনে, অলকের আচরণের কথাটা আর ও তুলল না। আমার তো অবাক-ই লাগে। অলককে কি সুদীপ্তা সত্যিই চেনে না, নাকি ভেবেছিল অলক ওকে কোন চেষ্টাই করবে না।

'উশীনরবাবু, আমাকে একটা সিগারেট দেবেন?'

'নিয়ে নিন, টেবিলের ওপরেই আছে।'

ঘুমোতে দেবে না দেখছি। সিগারেট ধরাবার শব্দ হল, শুনলাম, 'আপনার কি রাগ যায় নি?'

মুখ না ফিরিয়েই বললাম, 'কিসের রাগ?'

'সেই কাল রাত্রে সিগারেটের ব্যাপারে, যে কথা বলেছিলেন?'

'সে তো কাল রাত্রেই মিটে গেছে, যা বলার তা তো বলেছি আপনাকে।'

'তবে?'

আমি কোন জবাব দিলাম না। ও আবার বলল, 'মনে হচ্ছে, আপনি একটু গম্ভীর হয়ে আছেন।'

আমি বললাম, 'আমার ঘুম পেয়েছে।'

ওর আর কোন কথা শোনা গেল না। একটু পরে ও যে খাটে শুয়ে পড়ল, টের পেলাম। দরজাটা খোলাই ছিল, পর্দাটা ফেলা ছিল।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম, সুদীপ্তা আমাকে গায়ে হাত দিয়ে ডাকছে।

বলল, 'লাঞ্চ দিয়ে গেছে, খেয়ে নিন।'

বললাম, 'খাচ্ছি, আপনি বসুন।'

'আর তো ঘুমোবার সময় পাবেন না, শান্তনুদা তাড়া দিয়ে গেছেন।'

আমি তবু যেন চোখ খুলতে পারলাম না। শুয়ে শুয়ে আমি হঠাৎ আমার মাথায়, সুদীপ্তার হাত অনুভব করলাম, শুনলাম, 'উঃ, আপনার চুল কী ঘন!'

আমি উঠে পড়লাম। বাথরুম থেকে আসতে আসতেই দেখলাম, খাবারের ঢাকনা খোলা হয়ে গিয়েছে। ব্যাপারটা কেমন যেন দুজন দুজন হয়ে যাচ্ছে। ওরা এক ঘরে, আমরা একঘরে। ওরা কী ভাবছে, কে জানে। অথচ ভাববার কিছুই নেই আসলে।

খাওয়াটা আমি একটু তাড়াতাড়িই সারলাম। হয়তো, সুদীপ্তারও খেতে অসুবিধে হতে পারে আমার সামনে। ওর কি সত্যি, কাল ঘুমের ঘোরে কথাটা মনে নেই? ও তো বেশ যেন অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টায় আছে। আমি অলকদের ঘরে গেলাম। ওরা তখন খাবার শেষে, জামা-কাপড় পরছে। বললাম, 'খাওয়াটা তো একসঙ্গেই সারা যেত।'

অলক বলল, 'তোমাকে চান্স দেওয়া হচ্ছে। ওপ্‌নার তাই তোমার হাতেই আছে।

শান্তনু ধমক দিল, 'আরে, ধুত্তোরি ওপ্‌নার! বসুন স্যার।'

ওদের সঙ্গে বেশ খানিকক্ষণ ধরে গল্প করলাম। আমাদের যাবার রুট নিয়েই কথা হল। স্থির হল, লোহার আকরের খনির কাছে, একটা শহরে আমরা আজকের রাতটা কাটাব, কাল সকালে ঘুরে দেখব সব। তারপরে পরশু দিন সকালে জঙ্গলের উদ্দেশে। জঙ্গলে দু-এক রাত কাটিয়ে, কাঠের ঠিকাদার অধ্যুষিত অঞ্চলে, একদিন কাটিয়ে, কলকাতায় ফিরে যাব। আজ আমরা যে শহরে যাব, তার কাছে-পিঠে জঙ্গল আছে। শহরে কোন ভাল হোটেল নেই, সরকারী বাংলোতে থাকা হবে, অথবা খনির বাংলোতে।

আমি ইচ্ছে করেই সুদীপ্তাকে জামা-কাপড় পরার সময় দিয়ে একটু পরে ঘরে এলাম, এবং এক মুহূর্ত থমকে গেলাম সুদীপ্তার দিকে চেয়ে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ও তখন ঠোঁটে লিপস্টিক লাগাচ্ছে। লাল টকটকে শাড়ি আর জামা পরেছে, ওর ফর্সা রঙ অনেকটা রৌদ্র-ঝলকের মত দেখাচ্ছে। চুলটা ঘাড় থেকে তুলে, জড়ানো খোঁপা করেছে। গতকাল রাত্রের থেকেও, ওকে যেন সুন্দর লাগছে। সুন্দরী মেয়ে যে আমার কম দেখা আছে, তা না, কিন্তু সুদীপ্তার

সৌন্দর্যের মধ্যে, একটা দীপ্তি আর ঝলক আছে, যেটাকে কী বললে ঠিক বোঝানো যায়, জানি না। ককেটি বলতে ইচ্ছা করে না, তবে সেই জাতীয় কিছু, অথচ রঞ্জার মত দুরন্ত যৌবন না।

আমার দেখাটা ওকে দেখতে দিলাম না। নিজের পোশাক নিয়ে আমি বাথরুমে ঢুকে গেলাম। তৈরি হয়ে বেরিয়ে এসে দেখলাম, কপালে, লিপস্টিকের একটা ফোঁটা দিয়ে, নিজেকে ও আরো উজ্জ্বল করে তুলেছে। কিন্তু এই খনির দেশে, জঙ্গলের পথে, এত আয়োজন কিসের? ও আমাকে হঠাৎ বলে উঠল, 'বাহ্, আপনাকে প্যান্ট-শার্টে বেশ সুন্দর দেখাচ্ছে। এখানে আসুন তো, আয়নার কাছে।'

অবাক হয়ে বললাম, 'কেন?'

'আসুন না।'

গেলাম। ও আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বলল, 'দেখি তো, আপনি আমার থেকে কতটা লম্বা।'

দুজনেই আয়নার দিকে তাকালাম। সুদীপ্তা আমার মুখোমুখি হয়ে বলল, 'বেশি লম্বা নন।'

ওর বুক আমার গায়ে ছোঁয়ানো, শরীরের অন্যান্য অংশও। অনেকটা নিবিড় হয়ে ও দাঁড়িয়েছে। প্রসাধনের গন্ধ আমার নাকে। আমি চোখ নামিয়ে ওর মুখের দিকে তাকালাম। ও মুখ তুলল। আমার ভিতরে গোলমাল দেখা দিল। তাড়াতাড়ি সরে যাবার আগে বললাম, 'বেশ সুন্দর লাগছে আপনাকে।'

ও তবু চুপ করে, আমার চোখের দিকে চেয়ে রইল। এ কি ধরা দেবার খেলা? কিন্তু হঠাৎ কেন? ভঙ্গিটা ওর খুব স্পষ্ট লাগছে। আমি সরে যাবার আগেই, অলক এসে ঢুকল, বলল, 'এ কি, তোমাদের এখনো হয় নি?'

আমি বললাম, 'হ্যাঁ, চল।'

অলক আবার বলে উঠল, 'ডিসটার্ব করলাম নাকি?'

আমি বললাম, 'কিছুমাত্র না। দুজনের হাইট দেখছিলাম।'

অলক বলল, 'হ্যাঁ হ্যা, মেপে জুকে নাও।'

বেয়ারা এসে ঢুকল। জিনিসপত্র নিয়ে আমরা গাড়িতে গিয়ে উঠলাম। বসার জায়গা, আগের মতই রইল। কোন বাধা দিতে পারলাম না। অলক মাঝখানে বসতে প্রস্তুত। সুদীপ্তার আপত্তি। অলক প্রথমেই, মদের কোটা পূর্ণ করে নিল। তা ছাড়া এক ডজন বীয়র। পরে কোথাও যাতে, ঠেকতে না হয়। সিগারেটও সেই পরিমাণেই নিয়ে নেওয়া হল, যদিও আমি আমার ব্র্যাণ্ড কলকাতা থেকেই নিয়ে এসেছিলাম।

শান্তনু বলল, 'যে শহরে আমরা যাব, তার আগেই, চাঁইবাসা গিয়ে ফরেস্ট অফিসের থেকে, বাংলোয় থাকবার চিঠি নিয়ে নিতে হবে।'

আমাদের চাঁইবাসার কাজ যখন শেষ হল, তখন প্রায় সাড়ে চারটে। এর মধ্যে, আমরা পাঁচদিনের, চাল আটা তেল ঘি আলু ডিম নুন, যা যা প্রয়োজন, সবই কিনে নিয়েছি। গাড়ি ছাড়বার পরে, দৃশ্য একেবারে বদলে গেল। কখনো জঙ্গল, পাহাড়, চড়াই-উৎরাইয়ের রাস্তা। কখনো সমতল। শাল গাছে গাছে ফুল, কুসুম লালে লাল। অলক আর শান্তনু বীয়র ঢালল। আমাদেরও দিল। সুদীপ্তা কোন আপত্তি না করেই, বীয়র নিল।

আমাদের তিনজনকে ছাড়িয়ে যেতে চাইছে সুদীপ্তা। প্রথম গেলাসটা ও তাড়াতাড়ি খেল, ওর চোখ আর সমস্ত মুখটা লাল হয়ে উঠেছে ইতিমধ্যেই। অলক আমার সঙ্গে চোখাচোখি করে, একটা ইশারার ভাব করল, ভাবটা, 'বেশ জমেছে দেখছি।' শান্তনুও একবার সুদীপ্তার দিকে তাকিয়ে দেখল। সুদীপ্তার দৃষ্টি বাইরের দিকে, দূরে। মাঝে মাঝে অবাক খুশি চোখে গাছপালা দেখছে। কি একটা চেনা গান গুন গুন করছে। কেমন যেন মেতে ওঠার লক্ষণ।

মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকাচ্ছে। ওর চোখে যেন কেমন একটা ঝিলিক হানা হাসি। গাড়ি একটু আঁকাবাঁকা চললেই,

আমার গায়ের ওপর এসে পড়ছে। একবার বলে উঠল, 'ভারি ভাল লাগছে।'

হঠাৎ এতটা ভাল লাগার কারণ আবিষ্কার করতে না পারলেও, এই আরণ্যক প্রকৃতি, ধূ ধূ রাস্তা আর ছুটে চলা, বিশেষ এমনি একটা লাল-হলদে মেশানো বিকালে, সকলেরই ভাল লাগার কথা। কিন্তু জামসেদপুরের ঘর থেকে বেরোবার আগের মুহূর্ত থেকে, সুদীপ্তার ভাল লাগার চেহারাটা যেন বদলে গিয়েছে। এই ভাল লাগাটা যেন ওর রক্তের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। ওর আঁচল উড়ে যাচ্ছে, সংক্ষিপ্ত জামায়, ওর কোমর বুকে যেন কিসের একটা ছন্দ খেলা করে বেড়াচ্ছে। আবার বীয়র নিয়ে, সুদীপ্তা বলল, 'কী সুন্দর লাগছে।'

অলক বলে উঠল, 'তবে আমার কাছে চলে এস। সুন্দরতমের সন্ধান তুমি আমার কাছেই পাবে।'

শান্তনু বলে উঠল, 'হালায় মইরা যামু।'

সুদীপ্তা খিল খিল করে হেসে উঠল, বলল, 'অলকবাবু, আপনি যে এত সুন্দর কথা বলতে পারেন, তা আমার জানা ছিল না।'

অলক বলল, 'আমার কিছুই তো তুমি জান না। আমার কাছে এস, তবে জানতে পারবে।'

সুদীপ্তা আমার দিকে তাকাল, চোখে ওর ঝলকানো ঠাট্টার হাসি। বললাম, 'মাঝখানে আসবেন?'

সুদীপ্তা রীতিমত কনুই দিয়ে আমাকে ধাক্কা দিল, 'নো জেণ্টলম্যান, য়ু আর এ্যা পারফেক্ট জেণ্টলম্যান, আই নো। ইচ্ছে হলে, আমি নিজেই যাব।'

এ সময়ে শান্তনু একবার সুদীপ্তার দিকে তাকিয়ে দেখল। অলক বলল, 'ইচ্ছেটা একটু তাড়াতাড়ি জাগাও।'

সুদীপ্তা এমনভাবে হেলান দিয়ে, আমার দিকে ঘেঁষল, ও যেন আমার গায়েই হেলান দিল। আমি মুখ ফিরিয়ে তাকাতে, ওর ভুরু কুঁচকে উঠে, ঠোঁট দুটো কেমন ফুলে উঠল। পর মুহূর্তেই আবার মুখের ভাব অন্যরকম করল, ঠোঁট টিপে হেসে বলল, 'ভয় পাই।'

জিজ্ঞেস করলাম, 'কেন?'

'কখন আবার আপনি বিরক্ত হয়ে উঠবেন।'

আমি এ কথার কোন জবাব দিলাম না। কিন্তু সুদীপ্তার দিক থেকে চোখ ফেরাতে, একটু সময় লাগল। হোটেলের ঘর পর্যন্ত, আমি উশীনর, নাট্যকারের মর্যাদা ভুলি নি। জানি না, আপাততঃ এই মুহূর্তে সেই মর্যাদাবোধের মূল্য কতখানি। সমাজ পরিবারের কথাটা, ক্ষণে ক্ষণে ভুলে যেতেও অভ্যস্ত নই। আর দশটা সাধারণ মানুষের মত, আমার মধ্যে ন্যায় অন্যায় বোধ কাজ করে, এবং দশজন সাধারণের মতই, আকাঙ্খার দোলা লাগে।

মেয়েদের ক্ষেত্রে, সমস্ত সুযোগেরই সদ্ব্যবহার করছি, কিংবা সুযোগের সন্ধানে থেকেছি, তা বলতে পারব না। তবে, কোন কোন চরিত্র, আমাকে অনেকটা নিশির ডাকের মত ডেকে নিয়ে গিয়েছে! অনেকটা ঘুমের ঘোরে যাবার মত, আর সব কিছুই অন্ধকারের আড়ালে থেকে গিয়েছে। সম্ভবতঃ, সুদীপ্তার মত মেয়ের সঙ্গে, জীবনে এই প্রথম এতটা ঘনিষ্ঠতা। নিজেকে আমি আর একটু দূরে, অন্যত্র সরিয়ে রাখতে চেয়েছি, যেখানে সুদীপ্তার মত মেয়ে ঠিক নেই। কিন্তু সুদীপ্তা, এই দূর আরণ্যক বিকালটা আমার মধ্যেও যেন, আস্তে আস্তে চুঁইয়ে দিচ্ছে। নিশির ডাকের হাতছানি লাগছে আমার, আর সবই অন্ধকারে মিলিয়ে যাচ্ছে।

আমি ওর দিকে তাকালাম। ও বাঁ হাত দিয়ে, কাউকে না দেখিয়ে, আমার পিঠের কাছে স্পর্শ করল। আমি বললাম, 'সিগারেট খাবে?'

ওর কথা বলতে, এক মুহূর্ত দেরি হল, আমার সম্বোধনটা ওকে চমকে দিয়েছে। প্রায় ফিসফিস করে বলল, 'আপনি ধরিয়ে দিলে খাব।'

বাঁ হাতে গেলাস রেখে, ডান হাতে ওকে প্যাকেট এগিয়ে দিলাম। ও সিগারেট বের করল। লাইটার জ্বালিয়ে বললাম, 'ধরাও।'

'আমি ?'

'হ্যাঁ।'

ওর মাথাটা এসে ঠেকল আমার কাঁধের কাছে। সিগারেট ধরাল। লাইটার পকেটে রেখে, ওর হাত থেকে সিগারেট নিয়ে আমার ঠোঁটের ফাঁকে নিলাম। শান্তনু বলে উঠল, 'হাউ ড্যু য়্যু এনজয় স্যার ?'

বললাম, 'নাইস্।'

অলক বলল, 'হ্যাঁ, তোমার মন-মেজাজ ভাল থাকলেই, এখন আমাদের ভাল।'

আমি বললাম, 'এতটা বলো না অলক। তবে, আমি সুদীপ্তাকে একটা অনুরোধ করব।'

সুদীপ্তা আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বলল, 'কী ?'

'তুমি মাঝখানে এস।'

সুদীপ্তা যেন থমকে গেল, আমার চোখের দিকে তাকাল। আর এই প্রথম, আমি আমার চোখে, অনুরোধ জানিয়ে, ওর পিঠের ও কোমরের খোলা জায়গায় হাত দিলাম; ও তবু আমার দিকে চেয়ে রইল, তারপরে মাঝখানে এল। অলক সঙ্গে সঙ্গে, সুদীপ্তার কোলের ওপর আস্তে চাপড় মেরে বলল, 'গুড গ্যাল।'

সুদীপ্তা হাসল, কিন্তু হেলে রইল আমার দিকে। এটা সম্ভবতঃ পুরুষের জয় করার উদারতা। তা ছাড়া, সমস্ত ব্যাপারটা বেশ আনন্দদায়ক হয়ে উঠুক আমার তাই ইচ্ছা। অলক যদি আর একটু মানিয়ে নেবার মত ব্যবহার করে, তবে সমস্ত ব্যাপারটাই ভাল হয়। যদিও, এর দ্বারা আমি সুদীপ্তাকে সকলেরই ভোগ্যা করে তুলতে চাইছি না, এতটা ছোট করে, চিন্তা করতে পারি না। আবহাওয়াটা ভরে উঠুক খুশিতে। কেউ না নিজেকে বঞ্চিত মনে করে।

শান্তনু বলল, 'ময়না একটা গান কর।'

সুদীপ্তা একটা ঠুংরি জাতীয় হিন্দী গান ধরল, যার সঙ্গে কিছু অভিনয়েরও ছোঁয়া আছে, একটি মাতাল মেয়ের স্বরের অস্ফুট

গোঙানি ও জড়ানো কথা। অলক তো ক্ষেপেই উঠল। দুবার গাল টিপে দিল সুদীপ্তার। শান্তনু পিছনে ফিরে, প্রায় ধ্যানস্থের মত, তার বালিকা বয়সে দেখা ময়নাকে দেখতে লাগল।

খনি শহরে আমরা যখন ঢুকলাম, তখন সাতটা। সেখান থেকেও, দু মাইল দূরে বাংলো, জঙ্গলের সীমানায়। ভাগ্য ভাল, বাংলোটা পুরোপুরিই খালি পাওয়া গেল। কিন্তু এ বাংলোতে দুটি মাত্র শোবার ঘর। মাঝখানে একটা বসবার ঘর, পিছন দিকে একটা ডাইনিং স্পেস্। বাংলোর চৌকিদার বা কেয়ার-টেকার, অন্য একজন চাকরের সাহায্যে আমাদের জিনিসপত্র তুলে দিল। মোটামুটি সব পরিষ্কার পরিচ্ছন্নই আছে। খাটে বিছানা পাতা। দুটো বেডরুমের সঙ্গে অ্যাটাচ্‌ড বাথরুম।

প্রথমেই প্রশ্ন উঠল, দুটো ঘরে কী ভাবে শোয়া হবে। অলক বলল, 'দুজন দুজন করে এক এক ঘরে।'

সুদীপ্তা বলে উঠল, 'তার মানে?'

'তার মানে, তুমি আর আমি এক ঘরে।'

বলেই সে হাত বাড়িয়ে, আবার সুদীপ্তার গাল টিপে দিয়ে, ধ্বনি দিল, 'হা হা।'

শান্তনু বলল, 'সেরকম হলে, উশীনরবাবু আর ময়না এক ঘরে থাকতে পারে।'

আমি বললাম, 'তা তো হবে না, আমরা তিনজনে এক ঘরে, সুদীপ্তা একটা ঘরে।'

অলক বলল, 'কিন্তু প্রত্যেকটা ঘরই যে ডাবল-বেডেড।'

আমি হেসে বললাম, 'তা হলে দেখ সুদীপ্তা, যদি তোমার কাছে রাত্রে অলক—'

অলক তাড়াতাড়ি বলল, 'না, না, তোমরা দুজনেই থাকো।'

সুদীপ্তা ততক্ষণে একটা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। অলক যে সবটাই সত্যি তা-ই চাইছে, আমি বিশ্বাস করি না।

আমি নিজে, এরকম একটা ব্যবস্থা ভাবতেই পারি না। কিছুক্ষণের জন্য, কথাটা চাপা পড়ল। অলক আর শান্তনু পর পর বাথরুমে ঢুকে জামাকাপড় বদলে নিল। ওদিকে সুদীপ্তার হয়ে যাবার পরে, আর একটা বাথরুম থেকে আমিও তৈরি হয়ে এলাম। চৌকিদার আর চাকর মিলে, কিচেনে রান্নার যোগাড়ে লেগে গিয়েছে। অলক গেলাস বোতল সাজিয়ে ঢালতে আরম্ভ করেছে। এবারে তিনটি গেলাস।

বাংলোর বারান্দায় সুদীপ্তা আর শান্তনু কী সব কথা বলছিল। এক সময়ে অলকও সেখানে চলে গেল। আমি একটা বিদেশী নাটক নিয়ে পড়তে শুরু করে দিলাম। কিন্তু মনটা কোথায় যেন একটু চিড় খেয়ে যাচ্ছে। তারপরে এক সময়ে আমার মনে হল কারোর, গলার স্বর শুনতে পাচ্ছি না। আমি উঠে পড়লাম। বাইরে এসে দেখলাম, কেউ নেই। রান্নাঘরের আলো দেখে, সেখানে গেলাম, দেখলাম, সুদীপ্তা সেখানে রান্না দেখছে, আর চৌকিদারের সঙ্গে গল্প করছে। আমাকে দেখে বলল, 'আপনাকে পড়তে দেখে আর জ্বালাতন করলাম না।'

এই মুহূর্তে, কথাটা একটু নতুন লাগল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'এরা কোথায় গেল?'

'কী জানি, দু জনে হাঁটতে হাঁটতে কোনদিকে গেল।'

আমি বাংলোর অন্ধকার উঠোনে সরে এলাম। এক পাশে গাড়িটা দাঁড় করানো রয়েছে। বৈজু কোথায়, কে জানে। কাছেই, পাহাড় আর জঙ্গল দেখা যাচ্ছে। দূরে, একটা পাহাড়ের উঁচু গায়ে, বিন্দু বিন্দু আলোর সারি চোখে পড়ে। বোধহয়, ওখানে লৌহ আকর তোলা হচ্ছে। কাল একবার আমাকে ওখানে যেতে হবে।

হঠাৎ পিছন দিকে একটা শব্দ হতেই, চমকে উঠলাম। আর শুনলাম, 'কী হচ্ছে কি, ছাড়ুন! কোথায় ওৎ পেতে ছিলেন?'

সুদীপ্তার গলা, পিছন ফিরে, ওর পাশে, অলককে চিনতে অসুবিধা

হল না। সুদীপ্তা কখন রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে এদিকে আসছিল, খেয়াল করি নি। অন্ধকারে, গাড়ির আড়ালে, ওরা দুজন কেউ আমাকে দেখতে পায় নি। অলক বলল, 'ওৎ পেতে থাকব কেন। দেখলাম, তুমি পা টিপে টিপে যাচ্ছ, আমিও তোমার পেছনে পা টিপে টিপে এলাম। কোথায় যাচ্ছিলে?'

'কোথায় আবার, ঘরের দিকে?'

'উশীনরের কাছে বুঝি?'

'উশীনরবাবু কোথায়, তাই জানি না। আমি তো রান্না ঘরে ছিলাম।'

'কিন্তু তুমি পা টিপে টিপে যাচ্ছিলে দেখে, আমার কেমন একটা সন্দেহ হল, তুমি কিছু খেলছ। তাই আমিও তোমার পিছু পিছু এলাম।'

'এলেন তো, আমাকে জাপটে ধরার কি দরকার ছিল?'

অলক বলল, 'খালি রাগ কর কেন। মনে কর না, একজন অভিনেতা, স্টেজে তোমাকে জড়িয়ে ধরেছি।'

আমার হাসি পেল। সুদীপ্তা জিজ্ঞেস করল, 'শান্তনুদা কোথায়?'

'কাছে একটা ছোট নদী আছে, তার ধারে।'

'ডেকে নিয়ে আসুন, খাবার রেডি।'

'ও. কে. তা হলে আর একটু টেনে নেওয়া যাক।'

অলক চলে গেল। ও যে এত সহজে, অন্ধকারে পেয়েও সুদীপ্তাকে ছেড়ে দেবে আশা করতে পারি নি। খাবার টানে, না মদের টানে, কে জানে। আমি সুদীপ্তার দিকে একবার তাকিয়ে ঘরের দিকে পা বাড়ালাম। ও বলে উঠল, 'আপনি ঘরে যান নি?'

'না।'

'কোথায় ছিলেন?'

'এই তো, গাড়ির কাছেই দাঁড়িয়ে দূরের আলো দেখছিলাম।'

'আপনিও কি ঘরের দিকে যাচ্ছেন ওই টানেই?'

বললাম, 'হ্যাঁ, অবশিষ্ট পড়ে আছে। তোমার গল্প করা হয়ে গেল ?'

'হ্যাঁ।'

এই মুহূর্তে নিজেকে আমার বিদ্রূপ করতে ইচ্ছা করল। জানি না সুদীপ্তা কী ভাবছে। আমার অবস্থাটা বুঝে, ওরও হয়তো হাসি পাচ্ছে। আমি যে ওকে আমার কাছে প্রত্যাশা করেছিলাম, সেটা হয়তো বুঝতে পেরেছে। সুদীপ্তা বলল, 'নদীর ধারে যাবেন ?'

'অন্ধকার।'

'ভয় পান ?'

'তোমার যেতে ইচ্ছে করছে ?'

'করছে।'

'চল।'

ও আমার গা ঘেঁষে চলল, তারপরে যেন অন্ধকার অচেনা রাস্তায় চলতে অসুবিধা হচ্ছে, এইরকম ভাব করে, আমার একটা হাত ধরল। বলল, 'আমি প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছি না।'

'আমিও না।'

সুদীপ্তার চুল বা শরীর থেকে, একটা মিষ্টি গন্ধ বেরোচ্ছে। পায়ের নিচে বালি আর ছোট ছোট পাথরের টুকরো থাকায়, চলতে গিয়ে, আমাদের গায়ে গায়ে ধাক্কা লাগছে। দু একটা জোনাকি ঝিলিক দিয়ে উঠছে। খুব অস্পষ্ট হলেও, একটা কুলু কুলু শব্দ যেন শুনতে পাচ্ছি। সুদীপ্তা হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, 'আমাকে আপনার কী মনে হয় ?'

বললাম, 'একটি মেয়ে।'

হেসে বলল, 'আর ?'

'আর আবার কী, একটি মেয়ে।'

'শুধু এটুকুই শুনতে চাই নি। আমি যে একটা মেয়ে, একথা আপনার থেকে আমি বেশি জানি।'

'সেটা তুমি মেয়ে হিসাবে, একটি মেয়ের মত করে জান। সেই

জানার মধ্যে তোমার অনেক কিছু বলার থাকে। পুরুষরা হয় তো অনেক বক্তিমে করতে পারে মেয়েদের বিষয়ে, আমি একটি মেয়েকে, একটি অখণ্ড মেয়ে বলেই জানি।'

সুদীপ্তা আমার হাতে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'আপনার ওসব কথা আমি শুনতে চাই না। আমাকে কী রকম মেয়ে মনে হচ্ছে, তা-ই বলুন।'

এক কথার জবাবে যেটা এড়িয়ে যেতে চাই, সুদীপ্তার আপত্তি সেই খানেই। কেন, তাও জানি। আমার মনে হওয়াটা দিয়ে, আমার সঙ্গে ওর ভবিষ্যৎ আচরণ পদ্ধতি স্থির হবে। অথবা, এমনও হতে পারে, নাট্যকার উশীনরের, ওর সম্পর্কে ধারণাটা জানবার একটা কৌতুহল মাত্র। কিন্তু সব কথা কি বলা যায়। আমি কি বলতে পারি, ওকে আমার মনে হয়, ঘাতকের ছুরির খোঁচা খাওয়া, ও একটা সাবধানী মুরগীর মত মেয়ে। পদে পদে ওর লড়াই। ওর প্রতিটি পদক্ষেপ সতর্ক, আগেব থেকে ভেবে নিতে হয়। ওর কথায় যত বাড়তি বিষয় আছে, কমতিও তেমনি। কোনটা কখন কতখানি বাড়াতে হবে, কমাতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে নিতে পারে। অর্থাৎ ও যে মিথ্যা কথা বলে, সেটাও আমি বুঝি। প্রয়োজনে মিথ্যা বলে না কে। তার জন্য সুদীপ্তাকে আমি দোষ দিতে চাই না। ওর পরিবেশে, ওটা বোধহয় ওর বাঁচবারই অঙ্গ। ওর মন বলে একটা পদার্থ আছে। কিন্তু প্রয়োজন হলে, সে-মনটাকে এক পাশে সরিয়ে রেখে, কার্যসিদ্ধি করতে পারে। আরো মনে হয়, ওর জীবনটাই, ওর আচরণ ভাবনা চিন্তা, ইত্যাদির মধ্যে, একটা প্যাটার্ণ এনে দিয়েছে। যে-প্যাটার্ণের সবটা হয় তো আমি জানি না। আসলে, প্রথম থেকেই আমার যা মনে হয়েছে, ও একটি অসহায় আর দুঃখী মেয়ে। সে কথা ওকে বলা যায় না। ওকে বলা যায় না, ওর যত ছল চাতুরি, (অনেক আছে বলেই আমার ধারণা) তাও উদ্দেশ্যসিদ্ধির হাতিয়ার। সকলের পক্ষেই সেটা সত্যি, যাকে বলে নীতি ও কৌশল। বললাম, 'তুমি একটি ভাল মেয়ে।'

সুদীপ্তা অন্ধকারেই, মুখ তুলে, আমার মুখ দেখবার চেষ্টা করল। বলল, 'আমার মন যুগিয়ে, আপনাকে কিছু বলতে বলি নি। আমাকে যে কেউ ভাল মেয়ে বলে না, তা আমি জানি।'

আমি বললাম, 'তুমি যাদের কথা বলছ, তাদের কথা আমি জানি না। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা হতে চলল, তোমাকে আমি দেখছি।'

'তাইতেই ভাল মেয়ে বলে বুঝে ফেললেন?'

'ভালই তো।'

জমি ক্রমে ঢালুর দিকে নামছে। কুলুকুলু শব্দ স্পষ্ট হয়ে উঠছে। নদী কাছেই। শান্তনু কি কাছেই কোথাও রয়েছে।

সুদীপ্তা হঠাৎ বলল, 'এই যে আপনার হাত ধরে, এভাবে অন্ধকারে চলেছি, এতে আমাকে খারাপ মনে হচ্ছে না?'

আমার যেন কেমন একটু হাসি পেয়ে গেল। সে কথা ওকে জানতে দিলাম না। বললাম, 'খারাপ মনে হবে কেন। একটু ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠা কি খারাপ।'

'আপনি বলেই এরকম বলতে পারলেন। একটা মেয়ে এত তাড়াতাড়ি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলে, লোকে খারাপ বলে।'

'আমি বলি না।'

'অলকবাবু, এমন কি শান্তনুদা হলেও, আমি এভাবে হাত ধরে অন্ধকারে, নদীর ধারে আসতে পারতাম না।'

'ওরা তোমার পুরনো চেনা মানুষ। এ বিষয়ে আমি কিছু বলতে পারি না।'

চলতে চলতে, আমি দাঁড়ালাম। আমার ডান পা, একটু বেশি নিচে নেমে গিয়েছে। সম্ভবতঃ এর পরেই নদী। অন্ধকারের মধ্যেও, আমি একটা অস্পষ্ট ঝিলিক যেন দেখতে পাচ্ছি, যেটা জলেরই রেখা বলে মনে হচ্ছে। আশেপাশে গাছপালা রয়েছে বলেই, বোধ হয় জলের ঝিলিক ভাল দেখা যাচ্ছে না।

সুদীপ্তা বলল, 'অথচ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই, আপনাকে আমি ওদের থেকে বেশি বিশ্বাস করছি। জীবনে কোনদিন ভাবতে পারি

নি, আপনার মত বিখ্যাত লোকের হাত ধরে, এমন ভাবে দাঁড়াব।'

এই মুহূর্তে আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করল, গতকাল রাত্রে, আমাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেওয়াটা, ওর ইচ্ছাকৃত ব্যাপার ছিল কী না। সন্দেহটা আমার মনে এখনো আছে। কিন্তু জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। আমি জানি, আমার হাত ধরে, গা ঘেঁষে ও যে একেবারে নিশ্চিন্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, তা না। আমার প্রতিক্রিয়া বোঝবার চেষ্টাও আছে। থাকবেই। আমার খারাপ লাগছে না। আমি যে নিজেকে খানিকটা খুশি আর মুক্ত মনে করছি না, তা না। বললাম, 'আমি বিখ্যাত লোক হিসাবে, তোমার সঙ্গে এসে নদীর ধারে দাঁড়াইনি। আমি একজন সাধারণ মানুষ—।'

সুদীপ্তা আপত্তি করে বলে উঠল, 'ও বাবা, সাধারণ মানুষকেই আমার ভয় বেশি।'

'ভুল বললে। তোমার আশেপাশে, অসাধারণ মানুষের ভিড় বলেই, তোমার দুশ্চিন্তা। সাধারণ মানুষকে ভয় পাবার কিছু নেই।'

সুদীপ্তা আমার হাতটা অল্প একটু চাপ দিচ্ছে। যেন নিতান্ত কথার অন্যমনস্কতার মধ্যেই, হাতটা নিয়ে একটু খেলা করছে। ও বলল, 'আচ্ছা, আর একটা কথা জিজ্ঞেস করব, রাগ করবেন না?'

হেসে বললাম, 'না শুনলে কী করে বলব?'

'না, আপনাকে আমার একটু ভয় লাগে। হঠাৎ যদি রেগে যান?'

'বল শুনি, রাগ করব না।'

'রঞ্জাবতীর সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক?'

'কী শুনেছ তুমি? কার কাছে?'

'শান্তনুদার কাছে শুনছিলাম।'

'কী?'

'রঞ্জাবতী আপনার—।'

'প্রেমিকা?'

'হুঁ। ছিল শুনেছি।'

আমি হেসে বললাম, 'রঞ্জাবতী কারোরই প্রেমিকা ছিল না, নেইও। যদি কেউ থেকে থাকে, তবে সে ওর ছেলেমানুষ বয়সেই ছিল। যেখানে কেউ আর কখনো ফিরতে পারে না।'

সুদীপ্তা কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইল, কী যেন ভাবল। বোধ হয়, ওর ছেলেবেলাটার ওপরে একবার চোখ বুলিয়ে এল। জিজ্ঞেস করল, 'আর শান্তনুদা রঞ্জাবতী ?'

'তোমার শান্তনুদা কী বলেন ?'

'কিছুই না।'

'আমারও তাই মনে হয়, বোধহয় কিছুই না।'

'তার মানে ? তবে যে কত কথা শুনতে পাই।'

'গুজবে কান দিও না।'

সুদীপ্তা বলল, 'বুঝি না বাপু। আচ্ছা উশীনরবাবু, কাল রাত্রে সিগারেট খেলেন না, আজ যে নিজে থেকেই আমার মুখের সিগারেট খেলেন ?'

বললাম, 'ভাল লেগেছে বলে।'

'কাল তো ভাল লাগে নি।'

'কাল আর আজকের মধ্যে তফাৎ আছে।'

'কতখানি ?'

আমি অন্ধকারে ওর দিকে ফিরে তাকালাম। ওর অস্পষ্ট অবয়ব দেখে বুঝতে পারছি, ও আমার দিকে তাকিয়ে আছে। এই মুহূর্তে, আমি একটা আবেগ অনুভব করলাম। সুদীপ্তাকে আমার আরো কাছে টেনে নিয়ে বললাম, 'অনেকখানি।'

সুদীপ্তা সঙ্গে সঙ্গে আমার কাছ থেকে একটুখানি সরে গিয়ে, বলে উঠল, 'চলুন ফিরে যাই, অন্ধকারে আমার আর ভাল লাগছে না।'

অচিরাৎ আমার মনে হল, আগে থেকেই যেন সুদীপ্তার সমস্ত ব্যাপারটা তৈরী করা, ভাবা। ও যেন জানতই, আমি এরকম করতে পারি, তারপরে ও এইরকম বলবে। গতকাল রাত্রের ঘুমন্ত

ধাক্কা খাওয়ার মতই, আমার মনে হল। আমি তৎক্ষণাৎ বললাম, 'হ্যাঁ, চল।'

সুদীপ্তাকে ছেড়ে দিয়ে, ওর পাশাপাশি হেঁটে ফিরে এলাম। ও কথা বলতে পারছে না। কিন্তু কথা না বলতে পারার কথা আমারই। তবু আমি চুপ করে থাকতে চাইলাম না। একেবারে অর্থহীন অবিশ্বাসে বললাম, 'তোমার নিশ্চয় খুব খিদে পেয়েছে?'

কথাটা বলেই, নিজেকে খুব বোকা মনে হল। সুদীপ্তা যেন চমকে উঠে বলল, 'অ্যাঁ? না, তেমন না।'

আমরা ফিরে এসে দেখলাম, শান্তনু কখন ফিরে এসেছে। দুজনেই এক সঙ্গে খেতে বসে গিয়েছে। আমি আর সুদীপ্তাও দুদিকে বসে পড়লাম। চৌকিদার প্লেট সাজিয়েই রেখেছিল। আমরা বসতে, খাবার এগিয়ে দিল। শান্তনু আর অলকের খাওয়া দেখে মনে হল, টেবিল থেকে খাবার কেউ কেড়ে নেবে, এমনই গোগ্রাসে খাচ্ছে।

অলক এক মুখ খাবার চিবোতে চিবোতেই বলল, 'হল?'

কথাটা কাকে বলল, বোঝা গেল না। আমি ওর দিকে ফিরে তাকালাম। ও আমার দিকে তাকিয়ে, চোখের কোণ দিয়ে, সুদীপ্তার দিকে তাকাল। সুদীপ্তা মাথা নিচু করে, আস্তে আস্তে খাচ্ছে। শান্তনু বলল, 'কার কী হল না হল, সে খোঁজে আপনার দরকার কী মশাই। গিলছেন, গিলুন।'

অলক নির্বিকার ভাবে বলল, 'না, বোঝবার চেষ্টা করছি, কত দূর হল।'

অলক কী বলতে চাইছে, সবই বুঝি। সে সব কথায় আমি কান দিলাম না। ও বলল, 'ইস্‌কুরু যত আলগা হয়। ততই ভাল।'

খাওয়ার পর আমার কথানুযায়ী, তিনজন এক ঘরে, সুদীপ্তা আর এক ঘরে শোবার ব্যবস্থা হল।

একবার সুদীপ্তা বলল, 'আমার একলা শুতে ভয় করে, অচেনা জায়গা।'

একমাত্র অলকই সে-কথার জবাব দিল, 'আমি থাকব।'

সুদীপ্তা বলল, 'আপনার ভয়েই তো কথাটা বললাম। রাত্রে যেন আর উঠবেন না।'

'তুমি দরজাটা বন্ধ করে শুয়ো। বলতে পারি না, দরজা ঠেলাঠেলি করতে পারি।'

সুদীপ্তা ওর ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করল। অলক-শান্তনুও শুতে গেল। আমার আবার একটু পড়াশোনা করা অভ্যাস। আমি বসবার ঘরে বই নিয়ে বসলাম।

চারদিকে নিঝুম, ভিতর থেকে বাংলোর সব দরজা বন্ধ। সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে মনে হল। সুদীপ্তার কথাটা আমার আর একবার মনে হল। হোটেলের ঘরে সে যেরকম করেছিল, তারপরেও অন্ধকারের দোহাই দিয়ে, ওভাবে হঠাৎ চলে আসার পিছনে, ওর কী কী কারণ থাকতে পারে।

হঠাৎ শব্দ হতে, দেখি, সুদীপ্তা দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে। দেখলেই বোঝা যায়, ওর ওপর গায়ে কোন জামা নেই, কেবল শাড়িটা ভাল করে জড়ানো। চোখে ঘুমের আবেশ নেই। বলল, 'এখনো পড়ছেন?'

বললাম, 'হ্যাঁ, এবার শুতে যাব।'

নীচু গলায় বলল, 'জানেন, সত্যি কিন্তু আমার একলা ঘুমোতে ভয় লাগে। আমার সঙ্গে আমার বোন শোয় তো, কেমন যেন বিশ্রী লাগছে।'

কী বলতে চায় সুদীপ্তা? ও কি ওর ঘরে আমাকে শুতে যেতে বলছে নাকি? যদিও, ওকে দেখে, এই মুহূর্তে, আমার নিশির ডাকের হাতছানিটা যেন দেখতে পাচ্ছি। ও দরজার ওপরে দাঁড়িয়ে ঘাড় কাত করে, আমার দিকে চেয়ে হাসল। যেন কী একটা ইশারা ওর চোখে। আমি বললাম, 'আলো জেলে শোও।'

'আলো জেলে কি ঘুমনো যায়?'

'তবে যা ইচ্ছে।'

'একটা সিগারেট খাব?'

'নিয়ে যাও।'

ও ঘরের থেকে দু পা বেরিয়ে বলল, 'না থাক, সিগারেট খেলে আর ঘুম পাবে না।'

আমি উঠে দাঁড়ালাম, বললাম, 'ঠিক আছে, শুতে যাও আমি আলো নিভিয়ে শুতে যাচ্ছি।'

সুদীপ্তা একটা আঁচল দিয়ে ঠোঁট পর্যন্ত চাপা দিয়ে, ঠায় আমার চোখের দিকে চেয়ে রইল। আলো নিভিয়ে চলে যেতে আমার দ্বিধা হল, বললাম, 'কী?'

ও কিছু বলল না। আমি ওর সামনে এসে দাঁড়ালাম, খুব কাছে। ও হঠাৎ চুপি চুপি বলল, 'আপনি আছেন বলে, আমি সাহস করে একলা শুতে যাচ্ছি।'

বলেই ও হঠাৎ আমাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরল, আর মুখটা তুলে, আমার ঠোঁটে একবার ছুঁইয়ে দিল। আমি ওকে ধরবার আগেই, মার্জারির মত দ্রুত ওর ঘরের দরজায় সরে গিয়ে, ফিসফিস করে বলল, 'ওরা উঠে পড়বে।'

দরজাটা আস্তে আস্তে বন্ধ করল। নিজেকে আর একবার বিদ্রূপ করতে ইচ্ছা করল আমার। তবু, আমার ঠোঁটের কোণে একটা হাসি জেগে উঠল। এ খেলাটা কিসের? একদিকে নিরাপত্তা, আর একদিকে নায়িকার ভূমিকা? নাকি, নদীর ধারের আচরণের জন্য, এটা এক ধরণের ক্ষমা চাওয়া। আমি আলোটা নিভিয়ে দিয়ে শুতে গেলাম।
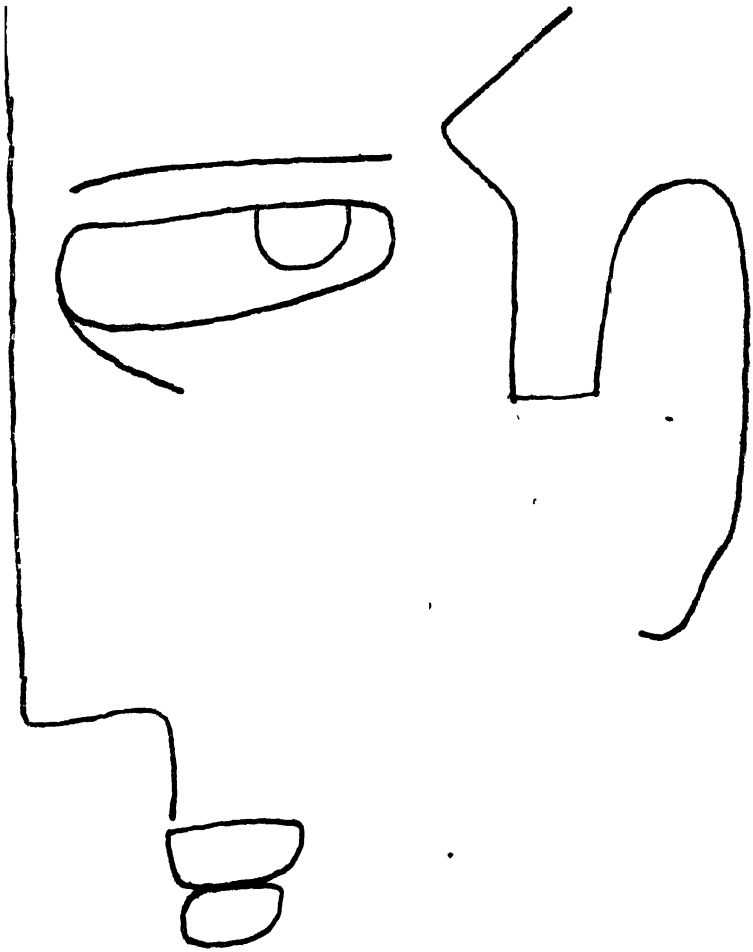
অলক

সকাল হয়ে গেছে দেখছি। বেশ বেলাও হয়ে গিয়েছে। উঠে দেখি, শান্তনু আর উশীনর, বেরোবার জন্য প্রস্তুত। ওরা একটু আশেপাশে ঘুরে দেখতে যাচ্ছে। ওদের ব্রেকফাস্ট খাওয়া সারা। বৈজু রেডি। তা যাক, নাট্যকার আর পরিচালক, ওরা ওদের কাজে

যাচ্ছে। আমি আর এখন যাচ্ছি না। কিন্তু চিড়িয়াটি গেল কোথায়, সুদীপ্তা ? সে ছু ড়িও যাবে নাকি! কিন্তু এরা তো দেখছি বেরিয়ে পড়ল। আমি বাইরে দাঁড়িয়ে দেখলাম, গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে গেল।

চৌকিদার নিজেই বাংলোর বারান্দায় আমাকে চা এনে দিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'দিদিমণি কোথায় ?'

বলল, 'মেমসাব গোসলখানামে।'

মনে মনে বললাম, 'বহুত আচ্ছা।' ঠিক এরকম ভাবে বোধহয় আর সুদীপ্তাকে পাওয়া যাবে না। তাড়াতাড়ি চা খেয়ে আমিও দাড়ি কামানো, চান-টান ইত্যাদি সেরে নিলাম। ফিটফাট হয়ে বাইরে এসে দেখি, সুদীপ্তা উঠোনে একটা গাছতলার ছায়ায়, বেঞ্চিতে চুপচাপ বসে আছে। আমি আগে ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিতে গেলাম।

খেয়ে বাইরে এসে আর সুদীপ্তাকে দেখতে পেলাম না। কোথায় গেল? রান্নাঘরের দিকে গেলাম, সেখানেও নেই। চৌকিদারকে জিজ্ঞেস করতে বলল, 'ঘুরতে ঘুরতে কোথায় গেল।' বনের দিকে নাকি? লাগাম ছাড়া ঘোড়ার মত মনে হল নিজেকে। আজ একটা হেস্তনেস্ত করতে হবে। এমনি এমনি, রূপ দেখাবার জন্য, আর উশীনরের সঙ্গে প্রেম করার জন্য তোমাকে আনা হয় নি। আমারও দরকার আছে।

কাল বোধহয় উশীনর সুদীপ্তার ঘরে অনেক রাত অবধি কাটিয়েছে। তা না হলে আর বাইরের ঘরে পড়ার ঠাট করে বসত না। অবিশ্যি বলতে পারি না, ওদের কথা আবার আলাদা। হয়তো সত্যি সত্যি পড়ছিল। কিন্তু সন্দেহ হয়। এর মধ্যেই তো সুদীপ্তা 'তুমি' হয়ে গিয়েছে। সেই মুখের সিগারেটও খেয়েছে। কী যে বলে, কিসের জল কিসে গেল, বদনার জল দোষের হল, তা নিশ্চয়ই হবে না। সিগারেট ছেড়ে দিয়ে কাল রাত্রে বোধহয় মুখে মুখই মিলেছে।

তা মিলুক গিয়ে, উশীনরের ওটা পাওয়ানা। আমি বাবা বঞ্চিত

কেন। কাল রাত্রে শান্তনু নিজেই বলেছে, 'আজকের রাতটা উশীনর আর ময়নার, ওদের নিশ্চয় কোন আণ্ডারস্ট্যাণ্ডিং হয়ে গেছে।'

কথাটা আমারও মনে ধরেছে। নিশ্চয়ই তুজনের মধ্যে একটা কিছু ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছে। ভাব দেখলে তো বোঝা যায়। কিন্তু গেল কোথায়? নদীর ধারে অনেকটা তো চলে এলাম। আশেপাশে তাকাচ্ছি। হঠাৎ মনে হল, নদীর ধারে, বড় একটা অর্জুন গাছের পাশে, বেগুনি রঙের আচল দেখা যাচ্ছে। ফুল তা হলে ওখানে ফুটে আছে। যাই দেখি, তোলা যায় কী না।

আস্তে আস্তে গিয়ে দেখি ঠিক তা-ই। সবে ওর আঁচলটা ধরতে যাব, শুনতে পেলাম, 'বরষাত মে বহুত পানী হোতা।'

ধুত্তোরি বর্ষাত, এই আবার কে। দেখি, বাংলোর চাকরটা জলের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। তাকে রেয়াত না করেই আমি সুদীপ্তার গা ঘেষে দাঁড়িয়ে বললাম, 'বেড়াতে বেরিয়েছ?'

সুদীপ্তা আমাকে দেখে অবাক হয়ে বলল, 'আপনি এসে পড়েছেন এখানে?'

'হ্যাঁ, আমিও বেড়াতে বেরোলাম। চল না, আর একটু এগোই।'

সুদীপ্তা বলল, 'না, আমি এবার ফিরব।'

'আরে চলই না।'

আমি ওর হাত ধরে টানলাম। ও শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। কী ভাবল, কে জানে। বলল, 'এই রোদে কোথায় যাবেন। চলুন তার চেয়ে বাংলোয় গিয়ে বসি।'

কথাটা মন্দ মনে হল না। বললাম, 'চল তা হলে।'

মনে মনে ভাবলাম, একটু পানও করে নেওয়া যাবে। বাংলোর উঠোনে পা দিয়েই সুদীপ্তা সোজা চলে গেল রান্নাঘরে। আমি ঘরেই গেলাম। হুইস্কিতে জল মিশিয়ে খেলাম, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে। তাড়াতাড়ি খেয়ে আবার রান্নাঘরের দিকে গেলাম। সেখানে সুদীপ্তা নেই, আবার হাওয়া। জিজ্ঞেস করতে বলল, এইমাত্র নাকি এখান থেকে বেরিয়েছে। কোথায় গেল, আবার জঙ্গলে নাকি? চাকর

আর চৌকিদার দু-জনেই তো রয়েছে। আমি বাংলোর পিছনদিকে নিরালা বাগানের দিকে গেলাম। হাওয়া খেলা ছাড়া আর কিছুই খেলছে না। মেয়েটা গেল কোথায়?

আমি বাংলোয় ফিরে এলাম। বসবার ঘরে ঢুকতেই দেখি, সুদীপ্তা ওর ঘরে। দরজাটা খোলা, ও আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কী যেন করছে। আমি সোজা ঢুকে গেলাম। পিছন থেকে জড়িয়ে ধরে ঘাড়ের ওপর চুমো খেলাম। ও তাড়াতাড়ি সরে যাবার চেষ্টা করল, আমি ওকে একেবারে পাঁজাকোলা করে তুলে, একটা পাক খেয়ে নিলাম। ও একটা ভয় পাবার শব্দ করল। খাটে শুইয়ে দিয়ে আমি ওর পাশে শুয়ে পড়লাম। ও বলে উঠল, 'অলকবাবু প্লীজ।'

'না, প্লীজ আবার কী, একটু আদর করতে দোষ কী।'

আমি ওকে সর্বাঙ্গে জড়িয়ে, ঘন ঘন চুমো খেতে লাগলাম। ও হঠাৎ নিজেকে একেবারে ছেড়ে দিল, আর এমন ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল, খাটটা শুদ্ধ কেঁপে উঠল। আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম। বদমাইসি করতে পারি, তা বলে এরকম কান্নাকাটি! এ আবার কী বাবা! জামাকাপড় একদম এলোমেলো, প্রায় ল্যাংটো হয়ে গিয়েছে। কোন জোরজারি নেই, এখন তো যা খুশি করতে পারি। কিন্তু এরকম কাঁদলে তো মুশকিল। আমি বললাম, 'আরে ময়না শোন, কাঁদছ কেন, আমি চলে যাচ্ছি।'

কান্না আরো বেড়ে গেল, বালিশ দিয়ে মুখ ঢাকল। কী করব কিছু বুঝতে পারছি না। লেন-দেন হয়, গায়ে গায়ে শোধ হয়ে যায়, আমি সেটাই বুঝি। ঝকমারিতে নেই আমি। এখন তো দেখছি তাতেই পড়লাম। আবার ওকে ডাকলাম, 'ময়না শোন, কান্নাকাটি করো না।'

সুদীপ্তা কাঁদতে কাঁদতেই বলল, 'আপনি কেন আমার সঙ্গে এরকম করছেন, আমি কী করেছি?'

'করবে আবার কী, এমনি একটু। তা তোমার ইচ্ছে না থাকলে থাক।'

'এভাবে কি কারোর ইচ্ছে হয়?'

এ আবার কেমন কথা? অন্যভাবে হলে ইচ্ছে আছে নাকি? কিন্তু বলেও, মুখ ঢেকে কাঁদতেই লাগল। আবার বলল, 'কী ভাবেন আমাকে বলুন তো? জীবনে কোথাও দাঁড়াতে পারলাম না, ভবিষ্যতের কোন আশা নেই, আর সবাই যদি আমাকে এভাবে ছিঁড়ে খেতে চায়, তা হলে আমার পরিণতিটা কী হবে?

কথাগুলো এমনভাবে বলল, শুনে কেমন কষ্ট হল। ওর ব্লাউজের হাতা সরে গিয়ে, ব্রেসিয়ারের ফিতে দেখা যাচ্ছে। কাঁধে চাপড় দিয়ে বললাম, 'আচ্ছা, ঠিক আছে, তুমি কান্নাকাটি করো না।'

বলে আমি নিজেই ওর জামার হাতা টেনে দিলাম, হাঁটু থেকে শাড়ি নামিয়ে দিলাম, এমন কি বুকের ওপর আঁচলটাও তুলে দিলাম। একটি কথা বলল না, আপত্তি করল না। তারপরে মুখের ঢাকনাটা সরিয়ে দিয়ে দেখি চোখগুলো লাল, মুখটাও লাল হয়ে গিয়েছে। কপালের ওপর রুক্ষু চুল। আবার আমার গোলমাল হয়ে গেল, আমি ওর ঠোঁটে চুমো খেলাম। কোন আপত্তি করল না, কেবল উঠে পড়ে, আঁচল দিয়ে মুখ মুছল। আমি বললাম, 'তুমি আমাকে যতটা খারাপ ভাবছ ততটা নই, সত্যি। বুঝলে ময়না, এ নাটকে তোমার হিরোইন হওয়া উচিত, আমি বলছি।'

কথাটা কিন্তু আমি এখন মিছিমিছি বলি নি। সত্যিই তো, ওর জীবনে আশা-ভরসা করার মত কী আছে। এরকম করে বেড়ালেই তো চলবে না। আর আমার মনে হল, আশা আছে। ওকে পাবার আশা আছে, এখন তো সেই রকমই মনে হচ্ছে। কই, কোনরকম জোর-জবরদস্তি তো আর করল না। এখন থাক, পরে আবার দেখতে হবে। আমি কি ওকে আর মাগনা নিয়ে এসেছি। মনে মনে ঠিক করেই এনেছি, প্রত্যেক রাত্রে নাটক করতে, ও যা খরচ পায়, সে টাকাটা ওকে আমি দেব। কিছু বেশিই দেব। পাঁচ দিনের জন্য, শ'তিন চারেক টাকা নিশ্চয়ই দেব।

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। এই প্রথম সুদীপ্তাকে চুমো

মতলব তো স্রেফ বদমাইসি। এ সব পাপের সাজা নিশ্চয়ই তোলা আছে। জ্বরো ছেলে ঘরে রেখে, মিথ্যা কথা বলে, ফুর্তি করতে বেরুনো, এ কখনো এমনি এমনি যাবে না। নিজেকে এত খারাপ লাগে, ঠিক যেন গু খাওয়া কুকুরের মত। একবার খেলে আর ছাড়তে পারে না। আমার অবস্থা তো তা-ই। তা নইলে, কেন এমনভাবে চলে এলাম।

কিন্তু থাকতেই বা পারি না কেন। অনেক তো হল। সারা জীবন ধরেই, এই করে যাব নাকি। তাই কি হয় নাকি। বয়স কি হচ্ছে না। তবে বয়সটা বোধহয় কিছু না। এটা আমার মেণ্টালিটি —মানে আমার চরিত্র, আমার চরিত্রটাই খারাপ। যেসব বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ ওঠে, তাদের আবার বয়স কিসের। আসলে, পয়সা খরচ করে, পেয়ে পেয়ে, এটা এখন আমার রোগে দাঁড়িয়েছে। যদি বুঝতাম, আমার মধ্যে ভালবাসাবাসি আছে, তা হলেও একটা কথা ছিল। কিন্তু আমি তো একটাই বুঝেছি। ভালবাসাবাসি কোনদিন বুঝলাম না। ছেলেমেয়ে দুটোর জন্যে অবিশ্যি, মনটা থেকে থেকে কেমন করে ওঠে, জয়ার জন্যও করে। ওটাকে ভালবাসা বলে কী না, আমি জানি না। ভালবাসা বলে একটা কথা! লোকে যে-ভাবে ভালবাসার কথা বলে, তা যদি আমার থাকত, তবে কি ছেলে মেয়েকে ভুলে, আমি এসব করতে পারতাম।···অবিশ্যি, অনেক ব্যাপারেই মানুষকে অন্যায় করতে হয়। এই যে ব্যবসা—ব্যবসা করে টাকা রোজগার, খাঁটি খাঁটি বলতে গেলে, সৎ পথে থেকে ব্যবসা করে, বেশি টাকা কোনদিন রোজগার করা যায় না। সব ব্যবসায়ীই এ কথা জানে। আর ব্যবসা করা তো বেশি টাকা কামানোর জন্যই। নিজে ব্যবসা করি, নিজে তো জানি, কত হাজার রকমের কারচুপি করতে হয়। কিন্তু তাতে মনের মধ্যে কোনরকম খচখচানি থাকে না। বরং মনে হয়, যা করছি, ঠিকই করছি। করাই উচিত। এর নাম ব্যবসা। অথচ এই ব্যাপারটা···।

যাক গিয়ে, গুলি মারো এসব চিন্তায়। এসব ভেবে আর,

নিজেকে আমি বদলাতে পারব না। আমার যা হবার তা হয়ে গিয়েছে। এখন, আমার ছেলে মেয়ে, আর জয়া, এরা ভাল থাকলেই হল। আমি ভাবছি, সুদীপ্তা এরকম তলতলিয়ে গেল কী করে। পাথরের মত একটা শক্ত জিনিস যেন কেমন নরম আর তুলতুলে হয়ে উঠেছে। কী বলব—আমার প্রায় প্রেম করবার কথা মনে হচ্ছে। সুদীপ্তা কী না কাঁদে, আবার চুমো খেলে, রেগে উঠে, ধাক্কা মারল না। ভাবা যায় না। এ নিশ্চয়, উশীনরের হাতযশ।

উরে সসা, কথাটা তো আমার আগে মনেই হয় নি। কাল রাত্রেও তো আমি বলেছিলাম, ইস্কুরু যত ঢিলে হয়, ততই ভাল। কাল রাত্রে, উশীনর আর সুদীপ্তা বেশ কিছুক্ষণ অন্ধকারে বাইরে ছিল। কোথায় কী অবস্থায় ছিল, জানি না। তারপরে, উশীনর যেরকম ঠাট করে বসবার ঘরে পড়তে বসল, তাতেই ব্যাপারটা বোঝা গিয়েছিল। শান্তনু তো আমাকে একবার রাত্রে বলেও ছিল, 'নাট্যকার নায়িকার মিলন বোধহয় আজ রাত্রেই হয়ে যাবে। কী বলেন অলকবাবু?'

আমার তখন বেজায় ঘুম পাচ্ছিল। তা ছাড়া, আমার কিছু করবারও উপায় ছিল না। মেজাজটাই খারাপ হচ্ছিল। শান্তনুর মাথায় তা হলে ভাবনাটা ছিল। এর নাম ময়না পাখীর ঠোঁট বাবা! লাল ঠোঁটের টান। যাক্, আর দেখতে হবে না, যা হবার তা কাল রাত্রেই হয়ে গিয়েছে। নির্ঘাৎ। ওতে আর আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। উশীনর কাল রাত্রে কখন শুতে এসেছিল, কিছুই জানি না। শান্তনুও নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছিল। ছুটির একেবারে পোয়া বারো। সারা রাত্রি সুদীপ্তার কাছে থেকে, উশীনর যদি ভোরবেলা আমাদের ঘরে এসে শুয়ে থাকে, তা হলেও কিছু জানবার উপায় নেই। কারণ সে একলা একটা খাটে শুয়েছিল। আমি শান্তনু এক খাটে।

যাক, এতে আর এত ভাববার কী আছে! এ তো যে কোন বোকাতেও বুঝতে পারে, উশীনর কেন খাওয়ার পরে, বসবার ঘরে

পড়তে বসেছিল। মদের ঝোঁকের জন্যই সকালবেলা কথাটা আমার মনে পড়ে নি। এখন তো আমার বেশ পরিষ্কার মনে হচ্ছে, সুদীপ্তা কেন, বনে বাঁদাড়ে, ফাঁকায় ফাঁকায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল। রাত্রের ঘটনা সব একলা একলা, তারিয়ে তারিয়ে ভাবছিল। উশীনরও যে একটু দূরে দূরে রয়েছে, সুদীপ্তার দিকে বিশেষ তাকাচ্ছে না, যেটা নিয়ে আমি আবার গাড়লের মত ভাবছিলাম, 'কেটে গেল নাকি' আসলে সেটা অন্য ব্যাপার। একটা জিনিস পেয়ে গেলে যেমন নিশ্চিন্ত ভাব আসে, উশীনরের সেই রকম হয়েছে। সুদীপ্তারও তা-ই। তা-ই, কেবল আলাদা আলাদা থাকতে ইচ্ছা করছে, আর ভিতরে ভিতরে খুশিতে আদরে, আহ্লাদী হয়ে আছে। এখন মনে হচ্ছে, ও যে হঠাৎ কেঁদে উঠেছিল, সেটা আহ্লাদীরই কান্না। এখন রাগারাগি ফোঁসাফুঁসি চলে গেছে। এখন নরম আর তুলতুলে হয়ে উঠেছে। এখন কেবল কান্না। কান্নার মধ্যেও মেয়েরা একরকমের নেশা ধরায়। সুদীপ্তার কান্নার মধ্যেও, সেরকম নেশা ধরানো আছে। ওর ধরা দেবার ধাতটা বোধহয় এইরকম।

দেখা যাক, কপালে কী আছে। আরো ডীপ জঙ্গলে তো যাচ্ছি। সুদীপ্তার মত মেয়েকে, উশীনর একলা পাবে, সেটাও ঠিক না। দেখি, নতুন কায়দায় কিছু করা যায় কী না। যাই, জামাকাপড় পরে নিই গিয়ে। ওরা সবাই প্রায় তৈরী হয়ে নিয়েছে।
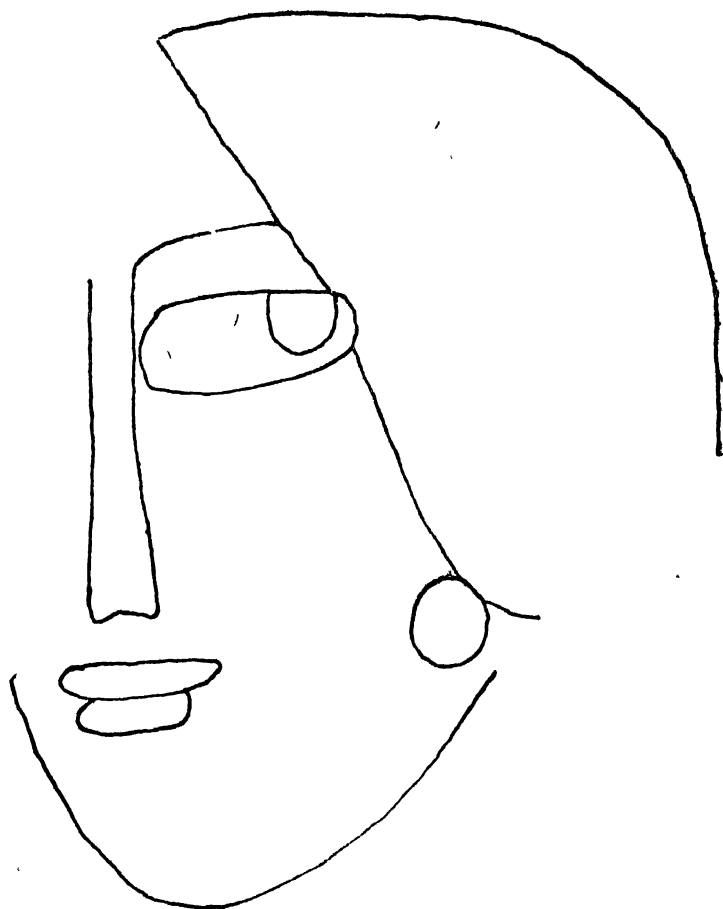
সুদীপ্তা

পাহাড়ী জঙ্গলের রাস্তাটা সত্যি সুন্দর, আবার ভয়-ভয়ও লাগছে। এমন বড় আর ঘন জঙ্গল, আমি আর কখনো দেখি নি। আর এত উঁচু পাহাড়ের ওপর দিয়ে, কখনো গাড়িতে যাই নি। গাড়িটা অনবরত পাক খাচ্ছে। একদিকে নিচু খাদ, কেবল অন্ধকার জঙ্গল। পড়ে গেলে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। শুনেছি

এ জঙ্গলে হাতী বাঘ সবই আছে। এখন আমাদের সঙ্গে, একজন পথ দেখাবার লোক রয়েছে। জঙ্গলে ঢোকবার মুখে, বনের অফিস থেকেই একজন হাফপ্যান্ট-পরা আদিবাসীকে সঙ্গে দিয়েছে, সে বৈজুর পাশে, সামনের সীটে বসেছে। শান্তনুদা বাঁ দিক ঘেঁষে দরজার কাছে। যদিও উশীনর এ জঙ্গলটা চেনে, সে এর আগেও এসেছে। উশীনর এবার বাঁ দিকের ধারে বসেছে। মাঝখানে অলক। উশীনর নিজে থেকেই ওখানে বসবে বলেছিল।

আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'আপনার ওখানে বসতে ইচ্ছে করছে?'

উশীনর কিন্তু রাগতঃ ভাবে জবাব দেয় নি। ভেবেছিলাম, গতকাল রাত্রের ব্যাপারে, সে বোধহয় আমার ওপরে রেগে আছে, তাই যতটা সম্ভব, আমার কাছ থেকে দূরে বসতে চাইছে। বরং বেশ ভাল ভাবেই বলেছে, 'একটু না হয় বদল করে বসি, আবার মাঝখানে যাওয়া যাবে।'

'ঠিক আছে।'

তবে একটা জরদ্গবকে ঠাণ্ডা করা গিয়েছে। অবিশ্যি, অলককে জরদ্গব মোটেই বলা যায় না। বরং চিতাবাঘ বলা যায় এক হিসাবে। সকাল থেকে যে-ভয়টা পাচ্ছিলাম, ঠিক তাই ঘটেছিল। ওর কাছ থেকে পালিয়ে বেড়িয়েও, শেষ পর্যন্ত ধরা পড়ে গিয়েছিলাম। অথচ ঘরের মধ্যে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, সেই মাত্রই ভাবছিলাম, দরজাটা বন্ধ করে দেব ভেতর থেকে। আর অলক এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কিন্তু খুব জোর সামলানো গিয়েছে। কান্নাটা আমার অবিশ্যি একেবারে মিথ্যে না। তবে কান্নাটা যে এতখানি কাজে লাগবে, বুঝতে পারিনি, তা-ই, কান্নাটাকেই অস্ত্র করেছিলাম। আমার অটল বিশ্বাস, অলক কোন দিক থেকেই দীনেশ না। তার শরীরে এত শক্তি নেই, আর আমার মনে হয়, তার ভোগের শক্তিও কম। কান্নাটা ওর বিঘ্ন, আগুনে জল পড়ার মত। ও স্ফূর্তি বোঝে, ওর অভিজ্ঞতা, টাকা পেলে সব মেয়েই ফুর্তি করে।

আমি নিজেও যে ঠিক কেমন পুরুষ চাই, জানি না। মাঝে মাঝে মনে হয়, যে আমাকে নিজের জোরে নিতে পারবে, আমি সেই পুরুষের। তা বলে, সে পুরুষটা দীনেশ না। দীনেশ আমাকে যা করেছিল, তারপরে কি আর একদিনও সে আমার কাছে গিয়েছিল? কোনদিনই না। ওটাকে নিজের জোরে পাওয়া বলে না, জোর করে একটা কাজ মিটিয়ে নেওয়া বলে। তারপরে কেবল ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া। যেটা দীনেশ আমার সঙ্গে করেছে।

এরকম গায়ের শক্তির কুকুরের জোরের কথা বলছি না। কিন্তু সে জোর কারোর দেখি না। যে-জোরের মধ্যে অন্য কিছু একটা থাকে। যে-জোরটাকে ভাল লাগে, যে-জোরটাকে কেন যেন পেতে ইচ্ছা করে। আজ পর্যন্ত কারোর মধ্যেই সে-জোরটা দেখলাম না। সে রকম একটা জোর, এক সময়ে শান্তনুদার মধ্যে দেখেছিলাম। দিদির ওপর সেই জোর দেখে ভাল লাগত। কখন পুরুষেরা সে-জোর করতে পারে, কে জানে। তাই, নিজের যেখানে একটু দয়া হয়, সেখানে একটু কৃপা করি। তার বেশি আর কী। এই অলকও তো তা-ই। ও আমাকে একটু ভোগ করে নিতে চায়, যেমন অনেক মেয়েকেই করে। পাচ্ছে না বলে, ওর টাকার আর প্রতিপত্তির অহংকারে লাগছে। ওর পৌরুষ বা মনের জোর, কোনোটাই নেই।

অলককে আমি ঠাণ্ডা করতে পেরেছি, পারবও। আমাকে পাবার জোর ওর নেই। শান্তনুদাও আমাকে ছেড়ে কথা কইবে বলে মনে হয় না। সেই যে, আমাকে দেখে দিদির কথা মনে পড়ার বুলি ধরেছে, তাতেই বুঝতে পারছি, গতিক সুবিধার না। কিন্তু এই শান্তনুদা-ই কি নিজের জোরে আমাকে চাইছে? শান্তনুদা কৃপা চাইছে, দয়া চাইছে, হয়তো সুযোগ পেলে জোরও করবে। এরকম একটা অবস্থায়, সে সুযোগের খুবই সম্ভাবনা। আসলে এরকম একটা পরিবেশে, একটি মেয়েকে ভোগ করে নেওয়া। এরকম অবস্থায়, সবাই একটু লাগাম ছাড়া হয়। কিন্তু আমি তো আর তা

বলে লাগাম ছাড়া হই নি। হবও না। মনে হয়, শান্তনুদাকেও আমি সামলাতে পারব।

উশীনরের সঙ্গেই যেন একটু কাঠে কাঠে হচ্ছে। এক কথাতেই বলা যায়, উশীনর, অলক আর শান্তনুদা না। উশীনর তাদের মত করে আমাকে চায়নি। কিন্তু চায় না, এ কথা আর বলব না। সে-ও আমাকে চায়। অবিশ্যি, তার চাওয়াটা আমি তৈরি করেছি খানিকটা। কারণ, প্রথমেই মানুষ হিসাবে তাকে ভাল লেগেছে, তাছাড়া দেশ-জোড়া খ্যাতিমান নাট্যকার। দেখতে সুন্দর, ব্যবহার মিষ্টি। দুজনের হাত থেকে বাঁচবার জন্য, তাকেই আমি আশ্রয় করতে চেয়েছি।

আমি জানি না, পরশু রাত্র থেকে, তার সঙ্গে যে খেলাটা আমি শুরু করেছি, সে টের পেয়েছে কী না, কিন্তু মানুষটা বড় অহংকারী। প্রতিটি মুহূর্ত চিন্তা করে, প্রতিটি কথাকে বিচার করে। তবে হায় নাট্যকার, এত ঘটনা বোঝ, এত মেয়ে-পুরুষের চরিত্র বোঝ, সুদীপ্তার সবটুকুই কি বুঝতে পেরেছ? বোধ হয় না। তাহলে, তোমার অহংকার এত তিলে তিলে ভাঙত না। সুদীপ্তার জন্য, তোমার মন আনচানিয়ে উঠত না। সেটা ধরা পড়েছে। এর পরিণতি কী, আমি জানি না, কারণ উশীনরকে আমি সামলাব, সেকথা কেন যেন ভাবতে পারি না। সেই সুযোগ কি ও দেবে? ও বড় চতুর। অথচ উশীনর যে আমাকে জোর করে নেবে, তাও না। ও হাত পেতেও নেই।

উশীনরের ভাবটা এইরকম, হ্যাঁ, ভাল লেগেছে। তুমি চাও কি? তুমি যদি চাও, তবে আমিও চাই। না হলে তফাত যাও। এটা কি বেশি পেয়ে পেয়ে হয়েছে, নাকি একটা অহংকার? উশীনর কেন কাল রাত্রে আমাকে বলল না, 'হোক অন্ধকার, নদীর ধারে তুমি আমার কাছে থাক।' উশীনর কাল রাত্রে, ঘরের মধ্যে, আমার ঠোঁট ছোঁয়ানোর মুহূর্তেই কেন, আমাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরল না? ছুটে এল না কেন আমার কাছে? আমি তাড়াতাড়ি ছুটে চলে

গিয়েছিলাম বলে ? পাগল হয়ে ডাক দিল না কেন আমাকে। দরজায় ধাক্কা দিল না কেন, ধাক্কা দিয়ে কিছু বলল না কেন। আমি শুনতাম ওর কথা, বুঝতাম ওর মনের ভাব। বড় চতুর, ধড়িবাজ এই উশীনর। ও অজগরের মত গুহায় বসে আছে, শিকার ওর মুখে এসে ধরা দেবে। সেই জন্যই, আমার কাছে আসা, আর ফিরে যাওয়ার খেলা।

উশীনর দীনেশ না, অলক শান্তনু না, আমার চাটুকার সেবক কৃপাপ্রার্থীও না। কিন্তু কাল রাত্রে ঠোঁটে ঠোঁট ছুঁইয়ে দেবার পরেও, উশীনর আজ সকালে এত কাজে ব্যস্ত কেন ? আমার দিকে সেই চোখ নেই কেন ? ও কি আমার চালাকি ধরে ফেলেছে ? সেটা কি এত সহজ ? আমি তো খুব নিখুঁত পার্ট প্লে করেছি। কিন্তু আমার সন্দেহ হচ্ছে।

সত্যি বলতে কি, আমার মন চাইছে, উশীনরের কাছে পুরো ধরাও দেব না, ওকে এড়িয়ে যেতেও দেব না। কতক্ষণ এই খেলাটা চলতে পারে জানি না। খেলা সার্থক হলে, উশীনরও এদের মতই হয়ে উঠবে। তাহলে ষোলকলা পূর্ণ। তাছাড়া, সুপর্ণা—সুপর্ণার জায়গা কি আমি 'কিন্নরী'তে পাব ? সেটাও আমার মাথায় আছে।

ক্রমে অন্ধকার হয়ে এল। গাড়ির আলো ছাড়া, পৃথিবীতে আর আলো নেই। অলক রীতিমত আমার গা ঘেঁষে বসেছে, তবে উৎপাত কম, ওতেই শান্ত আছে। জঙ্গলের পথ বলেই বোধহয়, ড্রিংক করছে না, তাহলে আবার অন্য মূর্তি দেখা যেত। শান্তনুদার পাশে বসে লোকটা বলে যাচ্ছে, জঙ্গলের কোথায় কোথায় হাতীর উপদ্রব বেশি, কোথায় ভাল্লুকের, কোথায় বাঘের। কোন অংশটা গেম্ স্যাংচুয়ারি। সবাই চুপচাপ, কেবল গাড়ির শব্দ। লোকটার কথা থেকে, একটাই ভয় লাগছে, যে কোন মুহূর্তে নাকি বুনো হাতীর পাল সামনে পড়তে পারে। ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। তার ওপরে, লোকটা বলছে, হাতি নাকি ক্ষেপে গেলে, গাড়ি শুদ্ধ ঠেলে,

পাহাড়ের নীচে ফেলে দেয়। তাহলে, এমন জায়গায় আলার দরকার কি বাপু।

মাঝে মাঝে উশীনর, আদিবাসী লোকটার সঙ্গে কথা বলছিল। একটা প্রসঙ্গে, সবাই উত্তেজিত হয়ে উঠল। উশীনর লোকটাকে জিজ্ঞেস করল, সে বস্তি থেকে মেয়েদের আর পুরুষদের এনে, বাংলোতে নাচের আয়োজন করতে পারবে কী না। সে জানাল, সাহেবের (উশীনরের) যদি ইচ্ছা হয়, তাহলে, কাল রাত্রে ব্যবস্থা হতে পারে, সবাইকে খাইয়ে দিলেই হবে। খাবার মধ্যে, ছোলার ঘুগ্‌নি আর হাঁড়িয়া আর কিছু বিড়ি। অলক আর শান্তনুদা ক্ষেপে উঠল, এটা করতেই হবে। অলক বলল, 'দরকার হয়, একশো টাকা খরচ হবে।'

উশীনর বলল, 'তবে, দেখো অলক, নিজেকে ঠিক রাখতে পারবে তা! ওদের মেয়েদের স্বাস্থ্য সৌন্দর্য অনেক বেশি, ঢাকাঢুকি বিশেষ নেই।'

অলক বলল, 'বহুত আচ্ছা, কিছু বললে মেরে-টেরে দেবে না তো?'

'সেটা তোমার বলার ওপরে নির্ভর করে। ঠিক মত বলতে পারলে, সবই হয়। তবে, তুমি নাচতে চাইলে, মেয়েরা তোমাকে দলে নেবে।'

অলক প্রায় লাফিয়ে উঠল। শান্তনুও চেঁচিয়ে উঠল, 'চমৎকার।'

উশীনরের তাহলে, এসবও বেশ জানা আছে। আমার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করছে, আদিবাসী মেয়েদের সঙ্গে, সে কী রকম নেচেছে, আর আর ব্যাপারগুলোই বা কী ভাবে ম্যানেজ করেছে? অলক আর শান্তনুদাকে দেখে তো মনে হচ্ছে, ওরা পারলে এখুনি মেয়েদের সঙ্গে নাচে। তবে এটা ঠিক, নাচাতে হলে, সেটা মেয়েরাই পারে। অলক, আমাদের পথ দেখাবার লোকটাকে এখনই আদেশ দিয়ে দিল, আগামীকাল রাত্রের জন্য যেন সে আয়োজন শুরু করে দেয়।

রাত্রি প্রায় আটটার কাছাকাছি, আমরা বাংলোতে এসে পৌঁছলাম। উশীনর গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল, 'সভ্যজগতের সীমা ছাড়িয়ে অনেক দূর এসে পড়েছি।'

আমারও তাই মনে হল। চারপাশটা একেবারে নিঝুম, ঝিঁঝির ডাক ছাড়া। আকাশটা যেন কত বড়, আর তারায় ভরা। এখানকার বাংলোতে কাজ করবার লোক বেশি। তারা এসে ঘর দরজা খুলে দিল। ইলেকট্রিকের কথা এখানে ভাবাই যায় না। প্রায় আট ন'টা হ্যারিকেন জ্বলল। বাংলোটাও অনেক বড়। তিনটে শোবার ঘর, সবগুলোতেই আলাদা বাথরুম আছে। দুটো বেশ বড় ঘর, একটা একজনের শোবার মত। তবে, জলের ব্যবস্থা আছে। ট্যাঙ্কে জল ভরে দিলেই, কল খুললে পাইপ বেয়ে আসে।

খনি শহর থেকেই, কয়েকটা মুরগী কিনে আনা হয়েছিল। রান্নার আয়োজন, ঘর-দোর গোছানো, সব মিলিয়ে, বাংলোতে সাড়া পড়ে গেল। সবাই এক-সঙ্গেই বাথরুমে ঢুকল, একজন ছাড়া। তবে সকলেই তাড়াতাড়ি প্রস্তুত হয়ে নিল। তারপর বাইরের ঘরে সবাই জমায়েত। আমি আমার ঘরে হ্যারিকেনটা নিয়ে, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, একটু প্রসাধন করে নিলাম। তার মধ্যেই শুনতে পেলাম, বাইরের ঘরে বোতল গেলাসের আসর শুরু হয়ে গেল। আমার মরণ নেই, এই জঙ্গলে, রাত্রিবেলাও আমি ঠোঁটে রঙ মাখলাম, চোখে একটু কাজল লেপে দিলাম। কে জানে বাপু উশীনরের সেই বনের মেয়েরা কত সুন্দর, হয়তো আমাকে আর কারোর নজরেই পড়বে না।

ঘর থেকে বেরোতে বেরোতেই শুনতে পেলাম, উশীনর বলছে, 'আমি হুইস্কি খাব।'

অলক বলল, 'ভেরি গুড।'

উশীনর যেন হঠাৎ পানের মাত্রাটা বাড়িয়ে দিয়েছে। বীয়রের ওপর দিয়ে চলছিল। এখন জিন বা হুইস্কি না হলে চলছে না। আমাকে দেখে অলক বলল, 'বীয়র খাবে নাকি?'

বললাম, 'খাব।'

'ভেরিই-ই গুড।'

শান্তনুদা আমাকে একবার দেখল। উশীনর একটা সুন্দর কুর্শি দেখিয়ে আমাকে বলল, 'বস।'

কথায় বার্তায় ব্যবহারে, উশীনরের পার্থক্য কেউ ধরতে পারবে না। ও যে আমাকে এড়িয়ে চলছে, সেটা বোঝা গেলেও, ব্যবহারে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। সকলেই পানীয় নিয়ে বসল। অলক তাস নিয়ে এল। আমি বললাম, 'কে কোন্ ঘরে শোবে, ঠিক হয়ে যাক।'

অলক বলল, 'সেটা আমি ঠিক করে ফেলেছি। দুটো ডাবল-বেডেড রুমে, আমরা তিন জন। সিঙ্গল্ বেডে ময়না।'

উশীনর বলল, 'আমি থাকব ডাইনিং রুমের পাশের ডাবল-বেডেড রুমে।'

অর্থাৎ, আর দুটো শোবার ঘর পাশাপাশি। একটাতে অলক-শান্তনু থাকবে, পাশেরটা-তে আমি। এমনিতে আমার ভয়ের কিছুই নেই, আমাকে ঘর থেকে বেরোতে হবে না কোন কারণেই। কিন্তু উশীনর চলে যেতে চাইছে, বাংলোর একটেরেতে, সেখান থেকে সে আমাদের কথাবার্তাও শুনতে পাবে না, একেবারে নিরালা। আমি একবার উশীনরের দিকে তাকালাম। সে খনিশহর থেকে বিকালে কিনে নিয়ে আসা খবরের কাগজ দেখছে। অলক তাকে বলল, ও. কে.।'

চারদিক এত নিঝুম যে, আমরা একটু চুপ করলেই যেন, চারদিক থেকে কী একটা গ্রাস করতে আসছে। শান্তনুদা খুব তাড়াতাড়ি ড্রিংক করছে। তার চোখ লাল হয়ে উঠছে। আমি অলককে বললাম, 'তাস পেড়ে বসুন।'

'এস, একটু ফিশ্ খেলা যাক।'

উশীনরের আপত্তি নেই। কেবল শান্তনুদা খেলতে চাইল না। রামের বোতল নিয়ে ঘরের বাইরে, বারান্দায় চলে গেল। বারান্দায় অনেকগুলো ইজিচেয়ার আছে। আমরা তাস খেলা শুরু করলাম। কিন্তু আমি বেশি হারতে লাগলাম। আমার ভাল লাগছে না। খেলায় মনযোগ দিতে পারছি না, আমার নিজেকে যেন কেমন একলা লাগছে। আমার অন্য কথা বলতে ইচ্ছা করছে, গল্প-গুজব

করতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু কারোরই সেরকম ইচ্ছা নেই। অনেকবার উশীনরের দিকে তাকালাম। তার মনোযোগ খেলায়। মাঝে মাঝে আমাকে বলছে, 'এত হারছ কেন, খেলায় তোমার মন নেই দেখছি।'

চমৎকার উশীনর, অভিনয়ে তুমিও আমার থেকে কম যাও না দেখছি। অলকের নেশা যত বাড়ছে, আমার দিকে হাতও তত বাড়ছে। কখনো আমার কোলের ওপর, কখনো হাতের তাস জিতে নামিয়ে দিয়েই, গাল টিপে দেওয়া। ক্রমে এটা বাড়তেই থাকবে। আমিও কাঁদবার জন্য রেডি হয়ে আছি। সেরকম অবস্থা একবার এলেই হয়, ভেউ ভেউ করে কাঁদব।

আমারও বীয়রের নেশা জমেছে একটু। শেষ পর্যন্ত বিরক্ত হয়ে তাস ফেলে দিলাম, 'দূর ছাই, আমার খেলতে ভাল লাগছে না।'

অলক বলল, 'তোমার খিদে পেয়েছে, না?'

বুদ্ধু আর কাকে বলে। বললাম, 'হ্যাঁ তাই।'

উশীনর বলল, 'একটু শুয়ে থাক গিয়ে, খাবার সময় ডেকে নেওয়া যাবে।'

আমার ঠোঁট বেঁকে গেল। মনে মনে বললাম, থাক উশীনরবাবু। প্রখ্যাত নাট্যকার, আপনাকে আর উপদেশ দিতে হবে না। ওকেই বললাম, 'চলুন না, বেড়িয়ে আসি।'

উশীনর অবাক হয়ে বলল, 'এখানে কোথায় বেড়াতে যাবে এখন, বাঘে খেয়ে ফেলবে।'

আমি উশীনরের চোখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। উশীনরও তাকাল, আবার তাসের দিকে তাকাল। অলক আমার হাত ধরে টেনে একেবারে তার কোলের ওপর টেনে নিতে চাইল। উশীনর হেসে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল, 'যাক, খেলা তাহলে শেষ।'

বলেই সে চলে গেল। আর সঙ্গে সঙ্গে অলক আমার গালে তার ঠোঁট ছুঁইয়ে দিল। আমি করুণ স্বরে বললাম, 'কেন এরকম করছেন, ছি ছি! সব কিছুরই তো একটা সময় আছে।'

এরকম কথা বললেই অলক ঠিক থাকে, ভাবে, তা হলে অন্য সময়ে

সুযোগ আছে। · ছেড়ে দিয়ে বলল, 'বস না, একটু খেলি।'

'না, আমি আমার ঘরে যাব।'

বলেই, আমার ঘরে চলে গেলাম। আঁচল দিয়ে গালটা মুছতে মুছতে, মনে মনে বললাম, 'কুকুর, শুয়োরের বাচ্চা, শালা!'

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে, গালটা ঘষতে ঘষতে লাল হয়ে গেল। কিন্তু ঘরে একলা কেমন ভূতুড়ে ভাব লাগছে। এরকম ভয়ংকর অন্ধকার জঙ্গলে, কেউ একলা একলা থাকতে পারে নাকি। উশীনরকে নিয়ে যে কাল রাত্রের মত একটু খেলব, তারও কোন সুযোগ দেখছি না। সে কি সত্যি সত্যিই বুঝে ফেলেছে নাকি। একদম কাছে ঘেঁষতে দিচ্ছে না। না, কাজটা বোধহয় ভাল করি নি। এত বড় একটা লোক, তাকে নিয়ে চালাকি। কিন্তু বড় বলেই তো তাকে নিয়ে চালাকি। বাদ বাকীদের নিয়ে আমার এত চালাকির দরকার নেই। উশীনর ভাঙুক, মচকাক, আমি তা-ই চাই। যে করে হোক, এখন এটাই আমার একমাত্র ধ্যান জ্ঞান। কেন এরকম মনে হচ্ছে, জানি না।

আবার আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। অলকের আর শান্তনুদার শোবার ঘরে বা বসবার ঘরে কেউ নেই। ডাইনিং রুম আর উশীনরের ঘরের দিকটা অন্ধকার। সেখান থেকে হ্যারিকেন-গুলো এখন সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। কে কোথায় গেল, কে জানে।

আমি বারান্দার দিকে গেলাম। সেখানেও অন্ধকার। অস্পষ্ট দেখা যায় সারি সারি ইজিচেয়ার। বেতের সোফা। তার সঙ্গে টবে রাখা বিভিন্ন গাছ। কাউকে দেখতে পাচ্ছি না। উঠোনের একদিকে মোটরগাড়ির চেহারাটা দেখতে পাচ্ছি। পিছনে দূরে, রান্নাঘরে দু একটা গলার স্বর শোনা যাচ্ছে। আমি বারান্দার ওপর দিয়ে, পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলাম।

'ময়না!'

শান্তনুদার গলা। পাশে তাকিয়ে দেখি, অন্ধকারের মধ্যে মিশে

শান্তনুদা একটা চেয়ারে বসে আছে। বললাম, 'এখানে বসে আছেন?'

'হ্যাঁ, এই অন্ধকার আর নিঝুম বন, এটাই ভাল লাগছে। একটু বসবে এখানে ময়না?'

শান্তনুদার গলা এমনিতে মোটা, এখন যেন তা কেমন ভেজা ভেজা দুঃখীর মত শোনাচ্ছে। আমি পাশের বেতের মোড়ায় বসলাম। শান্তনুদা আমার কাঁধে হাত রাখল। কী গরম আর মোটা হাত। বলল, 'কাল থেকে কী হয়েছে ময়না, সোনার কথা বার বার মনে পড়ছে, আর তোমাকে কাছে পেতে ইচ্ছা করছে।'

সেটা তো আমি জানি, কিন্তু আমারও যেন কেমন নেশা লাগছে। কী বলতে কী বলব, তাই চুপ করে রইলাম। শান্তনুদা বলল, 'মানুষ খুব অদ্ভুত ময়না, সে অপরকে চেনে না, নিজেকেও চেনে না।'

কথাটা কেন আসছে জানি না, তবে, কথাটা সত্যি। আজ বিশেষ করে আমারও যেন সেই রকম মনে হচ্ছে। শান্তনুদা পিছন থেকে আমার গলাটা জড়িয়ে ধরলেন। যদি বিশ্বাস করতে পারতাম, তা হলে শান্তনুদার কোলে হয়তো আমি মাথা রেখে শুয়ে পড়তে পারতাম। বললাম, 'কথাটা ঠিক শান্তনুদা।'

'ময়না, সোনার কাছে অপরাধ আমার কোনদিন ঘুচবে না।'

'ও কথা আর মনে রাখবেন না।'

'ভুলতে যে পারি না ময়না।'

'ভোলা ছাড়া উপায় কী।'

শান্তনুদা একটু চুপ করে রইলেন, তারপরে আমাকে আর একটু বেশি করে টেনে নিয়ে বললেন, 'তুমি কি সে দায়িত্ব নিতে পার না ময়না?'

খেলা শুরু হল বোধহয়। জিজ্ঞেস করলাম, 'কিসের?'

'এই সোনাকে ভোলার?'

'সেটা কী ভাবে হতে পারে বলুন।'

ভেবেছিলাম, শান্তনুদা বেশ শান্তই আছে এখনো। কিন্তু সে

ঝুঁকে পড়ে, এক লহমায়, আগ্রাসী চুমোয় আমার নিশ্বাস বন্ধ করে তুলল। আমি জোর করে শান্তনুদাকে সরিয়ে দিলাম, বললাম, 'কী করছেন শান্তনুদা, ছি।'

কিন্তু ও শুনল না, হঠাৎ উঠে একেবারে আমার পায়ের কাছে বসে, আমার কোমর জড়িয়ে ধরে, আমার কোলের ওপর মুখ গুঁজে দিল। কাঁদবার চেষ্টা করছে কী না, কে জানে। আবার মুখ তুলে বলল, 'সেই জন্যেই বলছিলাম ময়না, মানুষ খুব অদ্ভুত। তোমাকে এত ছেলেবেলা থেকে দেখেছি, সেটা আর মনে থাকছে না। সোনার মুখ মনে করে, আজ যেন তোমার মধ্যেই তাকে দেখতে পাচ্ছি। তাই বলছি তুমি পার সোনাকে ভোলাতে।'

মনে মনে বললাম, শুধু ছ একটি রাত্রের জন্য, কলকাতা থেকে দূরে, এই জঙ্গলে। শান্তনুদা তার মুখ আমার বুকে গুঁজে দিল। আমি ঠেলতে লাগলাম, শুনল না। আমাকে আরো আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরে, মুখ তুলে এনে বলল, 'তোমার পায়ে পড়ি ময়না, পায়ে পড়ি···।'

মুহূর্তের মধ্যেই বুঝতে পারলাম, শান্তনুদা কী করতে চাইছে। শান্তনুদা আমাকে নিচে ফেলে দিতে চাইছে, আর একটা চরম ব্যাপারের দিকে এগোচ্ছে। এ অবস্থায় আর শান্ত ঠাণ্ডা গলায় কথা বললে, অন্ততঃ এ লোক শুনবে না। আমি একেবারে ঝাঁজিয়ে উঠলাম, 'চুপ করুন, মুখ খুলতে আপনার লজ্জা করে না? ছাড়ুন আমাকে।'

বলে আমি জোর করে হাতের ঝাপটা দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে শান্তনুদার হাত শিথিল হয়ে গেল, আমি তেমনি করেই বললাম, 'আজ আপনি আমাকে মায়াকান্না শোনাতে এসেছেন, দিদির কথা ভুলতে পারছেন না। লজ্জা করে না, সেদিন একটা মেয়েকে কী ভাবে দূর করেছিলেন, কী ভাবে অপমান করেছিলেন?'

শান্তনুদা নীচু দম-বন্ধ গলায় বলল, 'শোন ময়না, শোন—'

'কোন কথা শুনতে চাই না। আমি আপনাকে বিশ্বাস করি না, আপনাকে আমি সে চোখে কোনদিন দেখি নি, দেখবও না।'

বলে আমি সরে এলাম, আর শান্তনুদা ধপাস করে বেতের সোফাটার নীচে উপুড় হয়ে পড়ল, শোনা গেল, 'ময়না, একটু দয়া, একটু—'

'আপনি একটা মাতাল, আপনার ভিতরে কিছু নেই।'

আমি আরো সরে গেলাম, শান্তনুদা তেমনি পড়ে রইল, কোন কথা আর বলল না। জানতাম, এ ছাড়া, শান্তনুদার হাত থেকে আমার রেহাই ছিল না। আসলে, আমার দিদির শক্ত মুখ আর জেদটাই এখন ওর মনে পড়ছে, তাই আমাকেও ভয় পাচ্ছে। জানে, এখানে আর কিছু করবার নেই। আমার ঠোঁটের কোণে হাসি খেলে গেল। আমি ঘরের দিকে যেতে গিয়ে, উঠোনের মোরামের ওপর পায়ের শব্দ পেলাম। কে যেন এগিয়ে আসছে। অলক হতে পারে। তাই তাড়াতাড়ি ঘরের আলোয় চলে গেলাম।

প্রায় আমার পিছনে পিছনেই উশীনর ঢুকল। জিজ্ঞেস করলাম, 'কোথায় ছিলেন?'

'খাদের মাচায়।'

'সেটা আবার কোথায়?'

'এই তো, বাংলোর উঠোনের নীচেই তো জঙ্গল আর খাদ। তার ওপরে অনেকখানি এগিয়ে সাঁকোর মত করা আছে, রেলিং ঘেরা। চারদিকের ভিউ দেখবার জন্য।'

উশীনর তার গেলাসে হুইস্কি ঢালল। ব্যাপার কী, এত খাওয়া কেন? বললাম, 'আজ খুব খাচ্ছেন দেখছি।'

'ভাল লাগছে। তোমাকে বীয়র দেব?'

'না, বীয়র ভাল লাগছে না, একটা সিগারেট দেবেন?'

'নিশ্চয়ই।'

সিগারেটটা দিয়ে, নিজের হাতে লাইটারে ধরিয়ে দিল। আমার চোখ, উশীনরের লাইটারের শিসের দিকে। আমি সিগারেটে একটা টান দিয়েই, ওকে দিলাম, 'এক টান?'

'নিশ্চয়ই।'

বলেই সিগারেটে ছুটো টান দিয়ে আমাকে ফিরিয়ে দিয়েই, হুইস্কির গেলাসে চুমুক দিল। কে বুঝবে, উশীনরের কোন পরিবর্তন হয়েছে। খুশি হয়েই, আমার সিগারেট খেল। বলতে পারবে না যে, ওর কোনরকম মেজাজ বিগড়েছে। কিন্তু আমি তো মেয়ে, এসব ক্ষেত্রে সরাসরি। কথা বলার ঝোঁক সামলাতে পারি না। বললাম, 'আমার সঙ্গে ভাল করে কথা বলছেন না যে?'

উশীনর হেসে বলল, 'সেকি, সব সময়েই তো তোমার সঙ্গে কথা বলছি।'

'কোন কারণে রাগ করেছেন কি?'

'কেন সুদীপ্তা, রাগ করা কি আমার পেশা? এ কথা তো তুমি ক'বারই বলেছ।'

'হয়তো কোন অন্যায় করেছি।'

'কই, আমি তো সেরকম কিছু জানি না।'

ও গেলাসে চুমুক দিল। আমি বললাম, 'আমাকে ভাল লাগছে না, না?'

উশীনর প্রায় খুশি মাতালের মত হেসে উঠল, 'তোমাকে ভাল লাগবে না কেন, খুবই ভাল লাগছে।'

বলে, আমার গালে একটা টোকা মেরে দিল। যেন খুকী ভোলানো হচ্ছে। বুঝেছি হে উশীনর, গতকাল রাত্রে বড়ই আশাহত হয়েছ, তারই জ্বালায় এসব হচ্ছে। কিন্তু তুমিই বা কী? আমাকে কি উলঙ্গ হয়ে তোমার সামনে দাঁড়াতে হবে? তোমার নিজের জোর বা ইচ্ছা বলে কিছু নেই? নাকি তুমিও শান্তনুদার মত দয়া চাও?

না, তুমি দয়া চাও না জানি। তা বলে, তোমাকে খুব শক্ত চরিত্রের লোক বলেও ভাবি না। সে প্রমাণ আমি পেয়েছি, আর পেয়েছি বলেই, তোমাকে ভাঙব, ওদের দলে ফেলব। আমি হঠাৎ মুখে ধোঁয়া নিয়ে, ওর মুখে ছড়িয়ে দিলাম। ও হাসল। আমি ওর গায়ের সঙ্গে ঘেঁষে দাঁড়ালাম, ও আমার কাঁধে হাত রাখল, হাসল।

আমিও ওর কাঁধে হাত রাখলাম, ওর চোখের দিকে তাকালাম। ও গেলাস শেষ করল। আমার কাঁধ থেকে হাত নামিয়ে বলল, 'তুমি সত্যি সুন্দর।'

'মানে?'

'মানে তোমাকে দেখলেই ভাল লাগে।'

বলে, একটা আঙুল দিয়ে আমার ঠোঁটে ছুঁয়ে দিল। জানি, উশীনর কী চায়। পথ চলতি ভাল লাগার দান। উনিশ আর বিশ। কিন্তু তা-ই বা কেন দেব? দেব দেব করেও, নিজের কাজ গোছাব। তা ছাড়া এদের সঙ্গে আর কী সম্পর্ক থাকতে পারে? বললাম, 'আপনার তো সেরকম লক্ষণ কিছু দেখছি না।'

উশীনর হেসে বলল, 'মনে মনে পাগল হয়ে আছি।'

চলেও একভাবেই দাঁড়িয়ে রইল, তারপরে হঠাৎ ফিরে চলে যেতে যেতে বলল, 'দেখে আসি, অলকটা কী করছে কোথায়।'

আমি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম, কিন্তু আমার মুখটা শক্ত হয়ে উঠল।

রাত্রে খাওয়ার পরে, শুতে যাবার আগে, মনে পড়ল, উশীনরের বাথরুমে আমার টুথপেস্ট আর ব্রাশ পড়ে আছে। আনতে গিয়ে দেখলাম, হ্যারিকেন জ্বলছে, উশীনরের চোখ বোজা, বুকের ওপর একটা ইংরেজি নাটক উপুড় করা। ফিরে আসতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম, ডাকলাম, 'উশীনর।'

জবাব নেই। সত্যি ঘুমোচ্ছে নাকি? সন্দেহ হল, তবু বুঝতে দিলাম না। বুকের ওপর থেকে বইটা পাশে নামিয়ে রাখলাম। কপালে একটু হাত দিলাম, কিন্তু চোখ খুলল না। হ্যারিকেনটা নিভিয়ে দিয়ে, প্রায় এক মিনিট দাঁড়ালাম, কোন সাড়া-শব্দ নেই। কিন্তু এই কি ঘুমন্ত মানুষের নিঃশ্বাসের শব্দ? আমি কি কিছুই বুঝি না? দেব নাকি একবার ঠোঁটে ঠোঁট ছুঁইয়ে, দেখি ঘুম ভাঙে কী না। নাকি একেবারে বুকের ওপর শুয়ে পড়ব? কিন্তু না, এতটা

করা ঠিক হবে না। এখন মনে হচ্ছে, খেলাটা উশীনরের হাতে। বড় জোর হার হয়ে যাবে। তবু অন্ধকারে দাঁড়িয়ে, আর একবার ফিসফিস করে ডাকলাম, 'উশীনর!'

কোন সাড়া নেই। চলে এলাম। অলকদের ঘর পেরিয়ে, আমার ঘরে ঢোকবার আগেই, অলক, হাত ধরে চাপ দিয়ে গুডনাইট জানাল। শান্তনুদা শুয়ে, চোখ বোজা।

শেষ রাত্রের দিকে, দরজায় খুব আস্তে টক টক শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। ঘুমটা কোন সময়েই ভাল আসছিল না। কিন্তু আমি চুপ করে রইলাম। খুব নিঝুম বলেই শুনতে পেলাম শান্তনুদার চাপা গলা, 'ময়না, ময়না। ময়না একটা কথা বল, সকাল হয়ে গেলে, বোধহয় চান্স পাব না।'

আমি মড়ার মত পড়ে রইলাম। এক সময়ে শান্তনুদা হতাশ হয়ে ফিরে গেল।

কিন্তু রাত্রে কেন ভাল ঘুমোতে পারলাম না। উশীনরের মুখটা বারেবারেই আমার চোখে ভেসে উঠছিল। অবিশ্যি, উশীনরের সুন্দর হাসি মুখটা আমার চোখে ভেসে উঠছিল না। কোঁচকানো চোখ আর বাঁকা হাসি, উশীনরের সে মুখ অনেকটা যেন খপিসের মত। উশীনর কি আমাকে নিয়ে খেলছে। আশ্চর্য, আমিই তো ওকে নিয়ে খেলছিলাম। আসলে, উশীনর বোধহয় এসব কিছুই ভাবছে না, আমিই ভাবছি। হঠাৎ কেন ওকে নিয়ে আমার এমন ভাবনা শুরু হল। নাম করা বিখ্যাত লোক বলে? চেহারা সুন্দর অনেক পুরুষ দেখেছি। উশীনরের থেকে তারা কোন অংশে কম না, বেশি। তবে? উশীনর হঠাৎ কী করল আমার। আমার ভিতরে এত উশীনরের নড়াচড়া কেন।

এ সব কিন্তু ভাল হচ্ছে না। উশীনর, অকারণ আমাকে জ্বালিও না। আমি জানি, আমাকে তোমার ভাল লাগছে। তুমি ধরা দিতে চাইছ না। সেই জন্যই আমার ভিতরে গোলমাল হচ্ছে। তুমি যা, তাই হয়ে ধরা দাও, তা হলেই সব চুকে যায়।

পরদিন সকালেই উশীনর আর শান্তনুদা বেরিয়ে পড়ল গাড়ি

নিয়ে। অলক ব্যস্ত হয়ে পড়ল, আজকের নাচের অনুষ্ঠানের জন্য। প্রায় যজ্ঞিবাড়ির ব্যাপার। ঘুগনি প্রায় চার কে. জি. ছোলার। হাঁড়িয়া আসবে। আদিবাসীরা কয়েকজন এসে কথাবার্তা বলে গিয়েছে। বাংলোর চৌকিদার চাকর-বাকরেরাও খুব খুশি। আমি আজ রান্নাঘর ছেড়ে বেরোলাম না।

বেলা এগারোটা নাগাত উশীনর আর শান্তনুদা ফিরে এল। আমিও রান্নাঘর ছেড়ে এলাম। উশীনর ফিরে এসেই, ওর ঘরে কাগজ কলম নিয়ে বসে গেল। আমি গিয়ে সামনে দাঁড়ালাম। বললাম, 'চা দেব?'

উশীনর মুখ তুলে, কয়েক সেকেণ্ড আমার দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইল, বলল, 'বাহ্, সুন্দর।'

আসলে, লাল জামা, চওড়া লাল পাড় শাড়ি, কপালে লাল ফোঁটা আর দুপাশে খুলে দেওয়া চুলের এই সাজটাই দেখাতে এসেছি। বললাম, 'ভাল লাগছে?'

'অপূর্ব।'

'আমি রান্না করছি, এবেলা ওবেলা, দু বেলারই। তোমাকে চা দেব?'

আমার সম্বোধনে, উশীনর যেন একটু চমকাল, খুশীও হল। বলল, 'তোমাকে এখন একেবারে অন্যরকম লাগছে। তবে যদি কিছু দিতেই চাও, চা না, একটু বীয়র দাও।'

তা-ই এনে দিলাম। বোতল খুলে, গেলাসে ঢেলে দিয়ে আবার রান্নাঘরে চলে গেলাম। আজ এই জঙ্গলের বাংলোয় আমার অন্য ভূমিকা। কিছুক্ষণ বাদে আবার ফিরে গেলাম উশীনরের কাছে। ও তখনো লিখছে। আমার দিকে চোখ তুলে বলল, 'এস, শেষ হয়ে এসেছে।'

কাছে গিয়ে বসলাম। কয়েক মিনিট পরে, কাগজ-কলম রেখে, আমার দিকে তাকাল। আমি সলজ্জ হেসে মুখ নামালাম। ও চিবুকে হাত দিয়ে আমার মুখ তুলল। তারপরে ঠোঁট নামিয়ে

নিয়ে এসে চুমো খেল। আমি একটুও বাধা না দিয়ে, ওর চোখের দিকে তাকিয়ে হাসলাম। ও দু হাতে আমার মুখ ধরে, আবার চুমো খেল, আমিও দান ফিরিয়ে দিলাম। এই তো তোমরা চাও। উশীনর, এগিয়ে চল তোমার বাকী দলের দিকে। উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, 'রান্না দেখে আসি।'

আর খাবার আগে আসি নি। উশীনরই রান্নাঘরের দরজায় গিয়েছিল আমাকে দেখতে। কিন্তু আর না উশীনর, আবার পরে দেখা যাবে।

সন্ধ্যের পর, হ্যাজাক জ্বলল। মশাল হাতে, মাদল বাজিয়ে আদিবাসীরা এসে জড় হতে আরম্ভ করল। উঠোনের একদিকে বড় বড় জালায় হাঁড়িয়া নিয়ে কয়েকজন বসে গেল। সত্যি, এখানকার যুবতী আর কিশোরীদের দেখে হিংসে হয়। এমন সুন্দর শরীরের গঠন আমাদের কেন হয় না। হোক কালো রঙ, কিন্তু যেন পাথরে কাটা মূর্তি, ওদের শরীর যেন কোনদিন একটু ভাঙবে না, টোল খাবে না। তবে শুধু মেয়েদেরই না, ছেলেদের চেহারাও সুন্দর।

অলক আর শান্তনুদা বিকেল থেকেই খেয়ে মস্ত্। মেয়েরা আসতে, হাসি আর ধরে না। মেয়েরাও খিল খিল করে হাসছে, এ ওর গায়ে পড়ছে। সবাই হাঁড়িয়া খাচ্ছে শালপাতায় ভরে। দু'জন ঘুগনি বিলি করছে।

উশীনরও সন্ধ্যে থেকে ড্রিংক শুরু করল; শান্তনুদার সঙ্গে বারান্দায় বসে কথা বলছে। অলক আদিবাসীদের ভিড়ে চলে গিয়েছে। আমি ঘরের ভিতর থেকে সব দেখছি। উশীনর কি একবারও উঠে আসবে না এখানে?

নাচ শুরু হচ্ছে এবার। শান্তনুদা উঠোনে নেমে গেল। উশীনর ঘরে এল। এটাই তো ভেবেছিলাম। ও এল, আমিও তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে যাবার জন্য পা বাড়ালাম। ও আমার হাত ধরল, আমি বললাম, 'চল, ওখানে যাই।'

ও মুখ নীচু করল, আমি মুখ ফিরিয়ে সরে গিয়ে হেসে বললাম, 'এস, পরে হবে।'

এত তাড়াতাড়ি কি দিতে আছে? উশীনর কি বুঝতে পারছে, সে প্রখ্যাত নাট্যকার, কিন্তু তাকে আমি 'তুমি' বলছি, অথচ অলক শান্তনুদাকে তা বলি না। নামতে হবে উশীনর, তোমাকে বেশি নামতে হবে। উশীনর কিন্তু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। আবার ডাকলাম, 'এস।'

ও বলল, 'তুমি যাও, যাচ্ছি।'

একটু বুঝি লেগেছে? আমি বাইরে গেলাম। মেয়েরা গুচ্ছ গুচ্ছ দাঁড়িয়েছে, পরস্পরের কোমর জড়িয়ে ধরে। একদল পুরুষ, মেয়েদের মুখোমুখি হয়ে, মাদল বাজাচ্ছে। নাচ শুরু হয়েছে। অলকও মেয়েদের সঙ্গে ঢুকে, তাদের কোমর জড়িয়ে ধরেছে। মেয়ের তাকে নিয়ে কী সব বলাবলি করছে, মাঝে মাঝে অলকের কাছ থেকে ছিটকে গিয়ে, খিল খিল করে হাসছে। তার মানে অলকের হাত নিশ্চয় বেয়াদপি করছে।

উশীনর বারান্দার আর এক পাশে, ড্রিংক করছে। শান্তনুদা নাচ দেখছে, আর মেয়েদের দেখছে। নাচ জমে উঠছে, মেয়েরা গান ধরেছে, দুর্বোধ্য কথা, কিছুই বুঝি না। পুরুষেরা হিস্ হিস্ শব্দ করছে। উশীনর আমার পাশে এল। তার হাত ধরলাম আমি। ও আমার চোখের দিকে তাকাল। কত খেয়েছে উশীনর? চোখ ভীষণ লাল।

শান্তনুদা নাচে ঢুকে পড়ল। মেয়ে-পুরুষ, সবাই একসঙ্গে কোমর জড়িয়ে ধরে নাচছে। উশীনর জিজ্ঞেস করল, 'নাচবে?'

'আগে তুমি যাও।'

'পরে যাবে?'

'যাব।'

উশীনর গিয়ে দাঁড়াতেই, একটা লাল মিলের শাড় পরা মাতাল মেয়ে, ছোঁ মেরে ধরে নিয়ে গেল। লাইনসই করে নিল। উশীনর আমার দিকে তাকাল। উশীনর আমাকে চাইছে। অলক বলে

উঠল, 'উশীনর যে তোমাকে নিয়ে গেল, ও কিন্তু আমার।'

উশীনর আবার হেসে আমার দিকে তাকাল। হঠাৎ লাল শাড়ি পরা মেয়েটা আমার দিকে দৌড়ে এল, আমার হাত ধরে টানল। আমি হাত ছাড়িয়ে নিলাম। কিন্তু সে কিছুতেই ছাড়বে না। যেমন উচ্ছল যৌবন, তেমনি সরল। হাসাহাসি কাড়াকাড়ি করে, মেয়েটা আবার ছুটে গেল। আমি গেলাম না। আমি উশীনরকে দেখছি। উশীনর আমাকেই দেখছে। দেখ দেখ উশীনর, তোমাকে দেখতে হবে। অথচ লাল শাড়ি পরা মেয়েটার কাছে, আমি কিছুই না। মেয়েটা যেন লকলকে আগুন, কালো আগুন। মেয়ে পুরুষ সবাই আমার দিকে তাকাল। কিন্তু অলক আর শান্তনুদা আমার দিকে দেখছে না। ওরা মত্ত হয়ে গিয়েছে। মেয়েরা ওদের জড়িয়ে,ওরা মেয়েদের জড়িয়ে নাচছে। সত্যি, পৃথিবীতে এমন জায়গা ছিল, জানতাম না।

উশীনর যদি আমাকে নিয়ে যায়, তবে যাব। উশীনরের ঘাড়ের ওপর হাত রেখেছে লাল শাড়ি মেয়েটা। মেয়েটার তো বুকও খুলে গিয়েছে। লজ্জা করছে না? কিন্তু উশীনরের চোখ আমার দিকেই। উশীনর তুমি মরেছ, এবার পায়ের তলায় পড়বে।

নাচ গান পান সমানে চলেছে। সবাই হাসছে, সবাই খুশি। আমি এত দূরে কেন? উশীনর আসছে না কেন? ও তো আমার দিকেই তাকিয়ে। মাদল বাজছে, বাঁশী বাজছে, সবাই মাতাল।

আসছে! উশীনর আসছে। এসেই বলল, 'গেলে না কেন, এটা নিয়ম, নাচতে ডাকলে যেতে হয়, তা না হলে, ওদের অপমান হয়। এস।'

আমার হাত ধরল ও। আমি গেলাম। দলের মধ্যে ঢুকে যেতেই, উশীনরকে মাঝখানে রেখে, লাল শাড়ি মেয়েটা আমাকে একদিকে রাখল। উশীনর আমার কোমরে হাত দিতেই, ওর ব্যাকুল খুশি বুঝতে পারলাম। কিন্তু এত সহজে না, আমি লাইন থেকে সরে গিয়ে, আবার আলাদা দাঁড়ালাম, তবে কাছেই। উশীনর অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল। আমি হেসে চোখ ফেরালাম।

একি, অলক কোথায়? ঘরের দিকে ফিরে তাকিয়ে মনে হল, ভিতরে ছায়ার নড়া-চড়া দেখা যাচ্ছে। অলক কোন মেয়েকে নিয়ে চলে গিয়েছে। আশ্চর্য, শান্তনুদাও নেই। ওদের আশা মিটেছে, ওরা যা চেয়েছিল, পেয়েছে। এদের মন আমি বুঝি না, এদের জগত আমি চিনি না। অথচ এসব যে শহরের বেশ্যাবৃত্তির মত ব্যাপার, তা মোটেই মনে হচ্ছে না। এ যেন একটা জঙ্গলের উৎসব। কিন্তু উশীনরের চোখ আমার দিকে। আবার ডাকল, 'এস।'

নিজেই এসে আমাকে দু হাতে জড়িয়ে টানল, 'এস লক্ষ্মীটি।'

আমি সঙ্গে সঙ্গে উশীনরকে ঠেলে দিলাম। আমার গা জড়াতে চাইছে ও। জানি, এখানে এখন ওটা কোন কথা নয়, গা বলে কিছু নেই। কিন্তু আমি সুদীপ্তা, আমাকে টানছে উশীনর। এখন না, এখন না, উশীনর, আরো পরে।

উশীনর আবার লাইনে গেল। আমাকে সবাই ডাকছে। যাচ্ছি না। তারপরে নাচের একটা বড় বৃত্ত হয়ে গেল, সবাই একসঙ্গে, গুচ্ছ গুচ্ছ আর নেই। মাঝখানটা অনেকখানি ফাঁকা, আমি একলা দাঁড়িয়ে আছি, আমাকে আর কেউ ডাকছে না এখন। সবাই মাতাল, সবাই খুশি। অলক শান্তনুদা আরো খুশি, এখন আর আমার কথা তাদের মনে নেই। তারা দুজনে, বিশেষ দুটি মেয়ের সঙ্গে নাচছে, যে-মেয়ে দুটিকে নিয়ে তারা ঘরে ঢুকেছিল। কিন্তু উশীনর আর আমার দিকে তাকাচ্ছে না। লাল শাড়ি মেয়েটার পায়ের তাল ঠিক নেই। সে এখন উশীনরকে প্রায় জড়িয়েই ধরে আছে। উশীনরের পায়ের তাল কিন্তু ঠিক আছে। তার মুখটা যেন কেমন দেখাচ্ছে। হাসি নেই, খুশি নেই, লাল পাথরের মত দুটো চোখ। উশীনর কি আমার কাছে ছুটে আসবে না।

হঠাৎ মনে হল, আমি একটু কিছু খাই। এসব হাঁড়িয়া পাচুই তো খেতে পারব না। একটু বীয়র খেয়ে আসি। উশীনরের দিকে আর একবার দেখে, আমি ভিতরে গিয়ে, যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব, বেশ খানিকটা বীয়র খেয়ে ফেললাম। তারপরে বাইরে এলাম।

একি, উশীনর কোথায় গেল ? সে-ও কি কাউকে নিয়ে বাংলোর ঘরে ঢুকে গেল ? হ্যাজাকটা নিভে আসছে। শান্তনুদা আর অলককেও দেখতে পাচ্ছি না। লাল শাড়ি মেয়েটা একপাশে শুয়ে আছে, তাকে ঘিরে কয়েকজন মেয়ে পুরুষ হেসে হেসে কী যেন বলছে। তবু সবাই নাচছে, এখনো শালপাতার দোনায় হাঁড়িয়া খাচ্ছে। আরো কেউ কেউ শুয়ে পড়েছে। আমি ছুটে ঘরে গেলাম। সব ঘর অন্ধকার। আগে ছুটে উশীনরের ঘরে গেলাম। কেউ নেই। অলকদের ঘরে গেলাম, দরজা বন্ধ। ভিতরে হাসির শব্দ, মাতালের গোঙানি। উশীনরও কি এদের সঙ্গে রয়েছে ?

আবার বাইরে এলাম। দেখলাম চৌকিদার আসছে। তাকে উশীনরের কথা জিজ্ঞেস করলাম। সে বলল, 'এক বাবু তারামাচা মে হ্যায়।'

'সেটা আবার কী ?'

ও হাতছানি দিয়ে আমাকে ডেকে নিয়ে গেল। সেই ভিউ দেখবার মাচার কাছে নিয়ে গেল। মাচাটা নীচের খাদ থেকে অনেক উঁচুতে। পড়ে গেলে, জঙ্গলের মধ্যে ছিঁড়ে খুঁড়ে যেতে হবে। দেখলাম, মাচার একেবারে শেষ প্রান্তে উশীনর দাঁড়িয়ে। তার কালো ছায়াটা কেবল দেখা যাচ্ছে। আমি কাছে গিয়ে ডাকলাম, 'উশীনর।'

উশীনর আমার দিকে ফিরে তাকিয়েই গট গট করে মাচার থেকে ফিরে চলে গেল। আমি ওর পিছনে পিছনে গেলাম। ও বাংলোর বারান্দায় উঠল। আমি ওর হাত ধরে টানলাম। ও ঝটকা মেরে আমার হাত সরিয়ে দিল, বলল, 'ছাড়।'

আমি আবার ওর হাত ধরে ডাকলাম, 'উশীনর'।'

উশীনর আচমকা একটা থাপ্পড় মারল আমার গালে, 'গেট আউট য়ু উইচ্, ভ্য হোর য়ু আর।'

আমি যেন কানে কিছুই শুনতে পেলাম না, থ হয়ে গিয়ে কোন রকমে আবার ডাকলাম, 'উশীনর।'

উশীনর ফিরে দাঁড়াল, না ওকে আমি চিনতে পারছি না। ও হঠাৎ

আমার দিকে ফিরে, দু হাতে আমার গালে থাপ্পড় মারতে লাগল, চুলের মুঠি ধরে টেনে আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল, আমি ভয়ে আর যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠলাম, 'আহ, মের না।'

উশীনরের পায়ের বুটের লাথি তখন আমার পাছায় পড়ছে, 'গেট আউট অফ মাই সাইট, খেলা তোমার এখুনি ভেঙে দেব, আই উইল কিল য়ু।'

ততক্ষণে শান্তনুদা আর অলক এসে পড়েছে। উশীনরকে ধরে ফেলেছে। শান্তনুদা আমাকে জড়িয়ে ধরে তুলেছে। শান্তনুদা বলল, 'কী করছেন উশীনরবাবু, আর য়ু ম্যাড ?'

উশীনরের গলায় যেন গর্জন, 'ইয়েস, আই অ্যাম ম্যাড, মুভ হার ফ্রম মাই সাইট। শী ওয়াজ ইনসাল্টিং মী, শী ওয়াজ প্লেয়িং দা ডার্টি গেম উইথ মী।'

অলক বলল, 'কী, ব্যাপারটা কী ঘটেছে ? আমি তো শালা কিছুই বুঝতে পারছি না।'

উশীনর বলল, 'ওকে জিজ্ঞাসা কর।'

বলে ও চলে গেল। অলক আক্ষেপের স্বরে জড়িয়ে বলল, 'সব ছানা কাটিয়ে দিলে।'

আমাকে নিয়ে শান্তনুদা ঘরে ঢুকল। আমি শান্তনুদার হাত ছাড়িয়ে আমার ঘরে গেলাম। কে একটা বাতি দিয়ে গেল। আমি আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। ঠোঁট কেটে রক্ত বেরোচ্ছে, কপালের পাশে উঁচু দেখাচ্ছে। উশীনর আমাকে মেরেছে। কেন, এতই বেশী কি খেলেছি, যে আমাকে এমনি করে ও মারবে ? কেন মারবে আমাকে, মারবার কে ? ওর ইচ্ছামত সব করিনি বলে ? আমার চোখ জ্বলতে লাগল। দীনেশের কথা আমার মনে পড়ল। দীনেশ আমাকে রেপ করেছিল, উশীনর আমাকে ধরে পেটাল। ওহ্, ঈশ্বর, ঈশ্বর, এখন আর একবার আমি ধর্ষিত হতে চাই, জীবনে আর একবার। এই পশুরা আমাকে আর কী করতে পারে।

উশীনর, তুমি এতই যদি বুঝেছিলে, তা হলে এটা বোঝ নি, অনেক

ছেলে-বেলায় ডার্টি গেম তোমরাই আমাকে শিখিয়েছ। দীনেশ আমাকে প্রথম দীক্ষা দিয়েছিল এই খেলার। তারপরে নিজেকে বাঁচাবার জন্য, এই খেলাই আমি জানি। কিন্তু তোমরাই বা আমার কাছে কী চেয়েছিলে? খেলব, এই খেলা আমি সারা জীবন খেলব, দেখি আবার মারতে এস।

দপ্‌ করে আমার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। যত মার আমি খেয়েছি, সব যেন এখন আমার দাঁতে নখে দপদপ করছে। আমি ছুটে বাইরের ঘরে এলাম। আলো জ্বালিয়ে দেখি অলক আর শান্তনু চুপ করে বসে আছে। আমি শরীরে একটা দোলা দিয়ে বললাম, 'একটু ড্রিংকস্‌ দেবেন?'

বলেই, হাতের কাছে টেবিলের ওপর হুইস্কির বোতল গেলাস জলের জাগ দেখতে পেলাম। নিজের হাতেই গেলাসে হুইস্কি ঢেলে, একেবারে কাঁচা ঢক ঢক করে খেলাম। শান্তনু বলল, 'ময়না, ওভাবে হুইস্কি খেয়ো না।'

'চুপ! চুপ করে বসে থাকুন। কতগুলো দুশ্চরিত্র লম্পট নপুংসক, বেরিয়ে যান সব আমার সামনে থেকে।'

আমি চেঁচিয়ে উঠলাম। ওরা যেন ভয় পেয়ে, মাথা নিচু করে চুপ করে বসে রইল। আমি আবার ঢক ঢক করে খেতে লাগলাম। কোমর দুলিয়ে বললাম, 'কী ক্ষমতা আছে আপনাদের? আপনারা পুরুষ?'

আমার পা টলছে, মাথা ঘুরছে। ভিতরটা অসহ্য জ্বলছে, মনে হচ্ছে, কামড়ে খামচে ভেঙে চুরে একটা কিছু করি। অথচ চোখে জলও এসে পড়ছে। কিন্তু একটা অন্ধ রাগ ফুঁসছে আমার মধ্যে, রাগে যেন কাঁপছি। এই দুজনের কথা বলবার আর ক্ষমতা নেই। আমি আরো হুইস্কি খেলাম। শান্তনু বলল, 'তুমি বসে খাও।'

আমি বললাম, 'আমাকে ডার্টি গেম-এর কথা বলছে। নিজেরা কী?'

বলেই আমি সামলাতে না পেরে জলের জাগটা মেঝেয় ছুঁড়ে

ফেলে দিলাম, সেটা চূর্ণবিচূর্ণ হল, বললাম, 'দল বেঁধে সব ফুর্তি করতে বেরিয়েছে, আমাকে ছিঁড়ে খেতে চাইছে, ডার্টি গেম কেবল আমার?'

হুইস্কির বোতল গেলাস সব ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগলাম, 'বেরিয়ে যান, বেরিয়ে যান সব আমার চোখের সামনে থেকে।'

অলক ঘরের বাইরে চলে গেল, শান্তনু দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। এবার নিজের হাতের গেলাসটাও ছুঁড়ে দিলাম, 'আমি চাই না হিরোইন হতে, চাই না তোমাদের মন যোগাতে, বেশ্যাবৃত্তি করব, সেও ভাল। তোমরা আমার পায়ে এসে পড়ে থাকবে। আমারই কেবল ডার্টি গেম? উশীনর ধোয়া তুলসী-পাতা? ওর কী জোর আছে, কী জোর?'

বলতে বলতে মনে হল, আমার মাথার শির ছিঁড়ে পড়ছে, টলছি। তবু দাঁতে দাঁতে চেপে, জলন্ত হ্যারিকেনটা হাতে নিয়ে ছুঁড়ে ফেললাম আমি। আগুন জ্বলুক, আগুন জ্বলুক চারদিকে। সবাই পুড়ে মরুক আমার সামনে। কিন্তু আমার সব অন্ধকার হয়ে গেল। কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। তারপরে আর কিছুই মনে করতে পারি না।
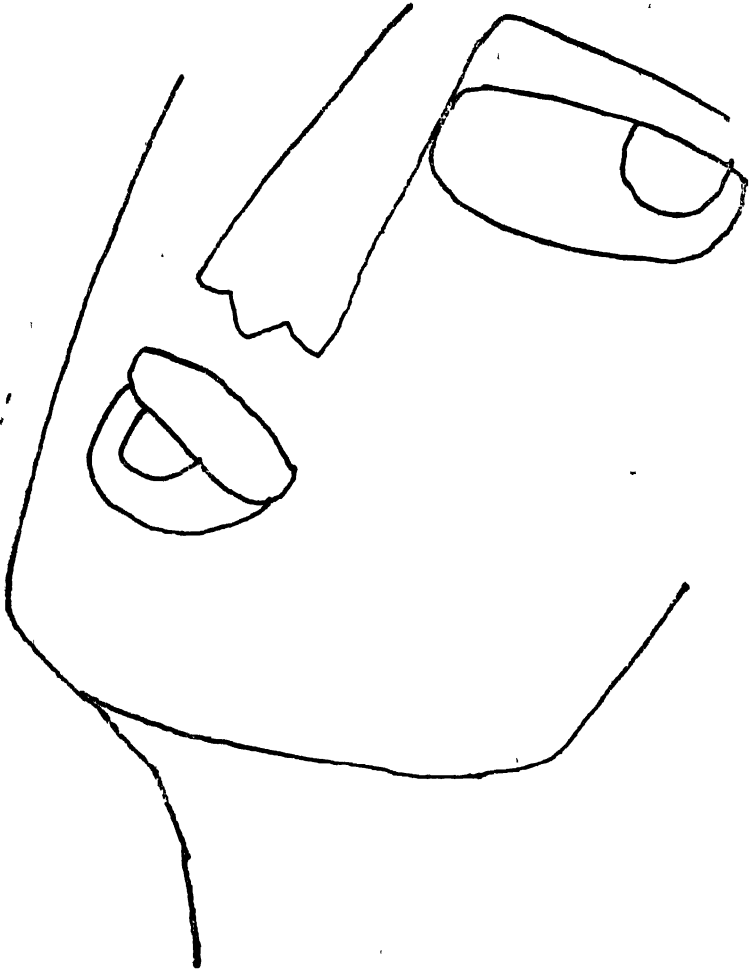
শান্তনু

জঙ্গল থেকে গাড়ি বেরিয়ে এসেছে। সকাল প্রায় ন'টা এখন। আমাদের অন্য প্রোগ্রাম বাদ দিয়ে, কলকাতায় ফিরতে হচ্ছে। সুদীপ্তাকে খুব ভাল মনে হচ্ছে না। কী যে করল উশীনর। আরে

বাবা, তোমার সঙ্গে রঙবাজী করে থাকে, তুমি ছেড়ে দাও। তোমার মাথাব্যথা করে লাভ কী। তুমি একটা নাম-করা লোক, আর এ একটা অর্ডিনারি মেয়ে। কোন মানে হয়!

মাঝখান থেকে, সব আনন্দ মাটি, কাজ পণ্ড। কী দারুণ জমেছিল। আমি তো সারা জীবনে এটা ভুলব না। ওই সব মেয়েদের কথা কোনদিন ভুলব না। আমার তো ময়নার কথা মনেই ছিল না, থাকবার কথাও না। অলকেরও না। এই ময়না আর উশীনর যত গোলমাল করল। এখন বুঝুক ময়না, উশীনরের সঙ্গে তো প্রথম থেকেই চলছিল। শেষে এই হাল। আরে বাবা, কথায় বলে, অতি ভাব ভাল না। এখন তার ঠ্যালা নাও।

আমার আর অলকের রস গুটিয়ে গিয়েছে। এখন ভালয় ভালয় মেয়েটাকে নিয়ে কলকাতায় পৌঁছতে পারলে হয়। জ্ঞান হয়েছে বটে, কিন্তু উঠতে পারছে না। চোখের চাউনিটা কেমন যেন ঘোলা ঘোলা। যেন কিছু মনে করতে পারছে না, কাউকে চিনতে পারছে না। কী জানি বাবা, মাথা টাতা খারাপ হয়ে গেল না তো! সুদীপ্তা পিছনের সীটেই শুয়ে আছে। আর উশীনর এক পাশে গুটিয়ে বসে আছে। সে নিজের থেকেই বসেছে। আমি আর অলক এখন সামনে।

উশীনরের মুখের অবস্থাও ভাল না। শক্ত আর শুকনো। বল তো, এসব কথা বাইরের লোক শুনলে, কী ভাববে? আমি তো ময়নাকে জানি। সোনাকে দিয়েই জানি, একেবারে ক্ষয়ে গোখ্রো। এরা মাথা নামাতে জানে না। সেদিন কত হাতে পায়ে ধরলাম ময়নাকে, ফেলে দিয়ে চলে গেল। আর ডার্টি গেম যদিও খেলেই থাকে, উশীনরের তাতে কী। ফুর্তি জমল তো ভাল, না জমল তো, ভাগ্ যাও। আমি তো তাই বুঝি। এভাবে মারধোরের কোন মানে হয়? আমি ময়নার হাত ধরে নিয়ে যেতে চাইলাম। আমার হাত ধরল না।

দুপুরবেলাই আমরা জামসেদপুরে এসে পৌঁছলাম। ময়না নিজেই

নামল, খুব আস্তে আস্তে হোটেলের ঘরে গিয়ে উঠল। উশীনরের ব্যাপারটা কিছু বুঝতে পারছি না। সে পাশে পাশে গেল, ময়না রাগ করল না, কিছু বললও না। উশীনরের মুখের দিকে তাকাল না। ঘরের মধ্যে গিয়ে ঢুকল। উশীনর বালিশ ঠিক করে দিয়ে বলল,'শুয়ে পড়।'

ময়না এই প্রথম কথা বলল, 'ঠিক আছে, আপনি যান।'

উশীনর সোজা বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। আমি বললাম, 'এখন কেমন আছ ময়না?'

'ভাল। আপনারা যান।'

অলককে এখন অনেকটা গরু-চোরের মত দেখাচ্ছে। ঘরের বাইরে এসে বলল, 'শালা, এমন একস্‌পিরিয়েন্স আর হয় নি।' আবার হঠাৎ ঘরের মধ্যে কী রকম একটা শব্দ শুনে, আমি ফিরে গিয়ে দেখলাম, ময়না বালিশে মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কাঁদছে। কী বলি। বড় কষ্ট হতে লাগল দেখে। অলক আর আমি চোখাচোখি করলাম, আস্তে আস্তে ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালাম। দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিলাম। বললাম, 'আমার এখন উশীনরের ওপর রাগ হচ্ছে।'

অলক বলল, 'তা ঠিক, তবে উশীনরটা শক্ত আছে।'

'কী রকম?'

'আপনি আমি হলে, একরকম ঠ্যাঙাতে পারতাম?'

'বাজে কথা ছাড়ুন তো মশাই। এটা কি খুব ভাল কাজ হয়েছে?'

'ভাল মন্দ জানি নে, উশীনর পেরেছে, আমি পারতাম না। এটা তো ঠিক, মেয়েটা মশাই বড় ঘাগী ধড়িবাজ।'

আমি রেগে বললাম, 'তাই চাটতে গিয়েছিলেন।'

'আরে সেটা তো আলাদা কথা। বড় পাজী আর ঘুঘু মেয়ে।'

'ওসব আপনি বলবেন না, শোভা পায় না। আপনি ওর থেকে অনেক খারাপ।'

'খারাপ, কিন্তু ঘুঘু নই।'

বিরক্তিতে আমি সরে এলাম। আমাদের ঘরে এসে দেখলাম, উশীনর চোখ বুজে শুয়ে আছে। আমরা ঘরে ঢুকতে চোখ মেলে তাকাল। আমি এতক্ষণ তার সঙ্গে কথা বলতে ঠিক ভরসা পাচ্ছিলাম না। সে এরকম একটা কাণ্ড করার পরেও, তার মুখের এমন একটা ভাব হয়ে রয়েছে, ধমকে যে কিছু বলব, তা পারছি না। এসব চরিত্র আমি ঠিক বুঝি না। এখন বললাম, 'স্যার, আপনি এত চটে গেলেন।'

উশীনর মুখটা নামিয়ে নিল। একটু পরে বলল, 'সব দোষটাই আমার। আমি সব বুঝেও যে কেন ওরকম করতে গেলাম? ও যদি আমাকে ডাকতে না যেত, ভাল করত।'

'কোথায়?'

'মাচা থেকে।'

উশীনর খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, তারপরে হঠাৎ যেন অস্থিরের মত বলে উঠল, 'খুব অন্যায়, খুব অন্যায় করেছি। ওর কোন দোষ নেই। ও যা, ও তাই ছিল, মাঝখান থেকে আমি···না না, ছি!'

উশীনর উঠে দাঁড়াল, আবার বসল। আমার যেন মনে হল, উশীনর চোয়ালটা শক্ত করে, বারে বারে ঢোঁক গিলছে, আর ওর চোখ দুটো ভিজে উঠছে। বলল, 'এত দুঃখী মেয়ে, বড় কষ্ট ওর···।'

ও হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আমি পিছন পিছন গিয়ে দেখলাম, ও নীচে নেমে চলে গেল, ময়নার কাছে গেল না। ঘরে ফিরে এলাম। অলক বলল, 'কী ব্যাপার বলুন তো?'

গম্ভীর হয়ে বললাম, 'উশীনর ইজ ইন লাভ উইথ হার, আই স্মে!'

অলক বলল, 'যা বাবা, ভালবাস্‌সা হয়ে গেল। এই দাঙ্গার পরে।'

বললাম, 'আপনি একটি নিরেট।'

'সে তো বটেই। তবে আমার মনে হয়, আপনি কিছুই বোঝেন নি।'

অলকের কথা শুনে আমার পিত্তি জ্বলে গেল, বললাম, 'তার মানে?'

অলক বলল, 'মেয়েটা যে আসলে দুঃখী, সেটা উশীনর বুঝতে পেরেছে।'

'আপনি বোঝেন কাঁচকলা।'

'তা-ই বুঝলাম। কিন্তু চান-টান করে, তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন সবাই। আজই রাত্রে কলকাতা পৌঁছনো চাই।'

এমন সময়ে উশীনর আবার ঘরে ঢুকল। আমি হঠাৎ বললাম, 'আপনারা দুজনেই আছেন, আপনাদের কাছে আমার একটা প্রস্তাব আছে।'

দুজনেই একটু অবাক হল। আমি বললাম, 'আপনার একজন নাট্যকার, আর একজন স্টেজের ওনার অ্যাণ্ড প্রোডিউসার, আমি ডিরেক্টর। আমি প্রস্তাব করছি, আমাদের এই নতুন নাটকে, ময়নাকে নায়িকার ভূমিকা দেওয়া হোক।'

অলক একবার উশীনরের দিকে তাকাল, বলল, 'আমার আপত্তি নেই।'

আমি অলকের হাত চেপে ধরলাম, উশীনরের দিকে চেয়ে বললাম, 'উশীনরবাবু?'

উশীনর শুকনো মুখে একটু হাসল, বলল, 'আমি সুদীপ্তার মঙ্গল ছাড়া কিছু চাইনা।'

'হিরোইন হওয়া?'

'নিশ্চয়ই।'

আমি উশীনরের সঙ্গে হাত মেলালাম। উশীনরের কাছে আমি গ্রেটফুল। বেশ বুঝতে পারছি, অলক এখন, উশীনর যা বলবে, তা-ই করবে। সে না বললে মুসকিল ছিল। কিন্তু হোয়াট ডার্টি গেম শী ওয়াজ প্লেইং উইথ উশীনর, এটা আমি বুঝতে পারছি না। ডার্টি গেম কেউ যদি খেলে থাকে, সে তো আমরাই। আমি অলক—উশীনরের কথা আমি ঠিক বলতে পারব না; আমরা দুজনে অন্ততঃ কোন গুড্ গেম করতে চাই নি। ময়না ওরকম ফুলে ফুলে কাঁদছিল কেন। উশীনরকে তো ও আর কিছু বলছে না, কেবল ঘরথেকে চলে যেতে বলল। একটা কিছু

ব্যাপার আছে, যা আমি বা অলক বুঝতে পারছি না। উশীনরের মত ঠাণ্ডা মানুষ তা না হ'লে এত ক্ষেপে যেতে পারে না। এ সব কি ভালবাসার লক্ষণ? কী জানি, কোনদিন বুঝতে পারলাম না। কিন্তু এখন আবার সোনার কথা আমার বড় বেশি মনে হচ্ছে। আমি জানি, রত্নাবতী একটা শূন্য। সবখানে কেবল পাখা পুড়িয়ে মরলাম। যেখানে পেয়েছিলাম, সেখানে হাত দিয়ে ধরে রাখতে পারলাম না। এখন থেকে আমি কেবল ময়নার কথা ভাবব। ময়নাকে আমি তুলে ধরতে চাইব। ময়নাই আমার সব হোক, আমার শেষ জীবন পর্যন্ত।

····················

বৈ জ্

আসবার সময় হাওয়া ছিল এক রকম, এখন ফিরতি পথে আর এক রকম। কী যে হল ছাই, বুঝতেই পারলাম না। আমিও তো কাল রাত্রে প্রায় বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলাম। সবাই মেতেছিল, আমিও মেতেছিলাম। কাল আর কিছু মানামানি ছিল না। সাহেব তো

আমাকে কাছে দেখেও চিনতে পারছিলেন না। বোধহয় আমাকেও জঙ্গলের আদমিই ভেবেছিলেন। আমি পিয়াস মিটিয়ে হাঁড়িয়া খেয়েছি, জোর নাচ করেছি।

নাচ না ছাই, আমি তো খালি যোয়ান ছুকরিদের জাপটে জাপটে ধরছিলাম। নাঃ, বিলকুল খারাপ হয়ে গেছি। পানপাতিয়ার মা শুনলে কী বলবে। সত্যনাশ করে দিয়েছি। আখেরিতক, আমিও কী না, একটা ছুকরির সঙ্গে ভিড়ে গিয়েছিলাম। তবে সেটা আমার দোষ না, ভগবান জানে। বাংলোর পিছনে আমি প্রস্রাব করতে গিয়েছিলাম। দেখি কী না, অন্ধকারে, দুটো আদিবাসী মেয়েপুরুষ একদম নাঙা, শুয়ে আছে। আমাকে দেখেই, মরদটা উঠে, মেয়েটার ঘাড়ের ওপর ফেলে দিয়ে হাসতে লাগল। আমি ভাবলাম, মেয়েটা আমাকে পিটবে। কিন্তু পিটল না। যা বাবা, কোথা থেকে কী হয়ে গেল।

সব কথাই আমার সাফ সাফ মনে আছে। আমার তখন কী-ই বা করবার ছিল। যেমন ব্যাপারটা ভেবে খারাপ লাগছে, আর কেবল-ই পানপাতিয়ার মায়ের মুখটা মনে পড়ে যাচ্ছে, কাল রাত্রে তা একেবারেই পড়ে নি। আসলে আমি খারাপ। খারাপ না হলে, হাঁড়িয়া খাব কেন, আর জংলী মেয়েদের সঙ্গে, নাচতেই বা যাব কেন। মতলব আমার খারাপই ছিল।

তবে হ্যাঁ, বাংলোর চৌকিদার যখন আমাকে বলল, 'তুমিও নাচতে নেমে যাওনা' তখন ব্যাপারটা আমার কাছে খুব মজার মনে হয়েছিল। সাহেব রাগ করবেন ভেবে, প্রথমটা সাহস হচ্ছিল না। তারপরে দেখলাম, সাহেব আমাকে চিনতেই পারছেন না। নাচে গানে, আমার খুব মজা লাগছিল। আসল বদমাইসীটা তখনই আমার মাথায় আসছিল, যখন যোয়ান অওরতদের গায়ে হাত লাগছিল। এ একটা এমন ব্যাপার, তখন আর ঠিক থাকা যায় না। সব মানুষেরেই কি এমন হয়? আমার সাহেবের কথা আলাদা। সাহেব আর অওরত, ওটা আলাদা করা যায় না। আমি যেরকম মানুষ, আমার

মত মানুষদের কাছে, এসব খারাপ। পাপের কথা মনে আসে।

কিন্তু রাত্রে কী বলে লোকটা হাসতে হাসতে, আমাকে ওরকম একটা যোয়ান মেয়ের ঘাড়ের ওপর ফেলে দিল। আমি তো প্রথমে ভেবেছিলাম, একটা মারামারি খুনোখুনি হয়ে যাবে। হায় রাম, মুণ্ডা ছুকরির লাজ লজ্জা। তার গায়ের কাপড়ই বা কোথায় ছিল। একে কী বলে। তবে হ্যাঁ, একটা কথা ঠিক, মেয়েটাকে কেন যেন আমি খারাপ বলতে পারিনা। আমার মতলব আর মেয়েটার মতলব একদম আলাদা মনে হচ্ছিল। মেয়েটা মাতাল, মেয়েটা হাসকুটে। ও যে নাঙা, ওর শরীরের ওপরে যে পুরুষ, এটা যেন ও জানতই না, বুঝতেও পারছিল না। ও শুধু পাগলের মত হাসছিল। কাতাকুতু দিলে যেমন হাসতে হাসতে দম আটকে যায়, সেই ভাবে হাসছিল। শরীরের ব্যাপারে, ওর কোন তন জ্ঞান ছিল না। আমি—আমিই তখন একটা ক্ষ্যাপার মত—না, কী বিচ্ছিরি ব্যাপার। আমি কোনরকম সুখই পাই নি। মাঝখান থেকে, মনটাই খালি খচখচ করছে। আমি তো মেয়েটার মুখও চিনি না। মেয়েটাও আমাকে কোনদিন চিনতে পারবে না। কী খারাপ কথা! পানপাতিয়ার মা কি এসব স্বপ্নে দেখতে পারে। আরে বাবা, বেচারির দিল চৌপাট হয়ে যাবে।

ওই যে, উশীনরবাবু দোতলার বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন। সাহেবরা সবাই বোধহয় রেডী হয়ে গেছে, এবার বেরোবে। আমার কাজও সারা। গাড়ি ধোয়া টোয়া হয়ে গেছে। খাওয়াও হয়ে গেছে। স্টার্ট দিলেই হয়। কিন্তু উশীনরবাবু যে-ভাবে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন, এখুনি তাড়াহুড়ো করে বেরুনো হবে বলে মনে হচ্ছে না।

না, উশীনরবাবুকে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। সুদীপ্তাকে ধরে পিটিয়েই দিলেন! আর তাও কি, যেমন তেমন পিটুনি। ঝাপ্‌পড় মেরে, লাথ মেরে, মাটিতে ফেলে দিয়েছিলেন। আমারই গায়ের মধ্যে কী রকম করে উঠেছিল। শান্তনুবাবু না ধরে ফেললে, মারটা কতদূর এগোত, কে জানে। অথচ, মেয়েটার লটঘট যা কিছু, উশীনরবাবুর

সঙ্গেই ছিল। প্রথম থেকেই সেটা আমি দেখেছি। আর উনিই কী না, ওকে মেরে দিলেন। দুনিয়া একটা আজব জায়গা বাবা।

জানি না, মেয়েটার হাল কী হবে। চোখ মুখের অবস্থা তো, মোটেই ভাল দেখিনি। মাথাটা ঠিক থাকলে হয়। যেরকম হাবভাব দেখেছি, ফিটের রুগীর মত দেখাচ্ছিল। এখন কী করছে, কে জানে। ঘুমোচ্ছে বোধহয়। উশীনরবাবুর মুখের অবস্থাও সুবিধার না। একটা মিষ্টি হাসি খুশি মানুষ এসেছিলেন। এখন দেখ, শুকনো মুখ, চোখের কোল বসা, একটা কথা নেই মুখে। জঙ্গল থেকে এতটা পথ এলাম, একটা কথা নেই ওঁর মুখে। চোখের নজরও ছিল কী না সন্দেহ। কী ভাবছিলেন, কে জানে। কারোর মুখেই প্রায় কথা ছিল না। তবে আমার সাহেবের কথা আলাদা। একেবারে চুপ করে থাকার লোক নন। এটা সেটা নিয়ে, প্রায়ই কিছু না কিছু বলছিলেন। সুদীপ্তার বিষয়ে কোন কথা না, এমনি আজে বাজে, কোন্ রাস্তা কোথায় গেছে, পুবদিকের পাহাড়টা কত দূরে, তিতিরের ঝাঁক দেখে, শিকারের কথা মনে হওয়া, এইরকম সাত পাঁচ।

আমি ভাবি, উশীনরবাবু কি মাতাল হয়েছিলেন বলেই মেরে-ছিলেন। কথাটা আমার বিশ্বাস হয় না। উশীনরবাবুকে তখন আমার মাতাল মনে হচ্ছিল না। এমন কি রেগে গেলে, মানুষকে যেমন ক্ষ্যাপা জানোয়ারের মত দেখায়, সেরকমও মনে হচ্ছিল না। এত বড় একটা ড্রামা রাইটার। হঠাৎ কী করে এত রেগে গেলেন। আর ওইরকম ঠাণ্ডা মানুষ। নিশ্চয়ই মেয়েটা কোন বেআদবি করেছিল। মেয়েটা যে ভাল না, তাতে তো কোন সন্দেহ নেই। তবে উশীনরবাবু লোকটা আলাদা। ওঁর কাছে রঙবাজী চলবে না। আমার এক একবার মনে হচ্ছে, মেরে ঠিকই করেছেন। অওরতদের খালি তোয়াজ করলেই হয় না, শাসন করতেও হয়। পানপাতিয়ার মা আমাকে ভালবাসে, তা বলে ভয় কম পায়। নাকি। এক হাঁকড়ানি দিলে, এখনো ওর বুক শুকিয়ে যায়। চোখে জল এসে পড়ে। অবিশ্যি, ওর মত ভাল মেয়েকে, হাঁকড়ানি

দেবার দরকারই হয় না।

আমার মনে হয়, উশীনরবাবু ঠিক বুঝেছেন বলেই মেরেছেন। আমার সাহেব বা শান্তনুবাবু হলে, পারতেন না। ওঁরা দুজনে তো ছুঁড়ির পায়ে পায়ে অনেক ঘুরলেন। নজর আমার সবদিকেই ছিল। কিন্তু মোটেই সুবিধে করতে পারেন নি। আর যে উশীনরবাবুর সঙ্গে সুদীপ্তা লটঘট করতে গেল, তার হাতেই মার খেয়ে মরল। অবিশ্যি, তারপরে মেয়েটা যে কাণ্ড আরম্ভ করেছিল, সে আবার আর এক ব্যাপার! ভেঙে চুরে, হ্যারিকেন ছুঁড়ে আগুন লাগিয়ে দিতে চেয়েছিল।

'বৈজু।'

সাহেব দোতলার থেকে ডাকলেন। আমি তাড়াতাড়ি নেমে দাঁড়ালাম।

'চল, বেরনো যাক। তেল টেল সব ঠিক আছে?'

'জী।'

উশীনরবাবুর সঙ্গে, সাহেব ঘরে ঢুকে গেলেন।

তবে, এই ট্রিপটা আমার মনে থাকবে। সাহেবকে নিয়ে অনেক জায়গায় গিয়েছি, কিন্তু এরকম কখনো ঘটে নি। সাহেবদের তো নয়-ই, আমারও না। এবার তাড়াতাড়ি ছুটি করে কয়েকদিনের জন্য দেশে যাব। পানপাতিয়া আর ওর মায়ের জন্য মনটা যেন কেমন করছে। হে ভগবান, মাপ করে দাও, আমার বহু-বেটিকে ভাল রাখ। পাপ করে থাকলে আমাকে শাস্তি দিও।
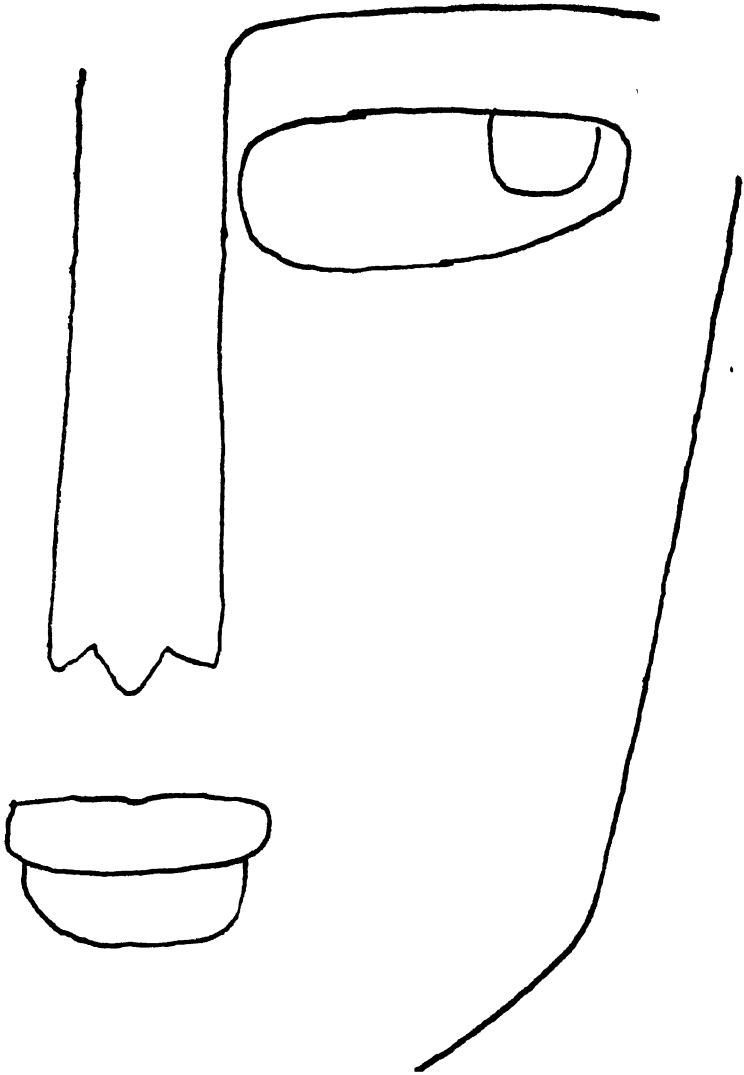
উ শী ন র

হায় নাট্যকার উশীনর, জীবন সম্পর্কে, তোমার পাঠ, শেষ পর্যন্ত এ পর্যায়ে এসে ঠেকেছে। না, আমি তোমাকে তোমার

হাত ভেঙে ফেলতে বলি না। যে-পা দিয়ে, সুদীপ্তাকে মেরেছ, সে-পা কেটে ফেলতেও বলছি না। কারণ ওগুলো তো শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিশেষ। আসলে তুমি ভাঙা, তুমি কাটা-ই। তুমি ভাঙা জীবনে। তুমি কাটা মনুষ্যত্বের বোধে। হাত পা কেটে, ওসব জোড়া লাগানো যায় না। হ্যাঁ, অন্ধকার একলা ঘরে বসে এবার নিজের কাছে, নিজে সব কবুল কর।

তোমার অল্প বয়সে লেখা নাটকগুলোর কথা মনে কর। তখন তুমি তেজী ঘোড়ার মত ছুটে চলা নাট্যকার। অধিকাংশ মানুষ তোমার সমর্থক, সমালোচক প্রায় নেই। তোমার অভিজ্ঞতার বিস্তৃতি কৌতূহলজনক ছিল। নতুন নতুন মানুষ, আর সমাজকে তুমি তোমার নাটকে তুলে এনেছিলে।

তারপরে তোমার সঙ্গে সেই প্রৌঢ়া মহিলার প্রথম আলাপ। শান্ত ধূসর চুল মহিলা, মুখে একটা করুণ মিষ্টি হাসি। তোমার মনে হয়েছিল, তাঁকে যেন একটা আলোর ছটায় ঘিরে আছে। বাংলা দেশের বাইরে, শালবনে ঘেরা এক বাংলোর বারান্দায়, শীতের রোদে বসে, তিনি তোমাকে, ছোট ছোট কথায় অনেক প্রশ্ন করছিলেন। তখনই তুমি প্রতিষ্ঠিত নাট্যকার। নিজের সম্পর্কে তুমি দ্বিধাহীন, অটল বিশ্বাস, কিছু অহংকারও ছিল। কিন্তু তোমার জবাবগুলো শুনে, সেই মহিলার মুখের হাসির ভাবটা কেমন দেখাচ্ছিল, মনে আছে কী? যেন শিশুর মুখে পাকা পাকা কথা শোনা, মায়ের মুখের অভিব্যক্তির মত। তারপরে তিনি তোমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেন লেখ উশীনর, নাটক কেন লেখ।'

তুমি জান, প্রশ্নটা সহজ, অনেকবার শোনা, কিন্তু জবাবটা মোটেই সহজ না। যদি না, বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যা কথা বল। তুমি মিথ্যা বল নি, তবে জবাবটা বোধহয় তোমার নিজেরও জানা ছিল না। কিছু লিখতে জানলেই, সব জানা হয়ে যায় না। তুমি জবাব দিয়েছিলে, 'জানবার জন্য।'

তিনি জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'কী জানবার জন্য?'

তুমি বলেছিলে, 'মানুষকে।'

তিনি স্নিগ্ধ দৃষ্টি মেলে, তোমার চোখের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে একটু হেসেছিলেন। জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'নিজেকে নয়?'

কথাটা তোমার কাছে নতুন, তাই হঠাৎ কোন জবাব আসে নি তোমার মুখে। তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে, তিনি যেন দুষ্টুমি করে মিটি মিটি হাসছিলেন। বলেছিলেন, 'নিজেকে না জানলে, অপরকে কি জানা যায়?'

তারপরে তোমাকে আশ্বস্ত করে বলেছিলেন, 'আসলে, মানুষকে বলতে, তুমি নিজের কথাই বলতে চেয়েছিলে, আমার মনে হয়। সেটাই ঠিক। "বিনে আপন চিনে, চিন-বিনে পরে।"

তারপরেও তিনি অনেক কথা বলেছিলেন। ছোট ছোট কথা, কিন্তু সুদূর অর্থবহ, গভীর, গম্ভীর। সেসব কথা তুমি আর তেমন ভাল করে শুনতে পাও নি। সেই প্রথম তোমার দৃষ্টি, প্রচলিত গৌরববোধ আর তথাকথিত আলোর জগৎ থেকে, অন্ধকারে গিয়ে পড়েছিল। পুঞ্জীভূত অন্ধকার সেখানে, ঢেউয়ের মত আকুলি-বিকুলি করছিল। তুমি শিউরে উঠেছিলে। সেই তোমার মধ্যে প্রথম, আর এক সংগ্রামবোধের জন্ম। একমাত্র মানুষের পক্ষেই, যে-সংগ্রাম সম্ভব।

আহ্, কী গভীর অন্ধকার! এই কি আমার সেই সংগ্রামবোধ। এখন সুদীপ্তার কথা আর আমার মনে নেই। সুদীপ্তার জন্যই বিশেষ করে কোন কষ্টের অনুভূতি নেই। অনুভূতি যা কিছু এখন কেবল নিজের জন্য। আমি যে-অন্ধকারে ছিলাম, সেই অন্ধকারেই আছি। কোন অন্ধকারের সঙ্গেই, আমি সংগ্রামে জয়ী হতে পারি নি। পারলে, জঙ্গল থেকে ফিরে, আজ আবার এই অন্ধকারেই এসে মুখ ঢেকে বসতাম না।

আমি জানি, এই অন্ধকারে বসে থাকাটা শেষ কথা না। আমার সব কিছুই কেটে ছিঁড়ে যাচ্ছে। আমি হাতিয়ারগুলো খুঁজছি। সংগ্রামের হাতিয়ারগুলো, যে-গুলো, অনেকে জানে, আলোর বুকে হাট করে খোলা পড়ে আছে। সেই অনেকেরা

শান্তিতে থাকুক। আমি জানি, সেগুলো পুঞ্জীভূত অন্ধকারেই চাপা পড়ে আছে। বড় অসহায়, হাতিয়ারগুলো কোথায়? এই অসহায়তার অহঙ্কার নিষ্ঠুরতা, লোভ নিয়ে বাঁচতে পারি না।

নাটকটা লিখতে শুরু করেছি। সারাদিন এই নিয়েই আছি। অলক শান্তনু মাঝে মাঝে আসে। অনেক কথাবার্তা হয়। শুনি, সুদীপ্তা আবার স্টেজে আসছে, কাজ করছে। যেন অনেকটা আগেরই মত। আমার সঙ্গে ওর আর দেখা হয় নি। অবিশ্যি, তার কোন দরকারও নেই। কিন্তু একটা গ্লানি, একটা ধিক্কার সব সময়েই যেন আমাকে খোঁচায়। সুদীপ্তার কাছে ক্ষমা চাইলেই, বা ও ক্ষমা করলেই, সেটা মিটে যায় না। ব্যাপারটা আমার নিতান্ত একার।

কতগুলো কথা, চকিতে চকিতে মনের মধ্যে ঘোরা ফেরা করে। এ কথাগুলোর, আপাতদৃষ্টিতে, কোন মূল্য নেই। সুদীপ্তার মুখটা মনে পড়ে বলেই, তাই কথাগুলো চকিতে চকিতে জাগে।

কেন আমি বুঝতে পারি নি সুদীপ্তাকে? বুঝি নি তাও ঠিক না, বুঝেছিলাম, কিন্তু একেবারে নির্মোহ মুক্ত হতে পারি নি। সুদীপ্তা তা হয়তো দিতে চায় নি, আমি কেন পারলাম না? আমাকে কেন, অমন একটা শেষ পরিণতির দিকে যেতে হল। মুক্তি পাবার জন্য? এতটা ক্রোধ যেখানে, সেখানে দুর্বলতা বর্তমান। সেই দুর্বলতাটা আমারই, তারই দাগ রয়েছে সুদীপ্তার গায়ে।

একলা ঘরে বসে কাজ করছি। কিছু চিঠিপত্র এল। একটা চিঠি খুলে, নীচে দেখলাম, 'ইতি সুদীপ্তা।' ব্যগ্র কৌতূহলে পড়লাম।

'উশীনরবাবু, একটা চিঠি লিখছি আপনাকে। আমার ছেলেবেলায় আমি একবার ধর্ষিত হয়েছিলাম একজনের দ্বারা। তখন আমার চৌদ্দ বছর বয়স। সেই লোকটি এখন আমার ভগ্নিপতি। তারপরে দশ বছর কেটেছে, এখন চব্বিশ বছর বয়স আমার। এই পরিণত বয়সে আপনার হাতে মার খেলাম। আমি জানি না, দুটো ঘটনার যোগ কোথায়, কিন্তু এই দুটো ঘটনা, আমি কখনো ভুলতে পারব না। যেটা

সম্ভ সম্ভ ঘটেছে, সেটাই এখন বেশি করে মনে পড়ছে। আর মনে হচ্ছে, মাঝখানের দশটা বছর এখন অনেক ঝাপসা, অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। কেন, বুঝতে পারছি না।

কোন রকম ভুল বুঝবেন না এই চিঠির জন্য। দুটো ঘটনাকে আমি এক ভাবি নি। দুটোই ভিন্ন, অথচ কোথায় যেন যোগ আছে।

—ইতি

সুদীপ্তা।'

চিন্তিতভাবে চিঠিটা মুড়তে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ একপাশে দেখলাম, 'পুনশ্চ: উশীনর, তোমাকে নাম ধরে ডাকছি। কেমন? উশীনর, আমাকে ক্ষমা করে দিও। কেন, বুঝতে পেরেছ তো?—সুদীপ্তা।'

এই শেষ কথা কয়টি হঠাৎ যেন তীরের মত বুকে বিঁধে গেল। নিশ্বাস আটকে গিয়ে, চোখের সামনে সব ঝাপসা দেখাতে লাগল।